# দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

# শরীয়তের আহকাম আর্কাইভ-২০১৯

## দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

## নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

## ২০১৯ ঈসায়ী

# সূচিপত্র

তাকফীরের ব্যাপারে প্রচলিত ভুল-৩ ..... ৫

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির); ১১- বিভিন্ন প্রকার তা'যির ..... ৮

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির); ১২- তা'যিরের সর্বোচ্চ পরিমাণ ..... ১৩

পলায়নরত মুজাহিদকে ধরার চেষ্টা করলে বা বাধা দিলে ..... ১৭

কাফের জনসাধারণের উপর আক্রমনের বিধান ..... ২২

ন্যাটোভুক্ত দেশের অমুসলিম নাগরিকদের হত্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর..... ৩৫

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২০ ..... ৩৮

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে -২১ ..... ৪১

জিহাদের ব্যাপারে ফতোয়া দেবে কারা? ..... ৪৫

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে -২২ ..... ৪৮

জিহাদ উত্তম না নামায উত্তম? ..... ৫২

যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায় (পর্ব-১)..... ৫৬

যে সকল কারণে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায় (পর্ব-২)..... ৭১

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৩ ..... ৮১

আহকামুস সিয়ার: অবতরণিকা ..... ৮৩

হাদিসে কাফেরদের নারী-শিশু হত্যা করতে নিষেধ এসেছে কি? এ নিষেধের কারণ কি? ..... ৮৮

প্রশ্ন- কাফেরদের নারী শিশুকে কখন হত্যা করা জায়েয? এর দলীল কি? .....৯২

জিহাদ কয় প্রকার? কুরআন সুন্নাহয় এর দলীল কি? এর স্বপক্ষে আকলী-যুক্তিগত দলীল কি? ..... ৯৬

কাফেররা যদি মুসলমান হয়ে যেতে চায়, তাহলে কি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা যাবে? দলিলসহ জানালে উপকৃত হবো ইনশাআল্লাহ?..... ১০১

ইসলাম ও কুফুরির যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সহায়তার বিধান নিয়ে ইবনে তাইমিয়ার ওপর আরোপিত অপবাদের দালিলিক খণ্ডন ..... ১০৪

মুছলা কাকে বলে? মুছলা হারাম হওয়ার দলীল কি এবং তা কখন হারাম?.... ১১৩

সংশয়ঃ মুফতি তাকি উসমানির দারুল হারব-দারুল ইসলাম সংক্রান্ত সংশয় নিরসন ..... ১১৫

বাংলাদেশ কি দারুল ইসলাম নাকি দারুল হারব? ..... ১৭৫

জাবিল কুরবা কারা? তাদেরকে কেন খুমুসে অংশ দেয়া হতো? ..... ২১০

জিযিয়া কাকে বলে? কোন কোন কাফের থেকে জিযিয়া কবুল করা হবে আর কোন কোন কাফের থেকে কবুল করা হবে না?..... ২১৩

কোনো বাহিনি পাঠাতে হলে আমীর নির্ধারণ করে দেয়া কি আবশ্যক? এর দলীল ও হিকমত কি?..... ২১৬

হরবিরা যদি মুসলমানদের মাল লুণ্টন করে নিয়ে যায়, তাহলে কি মালিক হয়ে যায়? এর দলীল কি? ..... ২২০

প্রশ্ন: মুসলিমদের হারানো ভূমিগুলো উদ্ধার করা কি ফরয? ..... ২২৫

যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যায় (পর্ব- ৩ শরিয়তের বিধান পরিবর্তন)..... ২৩১

ইমারাহ ও খিলাফাহ : পরিচিতি, বিধান ও পার্থক্য ..... ২৪৮

যদি কেউ পার্লামেন্টে অংশ নিতে চায়, তবে সেটা কি কুফর হিসাবে গণ্য হবে? এ কাজ কি কাউকে মুরতাদ বানিয়ে ফেলে?..... ২৭৯

# তাকফীরের ব্যাপারে প্রচলিত ভুল-৩

শায়খ আবু মুহাম্মদ আসিম আলমাকদিসি

salahuddin aiubi

Senior Member

০১-০৩-২০১৯

আল্লাম শাওকানী রহ. আস সাইলুল র্জারার কিতাবে বলেন, জানা আবশ্যক, কোন মুসলিমের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া ও কুফরে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত দেওয়া এমন একটি বিষয়, যাতে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলিম সূর্যের চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিত কদম ফেলতে পারে না। কেননা একদল সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহে এসেছে,

**أن من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما...**

“যে তার ভাইকে বলে: “হে কাফের”, এতে তাদের দু’জনের একজন অবশ্যই তাতে পতিত হয়”।

এরপর তিনি আরো হাদীস উল্লেখ করে বলেন, “এ সকল হাদীসগুলো ও এ প্রসঙ্গের অন্যান্য হাদীসগুলো কাফের আখ্যাদানে তাড়াহুড়া করার ব্যাপারে মহা সতর্ককারী ও বড় উপদেশদাতা। (আসসাইলুল র্জারার ৪/৫৭৮)

তিনি আরো বলেন, “কেননা যে স্বীয় ঈমান বাঁচাতে আগ্রহী, সে ঐ স্থানে পা ফেলতে পারে না, যেখানে স্বীয় ঈমানের বিপদ আছে এবং ঐ কাজে লিপ্ত হতে পারে না, যাতে এ বিষয়ে কোন উপকার বা ফলাফল নেই। সে কিভাবে এমন কাজে লিপ্ত হবে, যখন তার নিজের উপরই এ আশংকা আছে যে, যদি সে তাতে ভুল করে, তাহলে নিজেই ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতে পারে, যাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের বলে উল্লেখ করেছেন। এটি এমন বিষয়, শরীয়ত তো দূরের কথা, সাধারণ বিবেকও এ পথে চলার অনুমোদন দেয় না। (৪/৫৭৯)

ইবনে হাজার আলহাইছামী "আয্ যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির" কিতাবে বলেন: "তিনশত একান্ন ও বায়ান্ন নম্বর কবীরা গুনাহ হল: কোন মুসলিমকে 'হে কাফের' বা 'হে আল্লাহর শত্রু' বলা, যখন এর দ্বারা মূলত: তাকে কাফের বলা উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ তার ইসলামকে কুফর বলা উদ্দেশ্য নয় বরং শুধু গালি দেয়া উদ্দেশ্য"।

অত:পর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, "এটি ভয়ংকর ধমকি। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শত্রুতা ও কুফরের বিষয়টি তার উপরই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তার গুনাহ হবে হত্যার গুনাহের ন্যায়। একারণে এ শব্দ দু'টি ব্যবহারের হুকুম দু'ধরণের হতে পারে:

এক. হয়ত তা কুফর হবে। এটি হচ্ছে, যখন কোন মুসলিমকে ইসলামের গুণের কারণে 'হে কাফের' বা 'হে আল্লাহর শত্রু' বলা হবে। তখন বিষয়টি এমন হবে যে, সে ইসলামকে কুফর ও আল্লাহর শত্রুতার কারণ বলল। আর এটি কুফর।

দুই. অথবা তা কবীরা গুনাহ হবে। এটি হচ্ছে, যখন এমনটা উদ্দেশ্য হবে না। তখন বিষয়টি তার দিকে প্রত্যাবর্তন করার কথাটি কঠিন শাস্তি ও গুনাহের দিকে ইঙ্গিত হবে। আর এটাই কবীরা গুনাহের আলামতসমূহের মধ্যে একটি আলামত।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ: 'ইলামুল মু'আক্কিয়ীন' কিতাবে (৪/৪০৫) স্পষ্টভাবে বলেন: যাকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সা. কাফের সাব্যস্ত করেননি তাকে কাফের সাব্যস্ত করা কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভূক্ত।

এ ধরণেরই আরেকটি হাদীস ইমাম মুসলিম রহ. জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন,

**قال رجل والله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله عزوجل: من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر له ؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك**

-"এক লোক বলল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না। ফলে আল্লাহ বললেন, কে আছে, যে আমার থেকে শপথ নিবে!! যাও, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম আর তোমার সমস্ত আমল বিনষ্ট করে দিলাম"। (নাউযুবিল্লাহ)

এই বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আরেকটি হাদীস ইমাম হাকিম রা. মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদকে হাসান বলেছেন। ইমাম যাহাবী রহ.ও তার অনুসরণ করে হাদীসটি ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে কোন মুমিনের ব্যাপারে এমন কথা বলে যা তার মাঝে নেই, তাকে জাহান্নামে পুঁজের মধ্যে আটক করে রাখা হবে, যতক্ষণ না সে যা বলেছে তা থেকে পরিত্রাণকারী বিষয় না আনতে পারে"।

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ. বলেন, "মোটকথা, যে নিজের কল্যাণ কামনা করে তার জন্য আবশ্যক হল, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন স্পষ্ট প্রমাণ ও ইলম ব্যতিত এ ব্যাপারে মুখ না খোলা এবং শুধু নিজের ধারণা ও যুক্তির আলোকে কোন মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা। কেননা কাউকে ইসলাম থেকে বের করা বা ইসলামের অন্তর্ভূক্ত করা দ্বীনের সবচেয়ে কঠিন বিষয়সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

শয়তান অনেক মানুষকে এক্ষেত্রে পদস্খলিত করেছে। একদল থেকে শৈথিল্য ঘটিয়েছে। ফলে তারা এমন লোককে মুসলমান বলে দাবি করে, কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমার বর্ণনাসমূহ যার কাফের হওয়া সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। আর আরেক দল থেকে সীমালঙ্ঘন ঘটিয়েছে। ফলে তারা কিতাব-সুন্নাহ ও ইজমা যাকে মুসলিম হওয়া সাব্যস্ত করে, তাকে কাফের আখ্যায়িত করে। (আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ৮/২১)

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৯৫৬

# ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির); ১১- বিভিন্ন প্রকার তা'যির

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০১-০৫-২০১৯

কুরআন সুন্নাহয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত কয়েকটি তা'যির উপরে উল্লেখ করা হল, নতুবা তা'যিরের ধরণ অসংখ্য। যাকে যেভাবে শাস্তি দিলে দমন হবে, সেটাই তার তা'যির। তবে কাউকে যদি প্রহারের মাধ্যমে তা'যির করার প্রয়োজন হয়, তাহলে সর্বোচ্চ কয়টি বেত্রাঘাত করা যাবে এ নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে।

**এখন তা'যির সংক্রান্ত আইম্মায়ে কেরামের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করছি। তাতে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে।**

**শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,**

**وليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الانسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والاغلاظ له وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة كما هجر النبى وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبى وأصحابه يعزرون بذلك وقد يعزر بترك استخدامه فى جند المسلمين كالجندى المقاتل إذا فر من الزحف فان الفرار من الزحف من الكبائر وقطع أجره نوع تعزير له وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له وكذلك قد يعزر بالحبس وقد يعزر بالضرب وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا كما روى عن عمر بن الخطاب ﷺ أنه أمر بمثل ذلك فى شاهد الزور. اهـ**

"তা'যিরের সর্বনিম্ন পরিমাণের কোন নির্ধারিত সীমা নেই। বরং প্রত্যেক এমন কথা ও কাজ কিংবা প্রত্যেক এমন কথা বা কাজ পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা ব্যক্তির কষ্ট হবে, সেটা দিয়েই তা'যির হতে পারে। কোন সময় ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে, ধমকি দিয়ে ও কঠোরতা করে তা'যির করা যায়। আবার কোন সময় তাওবা না করা পর্যন্ত

বয়কট করে ও সালাম দেয়া বন্ধ রাখার মাধ্যমে করা যায়। এমনটা করা যায় যখন এটাই মাসলাহাত বলে মনে হয়। যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম ঐ তিন সাহাবিকে বয়কট করেছিলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মুলতবী ছিল।

কখনো নিজ পদ থেকে অপসারিত করে দেয়ার দ্বারাও তা'যির হতে পারে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম এভাবে তা'যির করতেন। আবার কখনো মুসলিম বাহিনিতে না নেয়ার মাধ্যমেও তা'যির হতে পারে; যেমন- যোদ্ধা সৈনিক যদি যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে। কেননা, ময়দান ছেড়ে পালানো কবীরা গুনাহ। আর তার প্রতিদান বন্ধ করে দেয়াও তার জন্য এক প্রকার তা'যির। তদ্রূপ আমীর যদি জঘন্য কিছু করে ফেলে, তাহলে তাকে তার নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করে দেয়া তার তা'যির। তেমনি কখনো কখনো বন্ধী করার মাধ্যমে তা'যির করা যেতে পারে, কখনো প্রহারের মাধ্যমে করা যেতে পারে, আবার কখনোও চেহারায় চুন-কালি মেখে কালো করে বাহনের উপর উল্টো করে বসিয়ে ঘুরানোর মাধ্যমেও হতে পারে, যেমনটা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার সাথে এমনটা করার আদেশ দিয়েছেন।" - মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৪৪

**এখানে তা'যিরের আরোও কয়েকটি পদ্ধতি পাওয়া গেল:**

**ছয়.** শরীয়তসম্মত এমন কথা বলা, যার দ্বারা অপরাধীর কষ্ট হতে পারে।

**সাত.** তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কাজ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

**আট.** তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কথা পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

**নয়.** তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কাজ পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

**দশ.** উপদেশ দেয়া। **এগার.** ধমক দেয়া। **বার.** কঠোরতা করা। **তের.** সালাম না দেয়া। **চৌদ্দ.** পদ থেকে অপসারিত করে দেয়া। **পনের.** সেনাবাহিনিতে না নেয়া। **ষোল.** আমীরকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া।

**সতের.** চেহারায় চুন-কালি মেখে কালো করে বাহনের উপর উল্টো করে বসিয়ে ঘুরানো।

**ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.) বলেন,**

**وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم وكبرها وصغرها وبحسب حال المذنب في نفسه والتعزير منه ما يكون بالتوبيخ وبالزجر وبالكلام ومنه ما يكون بالحبس ومنه ما يكون بالنفي ومنه ما يكون بالضرب. اهـ**

"তা'যিরের পরিমাণ, ধরণ ও সিফাত অপরাধের অবস্থাভেদে, অপরাধ ছোট ও বড় হওয়া ভেদে এবং অপরাধীর নিজের অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তা'যির হতে পারে ধমক দেয়া, তিরস্কার করা ও কথার মাধ্যমে। হতে পারে বন্দী করা ও এলাকা থেকে নির্বাসন দেয়ার মাধ্যমে। হতে পারে প্রহারের মাধ্যমে।" - আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ: ১/৩৮৪

**এখানে আরেকটি পাওয়া গেল:**

**আটার.** তিরস্কার করা।

**'আদদুররুল মুখতার' গ্রন্থকার (১০৮৮হি.) বলেন,**

**والتعزير (ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي) وعليه مشايخنا زيلعي لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس فيه مختلفة بحر. اهـ**

"তা'যিরের কোন নির্ধারিত পরিমাণ নেই, বরং তা কাযির বিবেচনার উপর ন্যস্ত। ... কেননা, এর উদ্দেশ্য- (অপরাধ থেকে) বিরত রাখা। আর লোকজনের অবস্থা এক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।" - আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে ছাপা): ৪/৬৪

**তিনি আরো বলেন,**

**(ويكون به و) بالحبس و (بالصفع) على العنق (وفرك الأذن، وبالكلام العنيف، وبنظر القاضي له بوجه عبوس، وشتم غير القذف). اهـ**

“তা’যির হতে পারে প্রহারের দ্বারা, বন্দী করার দ্বারা, গর্দানে চপেটাঘাতের দ্বারা, কানমলা ও রূঢ় কথার দ্বারা, কাযি সাহেব তার প্রতি ভ্রুকুচিত চেহারায় তাকানোর দ্বারা, অপবাদ নয় এমন গালি দেয়ার দ্বারা।” - আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে ছাপা): ৪/৬১

অবশ্য সারাখসী রহ. মুসলমানকে গর্দানে চপেটাঘাতের মাধ্যমে তা’যির করতে নিষেধ করেছেন। যিম্মিকে করলে করা যেতে পারে।

**এখান থেকে আরোও পাওয়া গেল:**

**উনিশ.** কানমালা।

**বিশ.** কাযি সাহেব ভ্রুকুচিত চেহারায় তাকানো।

**একুশ.** অপবাদ নয় এমন গালি দেয়া।

**উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা তা’যিরের একুশটি পদ্ধতি পেলাম:**

**এক**. বর্জন ও বয়কট।

**দুই**. নির্বাসন

**তিন**. বন্দী।

**চার**. প্রহার।

**পাঁচ**. হত্যা।

**ছয়**. শরীয়তসম্মত এমন কথা বলা, যার দ্বারা অপরাধীর কষ্ট হতে পারে।

**সাত**. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কাজ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

**আট**. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কথা পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

**নয়**. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কাজ পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

**দশ**. উপদেশ দেয়া।

**এগার**. ধমক দেয়া।

**বার**. কঠোরতা করা।

**তের**. সালাম না দেয়া।

**চৌদ্দ**. পদ থেকে অপসারিত করে দেয়া।

**পনের**. সেনাবাহিনিতে না নেয়া।

**ষোল**. আমীরকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া।

**সতের**. চেহারায় চুন-কালি মেখে কালো করে বাহনের উপর উল্টো করে বসিয়ে ঘুরানো।

**উনিশ**. কানমলা।

**বিশ**. কাযি সাহেব ভ্রুকুচিত চেহারায় তাকানো।

**একুশ**. অপবাদ নয় এমন গালি দেয়া (ওহে আহমক!)।

*এগুলো তা'যিরের কয়েকটি পদ্ধতি মাত্র। নতুবা এর কোন নির্ধারিত পরিমাণ ও পদ্ধতি নেই, যেমনটা অনেকবার বলা হয়েছে। যেখানে শরীয়তসম্মত যে পদ্ধতি কার্যকর মনে হবে সেটাই প্রয়োগ করা হবে। তবে কারো ক্ষেত্রে প্রহারের দ্বারা তা'যির উপকারী মনে হলে তখন সর্বোচ্চ কয়টি বেত্রাঘাত করা যাবে- সেটার একটা সীমারেখা আছে। সামনে এর বিবরণ আসছে ইনশাআল্লাহ।*

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৯৮৭

# ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির); ১২- তা'যিরের সর্বোচ্চ পরিমাণ

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০১-০৯-২০১৯

## তা'যিরের সর্বোচ্চ পরিমাণ

আমরা দেখেছি, তা'যিরের ভিত্তি কাযির ইজতিহাদের উপর, খাহেশাতের উপর নয়। তিনি ইজতিহাদের ভিত্তিতে যাকে যে ধরণের ও যে পরিমাণ তা'যির করা প্রয়োজন মনে করেন ততটুকুই করবেন। এর চেয়ে কমও না, এর চেয়ে বেশিও না। কমও জায়েয হবে না, বেশিও জায়েয হবে না। কারণ, বেশি লাগালে সীমালঙ্গন হবে আবার কম লাগালে অপরাধী দমন হবে না। সীমালঙ্গনও জায়েয নয়, অপরাধীকে দমন না করে ছেড়ে দেয়াও জায়েয নয়। অতএব, কমও জায়েয নয়, বেশিও জায়েয নয়। এ হিসেবে তা'যিরের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কোন পরিমাণ নেই। অর্থাৎ এমন কোন পরিমাণ নেই যে, অপরাধী বিরত হয়ে গেলেও এর চেয়ে কম করা যাবে না; আবার এমন কোন পরিমাণও নেই যে, অপরাধী ঐ পরিমাণ শাস্তির পর বিরত হবে না বলে মনে হলেও তাকে এর অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না।

হানাফি মাযহাবের অনেক কিতাবে আছে, তা'যিরের সর্বনিম্ন পরিমাণ তিন বেত। তবে আমাদের আইম্মায়ে কেরাম স্পষ্ট বলেছেন, এই বক্তব্য সহীহ নয়। যে ধমকে বিরত হয়ে যাবে, তাকে বেত্রাঘাত করা যাবে না। আবার যাকে এক বেত্রাঘাতে বিরত রাখা যাবে মনে হয়, এর বেশি দরকার হবে না- তাকে এর বেশি লাগানো যাবে না। অতএব, তিন বেত্রাঘাতের বক্তব্য সহীহ নয়।

তবে যাকে দশ বেতের কমে বিরত রাখা যাবে না, তার তা'যিরের সর্বনিম্ন পরিমাণ- দশ বেত্রাঘাত। যাকে বিশটা দরকার, তার জন্য বিশটাই সর্বনিম্ন। যার ত্রিশটা দরকার, তার ত্রিশটা। এর চেয়ে কম লাগানো জায়েয হবে না। তদ্রূপ, যাকে দুই দিন বন্দী করে রাখলেই বিরত হয়ে যাবে, তাকে এর বেশি সময় বন্দী রাখা জায়েয হবে না। আবার যাকে এক বৎসরের কমে দমন সম্ভব নয়, তার সর্বনিম্ন তা'যির এক বৎসর। তাকে এক বৎসরের আগে ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে

না। অতএব, যাকে যে পরিমাণ বন্দী রাখা দরকার, কাযি সাহেব তাকে সে পরিমাণই বন্দী রাখবেন। অন্যান্য সকল তা'যিরের ক্ষেত্রেও একই কথা।

তবে বিশেষভাবে বেত্রাঘাতের দ্বারা তা'যিরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কতটি বেত লাগানো যাবে এ নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম মালেক রহ. এর মতে এর কোন সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত নেই। যাকে বিরত রাখতে যত পরিমাণ বেত লাগানো দরকার তাকে সে পরিমাণই লাগানো যাবে। একশো দরকার হলে একশো, দু'শো দরকার হলে দু'শো, চারশো দরকার হলে চারশো।

তবে অন্যান্য আইম্মায়ে কেরামের মতে বেত্রাঘাতের একটা সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত আছে। আবু হানিফা রহ. এর মতে এর পরিমাণ ঊনচল্লিশ (৩৯)। অতএব, তা'যিররূপে কাউকে ঊনচল্লিশ বেতের অধিক লাগানো যাবে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি কেউ ঊনচল্লিশ বেতে বিরত না হয়, তাহলে তার ব্যাপারে কি করা হবে? ঊনচল্লিশ লাগানোর পর কি ছেড়ে দেয়া হবে?

**উত্তর:**

না ছেড়ে দেয়া হবে না। বরং তাকে বিরত রাখতে বেত্রাঘাতের পরিবর্তে অন্য কোন শাস্তি বেছে নেয়া হবে। যেমন- বেত্রাঘাতের পর জেলে ভরে রাখা হবে কিংবা নির্বাসন দিয়ে দেয়া হবে কিংবা লোকজনকে তাকে বয়কট করার আদেশ দেয়া হবে, যাতে সংকীর্ণতার শিকার হয়ে সে সংশোধন হয়ে যায়। অতএব, বেত্রাঘাতের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৩৯ হওয়ার অর্থ এই নয়- এর অতিরিক্ত কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। বরং এর অর্থ: বেত্রাঘাত ৩৯- এর অধিক লাগানো যাবে না, তবে ৩৯- এ বিরত না হলে আর বেত্রাঘাত না করে বরং অন্য কোন শাস্তি বেছে নেয়া হবে।

**দ্বিতীয়ত:** কারো অপরাধ যদি অনেক হয়, আর প্রত্যেকটা অপরাধের কারণে তা'যিরের প্রয়োজন পড়ে, যার ফলে সবগুলো বেত্রাঘাতের পরিমাণ সমষ্টিগতভাবে ৩৯- এর অধিক হয়ে যায়: তাহলে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। বর্ণিত আছে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তার আংটির নকশা নকল করে বাইতুল মাল থেকে সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার কারণে মা'ন ইবনে যায়েদাকে তিনি দু'শো বেত্রাঘাত করেছেন, সাথে বন্দীও করেছেন এবং নির্বাসনও দিয়েছেন। কারণ, তার এই অপরাধ অনেকগুলো অপরাধের রূপ নিয়েছে। যেমন:

- আংটির নকশা নকল করা।

- অন্যায়ভাবে বাইতুল মালের সম্পদ হাতিয়ে নেয়া।

- অপরাধীদের জন্য এই অপরাধের রাস্তা খোলে দেয়া। কেননা, তার দেখাদেখি অন্যরাও বাইতুল মালের সম্পদ হাতিয়ে নিতে দায়িত্বশীলদের আংটির নকশা নকল করার পথ ধরতে পারে ইত্যাদি।

যেহেতু তার অপরাধ অনেকগুলো অপরাধের রূপ নিয়েছে এ কারণে সবগুলোর তা'যিররূপে দু'শো লাগানো হয়েছে। [বিস্তারিত ফাতহুল কাদীর ও রদ্দুল মুখতার, বাবুত তা'যির দেখুন।]

অতএব, ৩৯- এর অধিক লাগানো যাবে না ঐ সময়, যখন অপরাধ একটা হবে। যেমন- কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত মহিলার সাথে সঙ্গম ব্যতীত অন্যান্য কুকর্ম করলো (যেমন- জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া ইত্যাদি)। তার শাস্তি কি তা শরীয়তে নির্ধারিত নেই। এখানে তা'যির করতে হবে। তবে এই তা'যিরের পরিমাণ হানাফি মাযহাব মতে ৩৯ বেতের অধিক হতে পারবে না। তবে যদি এর দ্বারা সে পরবর্তীতে এসব কুকর্ম থেকে বিরত হবে না বলে মনে হয়, তাহলে তাকে জেলে দেয়া যেতে পারে কিংবা মুনাসিব মতো অন্য কোন শাস্তি দেয়া যেতে পারে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তির অপরাধ যদি অনেকগুলো হয়, যেমন:

- কাউকে গালি দিয়েছে,

- কারো নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে,

- কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছে,

- কোন মহিলার সাথে সঙ্গম ব্যতীত অন্যান্য কুকর্ম করেছে,

- অন্যায়ভাবে কারো টাকা হাতিয়ে নিয়েছে,

- জুয়া খেলেছে ইত্যাদি;

এমতাবস্থায় তাকে সবগুলোর বিপরীতে যদি বেত্রাঘাত করা হয়, তাহলে তার সংখ্যা ৩৯- এর চেয়ে অনেক বেশি হবে। এতে কোন সমস্যা নেই। কেননা, এখানে এক অপরাধের বিপরীতে বেত্রাঘাত হচ্ছে না, অনেকগুলো অপরাধের বিপরীতে হচ্ছে। তবে বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে- যেন তার মৃত্যু না ঘটে যায় কিংবা কোন অঙ্গ নষ্ট না হয়ে যায়।

সারকথা এই দাঁড়ালো:

ত্ত তা'যির কাযির ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। তিনি খাহেশাতের বশবর্তী না হয়ে ইজতিহাদের ভিত্তিতে যাকে যেমন মুনাসিব মনে করেন তা'যির করবেন।

ত্ত তা'যিরের সর্বনিম্ন কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। যাকে দমন করতে যে পরিমাণ শাস্তি দরকার, সেটাই তার জন্য সর্বনিম্ন তা'যির। এর চেয়ে কম শাস্তি জায়েয হবে না। তদ্রূপ, যে পরিমাণ শাস্তির মাধ্যমে অপরাধী দমন হয়ে যাবে, এর বেশি লাগবে না মনে হয়- সেটা তার জন্য সর্বোচ্চ তা'যির। এর অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না।

ত্ত হানাফি মাযহাব মতে তা'যিরে বেত্রাঘাতের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৩৯। এর বেশি বৈধ নয়। তবে অপরাধ যদি অনেক হয় এবং প্রত্যেকটার জন্য তা'যিরের দরকার পড়ে, তাহলে সবগুলোর সমষ্টি ৩৯- এর অধিক হতে কোন সমস্যা নেই। তদ্রূপ, যেক্ষেত্রে ৩৯- এর অধিক বৈধ নয়, সেক্ষেত্রেও যদি অপরাধী বিরত হবে না বলে মনে হয়, তাহলে বেত্রাঘাতের সাথে অন্য শাস্তি যোগ করা হবে।

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/newreply.php?p=৫৮৯৬৩

# পলায়নরত মুজাহিদকে ধরার চেষ্টা করলে বা বাধা দিলে

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০১-১৬-২০১৯

**প্রশ্ন:** কোন মুজাহিদ ভাই কোন কাফের বা মুরতাদকে হত্যা করে পালানোর সময় যদি কোন (সরকারি বা সাধারণ) লোক তাকে ধরার চেষ্টা করে, তাহলে মুজাহিদ ভাইয়ের জন্য তাকে আঘাত করা বা হত্যা করা বৈধ হবে কি?

**উত্তর:**

**بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد**

...

পলায়নরত মুজাহিদকে পালাতে বাধা দেয়া বা ধরার চেষ্টা করা তার উপর সুস্পষ্ট জুলুম ও অন্যায়। বরং তাকে হত্যা করার নামান্তর। এই জালেমের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে তাকে আঘাত বা হত্যা করতে পারবে।

বাধাদানকারী যদি সরকারি বাহিনির কেউ হয়, বা কাফের হয়, তাহলে হত্যা করতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, সরকারি বাহিনির লোককে এমনিতেই হত্যা করা জায়েয। আর এদেশের কাফেররা মূলত হরবি। মাসলাহাতের খাতিরে বা সংশয়-সন্দেহের কারণে তাদের উপর হামলা করা হচ্ছে না। কিন্তু মুসলমানদের উপর সীমালঙ্ঘন করলে তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

আর বাধাদানকারী যদি সাধারণ মুসলামন হয় তখন আঘাতের দ্বারা ক্ষান্ত হয়ে গেলে হত্যা করবে না। জখম হয়েও ক্ষান্ত না হলে বা ক্ষান্ত হবে না বলে প্রবল ধারণা হলে হত্যা করে দেবে।

**আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-**

**{فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}**

“অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।”- হুজুরাত: ৯

আয়াতে দল দ্বারা শুধু দল উদ্দেশ্য নয়। একক ব্যক্তিও যদি অন্যের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে এ আয়াত যুদ্ধ ও মারামারির অনুমতি দিচ্ছে। পলায়নরত মুজাহিদকে বাধাদানকারী অন্যায়ভাবে আক্রমণকারীর অন্তর্ভুক্ত। তার সাথে মারামারি-জখম-আঘাত সব করা যাবে। যতক্ষণ না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। অর্থাৎ মুজাহিদকে নিরাপদে পালাতে না দেয়। হত্যা করা ছাড়া বিরত না হলে হত্যা করতেও কোন অসুবিধা নেই।

**রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-**

**((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان))**

“তোমাদের যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন স্বহস্তে (শক্তিবলে) তা প্রতিহত করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেন তার যবান দিয়ে প্রতিহত করে। যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে যেন অন্তর দিয়ে প্রতিহত করে। আর এ (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) হল দুর্বলতম ঈমান।”- সহীহ মুসলিম: ১৮৬

যে অন্যায় অস্ত্র প্রয়োগ ছাড়া দমন করা যায় না, তা অস্ত্র প্রয়োগে দমন করাই হাদিসের নির্দেশ।

**ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন-**

**عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله -ﷺ- فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى قال « فلا تعطه مالك ». قال أرأيت إن قاتلنى قال « قاتله ». قال أرأيت إن قتلنى قال « فأنت شهيد ». قال أرأيت إن قتلته قال « هو فى النار ».**

“হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করল- ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আমার মাল কেড়ে নিতে আসে? তিনি জওয়াব দিলেন- তাকে তোমার মাল দেবে না। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি সে আমার সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়? তিনি জওয়াব দিলেন, তুমিও তার সাথে মারামারি কর। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে তুমি শহীদ হবে। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে সে জাহান্নামী হবে।"- সহীহ মুসলিম: ৩৭৭

যেখানে নিজের মাল রক্ষার জন্য মারামারি ও হত্যার অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেখানে জান রক্ষার জন্য তো এর আগেই অনুমতি হবে।

**অন্য হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-**

**(من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد)**

"যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে- সে শহীদ। যে তার পরিবার, তার নিজ প্রাণ বা দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হবে- সেও শহীদ।"- আবু দাউদ: ৪৭৭২

**ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,**

**فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل، فإن زال بدون القتل لم يجز القتل، وهذا تلقي من قول الله تعالى:" فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله". وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولا شي عليه. اهـ**

"যদি যবান দ্বারা অন্যায় প্রতিহত করতে পারে, তাহলে তাই করবে। **আর যদি শাস্তি বা হত্যা ছাড়া সম্ভব না হয়, তাহলে তাই করবে। হত্যা ছাড়া প্রতিহত হয়ে গেলে হত্যা জায়েয হবে না।** এই মাসআলা গৃহীত হয়েছে আল্লাহ তাআলার এ বাণী থেকে-

**فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ**

‘অতঃপর যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।’

এর ভিত্তিতেই উলামায়ে কেরাম বলেন, কোন ব্যক্তির নিজের জান-মালের উপর বা অন্য কারো জান-মালের উপর কেউ আক্রমণ করলে, সে উক্ত আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে পারবে এবং এর বিপরীতে তার উপর কোন জরিমানা বর্তাবে না।”- তাফসীরে কুরতুবী: ৪/৪৯

**ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন (ইমাম সারাখসীর ব্যাখ্যাসহ),**

**(ولو خلوا سبيل الأسير وأعطوه الأمان على أن يكون في بلادهم فلا بأس للأسير أن يغتالهم ويقتل من قوي عليه سراً أو يأخذ ما شاء من أموالهم، لأنه ما أعطاهم الأمان و إنما هم أعطوه الأمان، وذلك لا يمنعه من أن يفعل بهم ما يقدر عليهم، إلا أن يكون أعطاهم الأمان، فحينئذ ينبغي لنا ألا نتعرض لهم بشيء من ذلك) لأن ذلك يكون غدراً منه، والغدر حرام. (ولكنه إن قدر على أن يخرج سراً إلى دار الإسلام فلا بأس بأن يخرج، وإن كان أعطاهم الأمان من أن يفعل ذلك) لأن حبسهم إياه في دارهم ظلم منهم له، فله أن يمتنع من الظلم) .فإن منعه إنسان من ذلك فلا بأس بأن يقاتله ويقتله) لأنه ظالم له في هذا المنع .اهـ شرح السير الكبير2\7، باب من الفداء**

“হরবিরা যদি কোন মুসলিম বন্দীকে মুক্তি দিয়ে দেয় এবং তাকে এই শর্তে আমান দেয় যে, তাকে তাদের (হরবিদের) দেশেই থাকতে হবে, তাহলে উক্ত বন্দীর জন্য হরবিদের যাকে পারে গোপনে হত্যা করে দিতে কিংবা তাদের যে কোন সম্পদ নিয়ে নিতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, তারা তাকে আমান দিলেও সে তো তাদেরকে আমান দেয়নি। তাদের পক্ষ থেকে দেয়া আমান তার জন্য তাদের মাঝে (হত্যা-লুণ্টন) যা পারে করার পথে বাধা হবে না। হ্যাঁ, সে যদি তাদেরকে আমান দিয়ে থাকে, তাহলে কথা ভিন্ন। তখন আমাদের জন্য উচিৎ হলো, তাদের মাঝে (হত্যা-লুণ্টন) এর কোন কিছুই না করা। কেননা, এটা গাদ্দারি হবে। আর গাদ্দারি হারাম। তবে সে যদি গোপনে দারুল ইসলামে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তাহলে পালিয়ে আসতে কোন সমস্যা নেই- যদিও সে তাদেরকে এটি না করার প্রতিশ্রুতি

দিয়ে থাকে। কেননা, তাদের দেশে তাকে আটকে রাখা জুলুম। আর জুলুম প্রতিহত করার অধিকার তার আছে। **যদি পালিয়ে আসার পথে কোন ব্যক্তি তাকে বাধা দেয়, তাহলে তার সাথে মারামারি করতে বা তাকে হত্যা করে দিতে কোন সমস্যা নেই। কেননা, বাধা দেয়ার দ্বারা সে তার উপর জুলুম করছে।** [আর নিজের উপর থেকে জুলুম প্রতিহত করার অধিকার তার আছে।]"- শরহুস সিয়ারিল কাবির ২/৭

**والله سبحانه وتعالى أعلم**

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২১১৮

# কাফের জনসাধারণের উপর আক্রমনের বিধান

[Fahim Abrar](#)

Junior Member

০২-১৫-২০১৯

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি অমুখাপেক্ষী। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তারঁ পরিবারবর্গ, সংগি-সাথী, বিশ্বের সকল প্রান্তে থাকা মুমিন-মুসলিমদের উপর।

বর্তমান সময়ের অত্যন্ত আলোচিত একটি প্রসঙ্গ হচ্ছে, "কুফফারদের জনসাধারণের উপর হামলা।" অনেকে এর পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করছেন, আবার অনেকেই এর তীব্র বিরোধিতা ও সমালোচনা করছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, শরীয়াতে এ ধরণের হামলার কোনো বৈধতা আছে না নেই? অত্র লেখনীতে এই বিষয়টি নিয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফ আস সালিহীনের বক্তব্যের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের জানতে হবে কোন ধরণের কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বা যুদ্ধ করা বৈধ, আর কাদের বিরুদ্ধে বৈধ নয়। নিম্নে এই বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হল।

কাফেরদের ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ

**প্রথম শ্রেণীঃ একজন কাফের যার সাথে মুসলিমদের চুক্তি আছে** তাদের মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ স্থগিত রাখার ব্যাপারে শান্তিচুক্তি আছে। যতক্ষণ তারা চুক্তির সাথে অংগীকারবদ্ধ, শরীআহ তাদের অর্থ ও রক্তকে যে কোনো ধরণের লক্ষ্য বানাতে নিষেধ করে।

**দ্বিতীয় শ্রেণীঃ জিম্মি** জিম্মি হচ্ছে এমন একজন কাফের, যে ইসলামের বিধান ও নিরাপত্তার অধীনে বাস করে। তারা মুসলিমদের জিজিয়া দেয়। যেহেতু তারা তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে অনুগত ও জিজিয়া দেয়, তাই শরীআহ তাদের রক্ত ও সম্পদে যে কোনো ধরণের আক্রমণ করতে নিষেধ করে।

**তৃতীয় শ্রেনীঃ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফের** এরা হচ্ছে সেসব কাফের যারা মুসলিম ভূমিতে বসবাস না করার ইচ্ছায় প্রবেশ করে এবং একজন মুসলিম দ্বারা নিজের ও সম্পদের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। যতক্ষণ না পর্যন্ত সে নিজের মুক্তি প্রত্যাহার করে অথবা নিরাপদ অন্য কোনো পরিবেশে না যাচ্ছে, ততক্ষণ শরীআহ তাদের রক্ত ও সম্পদে যে কোনো ধরণের আক্রমণ করতে নিষেধ করে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

**وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ**

"আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে, তুমি তাকে আশ্রয় দাও যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। তা এ জন্য যে, তারা অজ্ঞ লোক।" [আত-তাওবাহ (৯): ৬]

অর্থ্যাৎ যদি কোনো অমুসলিম দেশ থেকে কোনো দূত বা ব্যবসায়ী বা সন্ধি করতে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি কিংবা জিজিয়া আনয়নকারী ব্যক্তি কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে আগমন করে এবং ইমাম বা নায়েবে ইমাম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে তবে যে পর্যন্ত সে ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থান করবে এবং স্বদেশে না পৌঁছবে, সে পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হারাম। কিন্তু আলেমগণ বলেন যে, এরুপ ব্যক্তিকে বছর ধরে বাস করতে দেয়া যাবেনা। বড়জোর তাকে চারমাস পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করার অধিকার দেয়া যেতে পারে। [তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা তাওবাঃ ৬ এর তাফসীর দ্রষ্টব্য]

**চতুর্থ শ্রেণীঃ যুদ্ধরত কাফের:** এরা হল তারা যাদের মুসলিমদের সাথে কোনো চুক্তি বা নিরাপত্তার অংগীকার নেই। এরা উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না, চাই তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক বা না করুক। "যোদ্ধা" শব্দটি তাদের সাথে একদম অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে দ্বিধাদ্বন্দের উদ্ভব হয় যে, যুদ্ধরত হল তারা, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারি। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। সত্য হল, এ ধরণের কাফের, যাদের মুসলিমদের সাথে কোনো চুক্তি বা নিরাপত্তার অংগীকার নেই, তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা যখন চাইবে তখন লড়াই করা অনুমোদনযোগ্য। আর এটাই হল আক্রমণাত্বক জিহাদ।

আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে, আক্রমণাত্বক জিহাদ হবে সেইসব কাফেরদের বিরুদ্ধে, যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, যেখানেই তারা থাকুক। এমনকি যদি তারা মুসলিমদের প্রতি কোমলও হয় ও যুদ্ধ শুরু নাও করে।

এ ব্যাপারে দলিল হচ্ছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহঃ "তোমরা যে মুশরিকদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছিলে, আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ হতে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হল।

সুতরাং (হে মুশরিকরা!) তোমরা দেশে চার মাস (নিরাপদে) চলাফেরা কর। আর জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এ এক ঘোষণা যে, আল্লাহর সাথে অংশীবাদীদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তাঁর রসূলের সাথেও নয়। যদি তওবা কর, তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে, আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না। আর অবিশ্বাসীদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও।

তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, তোমরা তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন কর। নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানীদেরকে ভালোবাসেন।

**فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ**

অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে বন্দী কর, অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, যথাযথ সলাত পড়ে ও যাকাত প্রদান

করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আত-তাওবাহ (৯): ৫]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "যাদের সাথে চুক্তি হয়েছিল, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য চার মাসের সীমা নির্ধারণ করে দেন। আর যাদের সাথে চুক্তি ছিল না, তাদের জন্য হারাম মাসগুলো অতিক্রান্ত হওয়াকে সীমা নির্ধারণ করে দেন। অর্থ্যাৎ ১০ই জিলহজ্ব হতে মুহররম মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত ৫০ দিন। এই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়, যে পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর যাদের সাথে চুক্তি আছে তারা ১০ই জিলহজ্ব ঘোষনার দিন থেকে ২০শে রবিউল আখির পর্যন্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। অতঃপর ইচ্ছা করলে মুকাবিলা করবে।" [তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা তাওবাঃ ১ এর তাফসীর দ্রষ্টব্য]

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, যাদের সাথে মুসলিমরা চুক্তিবদ্ধ থাকছে না, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের আদেশ দিচ্ছেন। এখানে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শর্ত করা হয়নি।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন:

**قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ**

তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন(ধর্ম) অনুসরণ করে না, যতক্ষণ না নত হয়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। [সূরা তাওবাহ (৯): ২৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বিখ্যাত 'আল-উম্ম কিতাবে বলেন, “মূল ফরজ হলো, মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে অথবা জিজিয়া দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে থাকে।”

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) আরও বলেন: বরকতময় আল্লাহ তাআলা কাফেরের রক্ত ও মাল বৈধ করে দিয়েছেন, তবে যদি সে জিযিয়া প্রদান করে অথবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিরাপত্তা চুক্তিতে থাকে তাহলে নয়। [আল-উম্ম - ১/২৬৪]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, মুসলিম ব্যক্তি যখন এমন কোন কাফেরের সাথে সাক্ষাত করে যার সাথে কোন চুক্তি নেই, তখন তাকে হত্যা করা জায়েজ। [তাফসীরে কুরতুবী-৫/৩৩৮]

ইবনে কাছির (রহঃ) বলেন: ইবনে জারীর (রহঃ) এই ব্যাপারে ইজমা বর্ননা করেছেন যে, মুশরিকদেরকে হত্যা করা জায়েজ, যদি তাঁর সাথে 'আমান' বা নির্দিষ্ট নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি না থাকে। যদিও সে বাইতুল হারাম বা বাইতুল মাকদিসে (পূন্যময় স্থানে) গমনরত অবস্থায় থাকে। [তাফসীরে ইবনে কাছীর-২/৬]

ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেনঃ "এব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, কোনো মুশরিক যদি তাঁর গর্দানে, দুই বাহুতে দাড়িতে হারাম শরিফের সমস্ত লতা-পাতা লটকিয়ে রাখে তার যদি 'আমান' বা নির্দিষ্ট নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি না থাকে তাহলে তাকে হত্যা থেকে ঐ কাজটি নিরাপত্তা দিবে না।" [তাফসীরে তাবারী-৬/৬১]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, যেসকল কাফেরদের সন্ধিচুক্তি, আমান বা নির্দিষ্ট নিরাপত্তা চুক্তি নেই, তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে কোন জিম্মাদারী নেই। চাই সে যেকোন ধর্মেরই হৌক না কেন। [রওজাতুত তালেবীন- ৯/২৫৯]

ইবনু মুফলিহ (রহঃ) বলেন: কাফের এর সাথে যদি কোন 'আমান' না থাকে তাহলে তাঁকে হত্যা করলে কোন ধরনের দিয়ত বা কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা সাধারণভাবে তাঁর রক্ত শুকুরের রক্তের ন্যায় বৈধ। [মিবদা'-৮/২৬৩]

অতএব, যদি এইরকম কাফেরদের ব্যাপারে যদি এই নিয়ম হয়, তাহলে সেইসব কাফেরদের ব্যাপারে কেমন আচরণ হবে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে এবং মুসলিমদের ভূমি দখল করে রেখেছে? অবশ্যই এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অগ্রাধিকার পাবে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে সীমালংঘন করো না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" [আল-বাকারাহ ২: ১৯০]

**এখন প্রশ্ন হল, এই চতুর্থ শ্রেণী তথা হারবি বা যুদ্ধরত কাফেরদের জনসাধারণের উপর হামলা করা বৈধ কি না?**

এই প্রশ্নের উত্তর হল, তাদের নারী, শিশু ও বৃদ্ধ, যারা যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়, তাদের উপর হামলা করা স্বাভাবিকভাবে বৈধ নয়।

যেমন, আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন এক যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন তিনি নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন। [সহীহ মুসলিম (ইফাঃ), কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, হাদিসঃ ৪৩৯৭-৪৩৯৮]

রাবাহ ইবনে রাবীহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "আমরা কোনো এক যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তিনি কিছু লোককে একস্থানে একত্রিত হতে দেখেন। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠান এবং বলেনঃ দেখ তো, এরা কেন সেখানে একত্রিত হয়েছে? তখন সে ব্যক্তি ফিরে এসে বললঃ তারা জনৈক নিহত মহিলার নিকট একত্রিত হয়েছে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ এ মহিলা তো কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসেনি (একে মারা হল কেন?)। তখন এক ব্যক্তি বললঃ অগ্রবর্তী সেনাদলের নেতা হলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে বললেনঃ খালিদকে বল, মহিলা ও মজুরদের যেন হত্যা না করে। [আবু দাউদ (ইফাঃ), অধ্যায়ঃ জিহাদ, হাদিসঃ ২৬৬০]

ইবনে আব্বাস (রাঃ), উমার বিন আব্দুল আজিজ (রহঃ), মুকাতিল বিন হিব্বান (রাঃ) প্রমুখ মনীষীগণ "তবে সীমালংঘন করো না(**وَلَا تَعْتَدُوا**) ....."(আল-বাকারাহ ২: ১৯০) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, শত্রুর আঙ্গিক বিকৃতি ঘটায়ো না, শিশু এবং এমন বৃদ্ধদের হত্যা করো না, যাদের যুদ্ধ করার কোনো যোগ্যতা নেই

এবং যুদ্ধে কোন প্রকার অংশগ্রহণও করেনি। আর সংসার ত্যাগীদেরকেও হত্যা কোরো না। অনুরূপ গাছ-পালা বা ফসলাদি জ্বালিয়ে দেওয়া এবং কোন অভীষ্ট লাভ ছাড়াই পশু-হত্যা করা ইত্যাদিও বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে, যা থেকে বিরত থাকতে হবে। [ বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ তাফসীর ইবনে কাসীর, আল-বাকারাহ ২: ১৯০ এর তাফসীর ]

তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে তাদের নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও সংসার ত্যাগীরাও আক্রমণের শিকার হওয়ার যোগ্য হতে পারে।

**(১) সাহায্য ও সমর্থনঃ** যদি কোনো নারী, শিশু বা বৃদ্ধ যুদ্ধে সরাসরি সাহায্য করে অথবা অন্তত যদি সমর্থনও দেয়, তাহলে তারা একই দোষভুক্ত হয়ে যায়। এই শ্রেণীর লোকেরা নিরীহ বা বেসামরিক হিসেবে সাব্যস্ত হবে না বরং তারা 'রিদা' অর্থ্যাৎ তারা সমর্থক ও সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত যোদ্ধা হিসেবে গণ্য হবে।

যেমন, সালেহ (আঃ) এর সামূদ জাতির দাবি অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সালেহ (আঃ) কে একটি উটের মৌজিজা প্রদান করেছিলেন, যেই উটটি একটি পাথরের ভূমি থেকে বের হয়ে এসেছিল। এতবড় নিদর্শন দেখার পরেও সামূদ জাতি নবী সালেহ (আঃ) কে অস্বীকার করে বসল। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই উটের কোনো ক্ষতি না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কওমে সামূদের এক ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত সেই উটটিকে হত্যা করে ফেলল এবং এর ফলস্বরুপ আল্লাহ তায়ালা হযরত সালেহ (আঃ) ও তার অনুসারীগণ ব্যতিত পুরো কওমকেই আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও উটটির হত্যাকারি ছিল একজন, কিন্তু উটটির এই হত্যাকান্ডে পুরো সম্প্রদায়ের সমর্থন ছিল। হযরত কাতাদা (রহঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি ওকে (উটটিকে) হত্যা করেছিল, তার কাছে সবাই গিয়েছিল। এমনকি স্ত্রীলোকেরাও এবং বালকেরাও।" যার কারণে তারা সকলেই আল্লাহর আজাবের ভাগিদার হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তায়ালা আজাব দিয়ে পুরো সামূদ জাতিকেই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। [ বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আ'রাফ ৭: ৭৩-৭৮ এবং আশ-শামস ৯১: ১১-১৫ এর তাফসীর ]

সুতরাং আজকেও যারা মুসলিম হত্যায় সরাসরি অংশগ্রহণ করছে (যেমন বিভিন্ন দেশের সরকার ও সেনাবাহিনী), তারা যেমন হত্যার উপযুক্ত, ঠিক একইভাবে, যারা তাদেরকে তাদের এই হত্যাযজ্ঞে সমর্থন করছে, তারাও হত্যার উপযুক্ত।

ইবন আব্দুল বার (রহঃ) বলেছেনঃ "নারী ও বৃদ্ধদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করছে তাদের হত্যার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম কোনো মতপার্থক্য করেননি। আর সেই সাথে যেসব শিশু যুদ্ধ করতে সক্ষম আর যুদ্ধ করছে, তাদেরকেও হত্যা করতে হবে।" [আল-ইস্তিসকার, ১৪/৭৪]

অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ "তারা (ওলামায়ে কেরাম) এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরাইদ ইবন আস-সুম্মা কে হুনায়ুনের দিন হত্যা করেছিলেন কারণ সে ছিল যুদ্ধের একজন পরামর্শদাতা ও কৌশল নির্ধারক। সুতরাং বৃদ্ধদের মধ্যে এরকম যে কেউই থাক না কেন, সকলের মতে তাকে হত্যা করা হবে।" [আত-তামহিদ, ১৬/১৪২]

**(২) আলাদা করতে সক্ষম না হওয়াঃ** এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন চলে আসে তা হল, কুফফারদের মধ্যে সকলেই তো আর এইসব হত্যাযজ্ঞে সমর্থন করে না। তাহলে যারা সমর্থন করে না, তারাও কি হত্যার যোগ্য? এর জবাব নিম্নে প্রদান করা হল।

যদি কুফফারদের এই দুই দলের মধ্যে আলাদা করা সম্ভব না হয়, কিন্তু কুফফারদের উপর আক্রমণ করা মুসলিমদের বৃহৎ স্বার্থের জন্য জরুরি হয়, তাহলে তাদের উপর হামলা করা বৈধ।

সা'ব ইবনু জাছছামা (রাঃ) থেকে বর্নিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি অশ্বারোহীদল রাতের আঁধারে আক্রমণ চালায় এবং তাতে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের আক্রান্ত করে (তবে কি হবে)? তিনি বললেনঃ তারাও তাদের পিতাদের অন্তর্গত। [সহীহ মুসলিম (ইফাঃ), কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, হাদিসঃ ৪৩৯৯-৪৪০১]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই হাদিস যে অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবেঃ "রাতের অতর্কিত আক্রমনে অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী ও শিশু হত্যায় দোষ নেই।"

ইমাম আন-নববী (রহঃ) বলেছেনঃ "'তারাও তাদের পিতাদের অন্তর্ভুক্ত'-অর্থ্যাৎ এতে কোনো সমস্যা নেই কারণ তাদের পিতাদের ব্যাপারে হুকুম তাদের ওপর বর্তায় যেমন উত্তরাধিকার, বিবাহ, কিসাস, দিয়াত (রক্তপণ) এবং অন্যান্য আরো বিষয়। আর এক্ষেত্রে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, জরুরি অবস্থায় পড়া ছাড়া তাদেরকে হত্যা করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না; আর যে হাদিসে নারী ও শিশুদের হত্যা করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেটা তখনই প্রযোজ্য যখন তাদেরকে পৃথক করা সম্ভব। আর রাত্রিকালীন আক্রমণ ও রাত্রিকালীন আক্রমণে নারী ও শিশু হত্যার অনুমতি সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাপারে আমাদের বিশেষজ্ঞ অভিমত, সেই সাথে মালিক ও আবু হানিফার এবং অধিকাংশের অভিমত এটাই।" [সহীহ মুসলিম বি শারহ আন নববী, ১২/৪৮-৫০]

ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেছেনঃ "আল-বায়াত (রাত্রিকালীন আক্রমণ) এর সময় ও যুদ্ধের পরিখাগুলোতে নারী ও শিশুদের হত্যা করা বৈধ, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের পৃথকভাবে সনাক্ত করা যাচ্ছে। আর তাদের হত্যা ও পরাজিত করার জন্য (তাদের নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে) তাদের গবাদি পশুগুলোকেও হত্যা করা বৈধ। আর এ বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই।" তিনি আরো বলেছেনঃ "শত্রুদের রাতে আক্রমণ করা বৈধ। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'রাত্রিকালীন আক্রমণে কোনো সমস্যা নেই। আর রোমানদের কি রাত্রিকালীন ছাড়া অন্য কোনো সময় অবরুদ্ধ করা হয়েছিল?' তিনি আরো বলেন, 'আমরা এমন কারো কথা জানি না যিনি এই রাত্রিকালীন আক্রমণকে অবৈধ বলেছেন।" "সুতরাং যদি বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তবে আমরা বলব, সেটি তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আহমাদ বলেন, 'যদি তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ব্যাপার হয়, তবে (তা জায়েজ) না।' তিনি বলেন, আস সাবের হাদিসটি এসেছে নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধের পরে, নারী ও শিশু হত্যার ব্যাপারে তার নিষেধ এসেছে যখন তিনি ইবন আবু হুকায়িককে হত্যার জন্য লোক পাঠান আর এজন্যই এ দুটির মধ্যে সমন্বয়

করা সম্ভব; ইচ্ছাকৃতভাবে (তাদের হত্যা) করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যক্ষেত্রে বিশেষ অনুমতি।" [আল মুগনি ওয়াশ শারহ, ১০/৫০৩]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেনঃ "আর এই অভিমত নেই না যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (প্রথমে) নারী ও শিশুদের হত্যার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন এবং পরবর্তিতে তা নিষেধ করেছেন। আমাদের মতে, নারী ও শিশুদের হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা হল তাদেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে এবং যেসব পরিস্থিতিতে তাদেরকে ঐসব ব্যক্তি থেকে সনাক্ত ও আলাদা করা সম্ভব সেসব পরিস্থিতির জন্য।.....'তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' - এই বক্তব্যের অর্থ দ্বারা তাদের দুটি বৈশিষ্ট্যের দিকে ইংগিত করা হয়; প্রথমত তারা ঈমানের পরিধিতে নেই, থাকলে তাদের রক্ত ঝড়ানো (মুসলিমদের জন্য) হারাম হত। দ্বিতীয়ত, তারা দারুল ঈমানে বসবাসকারীদের মধ্যেও গণ্য নয়, নতুবা তাদের ঘরে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ হত। আর একারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রিকালীন আক্রমণ ও তাদের ঘরে আক্রমণ করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি বনু মুসতালিকের উপর আক্রমণ করেছেন যখন তারা অপ্রস্তুত ছিল। আর এ কথা সবারই জানা যে, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুমতি সাপেক্ষে কেউ রাত্রিকালে আক্রমণ চালালে নারী ও শিশুদের আক্রান্ত না করে তা সম্পন্ন করতে পারবে না।.....এবং তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা ঠিক নয়, যখন তাদেরকে আলাদা করা এবং চেনা সম্ভব হয়। শিশুদের হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার কারণ হল তারা এখনো কুফরের উপর বয়োপ্রাপ্ত হয়নি যার জন্য তাদেরকে হত্যা করা যায়; আর নারীদের হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার কারণ হল, তাদের মধ্যে যুদ্ধে জড়াবার কোনো আগ্রহ বা ইচ্ছা নেই।" [আল ইতিবার ফি আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ - আল হাজিমি]

আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম কোনো কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের গোলা ব্যবহার করেছেন। আর এটা সবাই জানে যে, যখন কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হয়, তখন এটা দেখে না কে যোদ্ধা আর কে যোদ্ধা নয়। আর এটি এমন কাউকে গিয়ে আঘাত করতে পারে যারা হয়ত অযোদ্ধা তথা বেসামরিক।

ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেছেনঃ "কামানের গোলা নিক্ষেপ করা জায়েজ কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তায়িফের বিরুদ্ধে কামান (মিনজানিক) ব্যবহার করেছিলেন আর আমর ইবনুল আস (রাঃ) ইস্কান্দারিয়ার লোকজনের উপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করেছিলেন।" [আল মুগনি ওয়াশ শারহ, ১০/৫০৩]

ইমাম কুদূরী (রহঃ) বলেনঃ "আর তাদের বিরুদ্ধে মিনজানিক (কামান) মোতায়েন করবে। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তায়েফের বিরুদ্ধে করেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জ্বালাও পোড়াও চালাবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বোয়াইরা এলাকা (প্রয়োজনে) জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন"। [আল হিদায়া (ইফাঃ), অধ্যায়ঃ জিহাদ, ২/৪৩২]

উপরোক্ত আলোচনার সারাংশ হচ্ছে, কাফিরদের মধ্যে যাদের হত্যার উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালিত হয়, তাদের থেকে ঐসব নারী ও শিশুদের আলাদা করা ও চেনা সম্ভব না হলে তাদেরকে (নারী ও শিশুদের) হত্যার মাঝে কোনো পাপ নেই - যতক্ষণ না তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আর আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আর এর মাধ্যমে একটা বিষয় স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, যারা "নিরীহ জনগণের হত্যা" ইস্যুটি কোনো সীমাবদ্ধতা বা নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই বারবার উল্লেখ করছেন, তারা মূলত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর সাহাবী ও তাদের উত্তরসূরিদেরই দোষারোপ করছেন, তাদের ভাষ্যমতে "নিরীহ জনগণের হত্যাকারী" হিসেবে।

**একটি সংশয়ের জবাবঃ** বিভিন্ন কুফফার দেশে অনেক মুসলিমরাও বসবাস করে। কুফফারদের উপর হামলা হলে সেক্ষেত্রে মুসলিমরাও সেই হামলার শিকার হতে পারে, যেহেতু কুফফারদের সাথেই তারা চলাফেরা করছে। এক্ষেত্রে কাফেরদের উপর কিভাবে হামলা করা যাবে, যেখানে মুসলিরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে?

এই প্রশ্নের জবাব উপরোক্ত ২ নং পয়েন্টের মতই। আর তা হল, এই মুসলিমদের ততক্ষণ মারা যাবে না, যতক্ষণ তারা পৃথক অবস্থানে থাকবে। আর যদি তারা কুফফারদের সাথে সহাবস্থানে থাকে আর যদি একারণে তাদেরকে এড়িয়ে আক্রমণ করা সম্ভব না হয়, এমতাবস্থায় সেই মুসলিমদের হত্যা করা বৈধ।

ইসলামের ফকীহগণ সেসব মুসলিমদের হত্যা করা বৈধ বলেছেন যাদেরকে কাফেররা ঢালস্বরূপ ব্যবহার করছে; যদি তারা কাফেরদের হাতে বন্দি হয় আর কাফেররা মুসলিমদের মোকাবিলা করার সময় তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন।

ইবন তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেনঃ "এ ব্যাপারে আলেমরা একমত হয়েছেন যে, যদি কুফফাররা মুসলিম বন্দীদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আর এই ভয় থাকে যে লড়াই না করলে মুসলিমদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, এমতাবস্থায়ও মুসলিমদের উচিত লড়াই চালিয়ে যাওয়া, যদিও এর ফলস্বরূপ মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত মুসলিমদের মারা পড়তে হবে।" [ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়াহ, ২৮/৫৩৭ ও ২০/৫২]

ইবন কাসিম (রহঃ) বলেছেনঃ "যদি তারা মুসলিমদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে তাদের উপর আক্রমণ করা জায়েজ হবে না, যদি না (সমগ্র) মুসলিমদের ব্যাপারে আশংকা থাকে। (এক্ষেত্রে) তার উচিত তাদের (মুসলিমদের) আক্রমণ করা শুধুমাত্র কুফফারদের আঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। আর এ বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই।" [আল হাশিয়া আলা আর রাওধ, ৪/২৭১]

ইমাম কুদূরী (রহঃ) বলেনঃ "তাদের (কাফেরদের) মাঝে মুসলিম বন্দী বা ব্যবসায়ী থাকলেও তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে বাধা নেই। কেননা তীর বর্ষণে ইসলামের কেন্দ্র থেকে প্রতিরোধের মাধ্যমে বৃহৎ ক্ষতিরোধ করা হয়। পক্ষান্তরে মুসলিম বন্দী বা ব্যবসায়ী নিহত হওয়ায় সীমিত ক্ষতি। তাছাড়া খুব কম দুর্গই কিছুসংখ্যক মুসলিম থেকে খালি হয়। সুতরাং তা বিবেচনা করে যদি বিরত থাকতে হয় তবে জিহাদের দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে।

যদি তারা মুসলিম বালকদের কিংবা বন্দিদের 'ঢাল' রূপে ব্যবহার করে তাহলে (আমাদের বর্ণিত কারণে) তাদের প্রতি তীর বর্ষণ থেকে বিরত থাকবে না। অবশ্য কাফিরদের প্রতি তীর বর্ষণের নিয়ত করবে। কেননা কার্যতঃ পার্থক্য করা অসম্ভব হলেও উদ্দেশ্যগতভাবে তা সম্ভব। আর আদেশ পালনের দায়িত্ব সাধ্য অনযায়ী। আর ওই মুসলিমদের যে কজন তাদের (মুজাহিদদের) তীর বর্ষণের শিকার হবে, তাদের দিয়ত মুজাহিদদের উপর ওয়াজিব হবে না। আর কাফফারাও ওয়াজিব হবে না"। [আল হিদায়া (ইফাঃ), অধ্যায়ঃ জিহাদ, ২/৪৩২]

শেষ করছি ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) এর একটি বক্তব্য দিয়ে। ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই উত্তম প্রতিশোধ নেয়া তাদের অধিকার। তাদের জন্যে মনোবল পুনরুদ্ধার ও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসব বৈধ। তারপরও তারা চাইলে প্রতিশোধ গ্রহণ নাও করতে পারে, যখন সবর করাই উত্তম।

কিন্তু এটা (সবর) কেবল তখনই করা উচিৎ, যখন এ প্রতিশোধ জিহাদের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখবে না বা তাদের (শত্রুদের) অন্তরে ভয় বৃদ্ধি করবে না (যাতে করে তারা বিরত থাকে) বা এমনই কিছু। কিন্তু, একটি বড়সড় উত্তম প্রতিশোধ যদি তাদেরকে (কাফেরদেরকে) ঈমানের দিকে দাওয়াত দেয়ার মাধ্যম হয় বা এতে করে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়, তাহলে এক্ষেত্রে এই প্রতিশোধ হুদুদ (শরয়ী শাস্তি) ও একটি শরীয়াহ ভিত্তিক জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে।" [ ইবন মুফলিহ কর্তৃক বর্ণিত, ৬/২১৮ ]

**সংকলনের সূত্রসমূহঃ**

১/ একাকী জিহাদের বিধিবিধান - শাইখ হামীদ আল তামীমি

২/ ইসলামের দৃষ্টিতে ৯/১১ - আল্লামা হামুদ বিন উক্বলা আশ-শুয়াইবি রহঃ

৩/ তাফসীর ইবনে কাসীর ৪/ বেসামরিক হত্যার মাসায়েল

৫/ হারবি কুফফারদের কতল করার দলিলঃ শায়খুল হাদিস আবু ইমরান (হাফিঃ)

৬/ শাইখ আনোয়ার আল আওলাকির (রহঃ) লেকচার

৭/ জিহাদ বিষয়ক মৌলিক আলোচনা - শাইখ আব্দুল ক্বাদির ইবনে আব্দুল আযিয

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৪০৯

# ন্যাটোভুক্ত দেশের অমুসলিম নাগরিকদের হত্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৪-১০-২০১৯

লোন উলফ ম্যাগাজিন পড়ার পর এক ভাইয়ের প্রশ্ন ছিল:

১. "তুরস্ক ছাড়া ন্যাটোভুক্ত অন্য দেশগুলোর যে কোন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করা জায়েয" কথাটি কোরআন হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক কি'না?

২. তুরস্ক ছাড়া কেন?

৩. অমুসলিম ও তাগুতের অনুসারীদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেওয়া জায়েয কি'না? হলে কিভাবে জায়েয?

**উত্তর:**

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রহীম

তুরস্ককে বাদ দেয়ার বিষয়টাতে মুহতারাম মডারেটর ভাই সংক্ষেপে জওয়াব দিয়েছেন। **[কিছু আলোচিত সংশয়ের জবাবে "গণতন্ত্র, হামাস, জিহাদ, শাসক বাহিনী এবং ভিসা ও আমান" নিয়ে বিশেষ আর্কাইভ]** শিরোনামে ফোরামে যে আর্কাইভ দেয়া হয়েছে, সেখানে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত জওয়াব পেয়ে যাবেন। আমি ইনশাআল্লাহ মাঝামাঝি একটা জওয়াব দেয়ার চেষ্টা করছি।

**এক.** প্রথমে তুরস্কের বিষয়টাতে যাই। লোন উলফের উদ্দেশ্য এমনসব সুস্পষ্ট কাফের, যাদের কুফরির ব্যাপারে সাধারণত কারো সংশয় নেই এবং যাদেরকে হত্যা করলে সাধারণত আপত্তি হবে না বা কম হবে। এ ধরণের কাফের-মুরতাদ লোন উলফের টার্গেট। কোন মুসলমান কোনক্রমেই টার্গেট নয়। এজন্য আপনি হয়তো ম্যাগাজিনে লক্ষ করেছেন যে, বার বার সতর্ক করা হয়েছে: যেন মুসলমানদের কোন ক্ষতি না হয়। আক্রমণ যে রাষ্ট্রেই হোক, কোন মুসলমান যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমেরিকা-ইসরাঈলে হামলা হলেও মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার ব্যাপারে

সতর্ক থাকতে হবে। সম্ভবত ন্যাটো-জোটভুক্ত সবগুলো রাষ্ট্রই কাফের রাষ্ট্র। একমাত্র তুরস্কই ব্যতিক্রম যে, মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব-কুফরি-সামরিকজোট ন্যাটোতে যোগ দিয়েছে। তুরস্ক মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ায় এবং তার নাগরিকরা মুসলমান হওয়ায় তাকে বাদ দেয়া হয়েছে। যদি অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্র ন্যাটোতে থাকতো, তাহলে ম্যাগাজিনে তাকেও বাদ দেয়া হতো। শুধু তুরস্ক নিয়েই কথা না।

তবে বাদ দেয়ার দ্বারা আসলে অন্য কাফের রাষ্ট্র থেকে তুরস্কে আগত কিংবা তুরস্কে বসবাসরত কাফেরদের বাদ দেয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং মুসলিম নাগরিকদের বাদ দেয়া উদ্দেশ্য। নতুবা আপনি লক্ষ করেছেন যে, ম্যাগাজিনে আমাদের দেশেরও গুরুত্বপূর্ণ কাফেরদের টার্গেট করতে বলা হয়েছে। তুরস্ককে বাদ দেয়ার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, সাধারণ মুসলিমদের কোন ক্ষতি করা যাবে না; তবে যে কোন দেশের মতো সেখানেও গুরুত্বপূর্ণ কাফেরদের টার্গেট করা যাবে। তবে সংক্ষেপ করতে গিয়ে ম্যাগাজিনে বিষয়টা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। অন্যথায় সামগ্রিক ম্যাগাজিন থেকে বিষয়টা স্পষ্ট।

**দুই.** সকল হরবি কাফেরের জান-মাল মুসলমানদের জন্য হালাল। একমাত্র দারুল ইসলামে জিযিয়া দিয়ে মুসলমানদের জিম্মি হয়ে যারা থাকে কিংবা অস্থায়ীভাবে মুসলমানদের থেকে যারা আমান নিয়েছে, তারাই এর ব্যতিক্রম। এ ছাড়া সকল হরবি কাফেরের জান-মাল মুসলমানদের জন্য হালাল। যেখানে পাওয়া যাবে হত্যা করা যাবে। লুণ্ঠন করা যাবে। স্পষ্ট যে, ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সকল কাফের হরবি কাফের। তাদের সাথে আমাদের কোন আমানের চুক্তি নেই। তাই তাদের জান-মাল মুসলমানদের জন্য হালাল। এ ব্যাপারে আপনি নিচের লেখাটা দেখতে পারেন-

**আমানবিহীন সকল কাফেরের জান-মাল হালাল**

**লিংক:**https://archive.org/download/AmanbihinKafer/Amanbihin%২০kafer.pdf

**তিন.** হরবি কাফেরদের জান-মাল যেহেতু মুসলমানদের জন্য হালাল, তাই তাদের যে কোন প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেয়া যাবে। তবে যথাসম্ভব মুসলমানদের যেন ক্ষতি না হয়, সে বিষয়টা লক্ষ রাখতে হবে। মুসলিম নামধারী তাগুতরাও হরবি কাফের। তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, যেগুলোতে সাধারণ মুসলিমদের অংশ নেই, সেগুলোর

ব্যাপারেও একই কথা। এগুলো জ্বালিয়ে দিতে কোন সমস্যা নেই। আর যেগুলোতে সাধারণ মুসলিমদের অংশ আছে, সেগুলোর কথা ভিন্ন। তবে যেকোন হামলার ক্ষেত্রেই তাতে মাসলাহাত কতটুকু তা বিবেচনায় রাখতে হবে। মুহতারাম ভাই, আশাকরি বুঝতে পেরেছেন। আরেকটু পরিষ্কার হওয়ার জন্য আপনি মিম্বারুত তাওহিদের নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তর দুটি দেখুন-

♣ প্রশ্ন নং- ১৫৪৫: আমাদের মুসলিম ভাইদের প্রতিশোধরূপে নাইজেরিয়ান খৃস্টানদের উপর আক্রমণের কি বিধান?

লিংক:https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.ph...২৪৫৩;&%২৩২৪৯৫;

♣ প্রশ্ন নং- ৩১৯০: মিশরের যেসব খ্রিস্টান আমাদের মুসলিম বোনদের অপহরণ করে, তাদের কি কোন ধরণের আমান-অঙ্গীকার বহাল থাকবে?

লিংক:

https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.ph...২৪৫৩;&%২৩২৪৯৫;

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৯৮৪

# যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২০

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৪-২৫-২০১৯

অনেক দিন যাবৎ কাজটা বন্ধ ছিল। আল্লাহ তাআলার তাওফিকে আবার শুরু হল। যিন্দিকের আলোচনা চলছিল। কিছু আলোচনা হয়েছিল। বাকি অংশ আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। যিন্দিক ধৃত হওয়ার পর তাওবা করলেও তার তাওবা গ্রহণ করা হবে না, বরং হত্যা করা হবে। হ্যাঁ, খালেস নিয়তে তাওবা করলে আখেরাতে আল্লাহ তাকে মাফ করবেন- সেটা ভিন্ন কথা। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত দলীল আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

**ধৃত হওয়ার পর দুনিয়াতে যিন্দিকের তাওবা কবূল না হওয়ার দলীল: ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১ হি.) বলেন,**

**ومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه قوله تعالى: {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا} [التوبة: 52] قال السلف في هذه الآية: {أو بأيدينا} [التوبة: 52 ] بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم، وهو كما قالوا؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل؛ فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم لم يمكن المؤمنين أن يتربصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم؛ لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يصابوا بأيديهم قط، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. اهـ [إعلام الموقعين: 3\107]**

“ধৃত হওয়ার পর যিন্দিকের তাওবা তার রক্তের সুরক্ষা না হওয়ার একটি দলীল আল্লাহ তাআলার এ বাণী,

**قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا}**

“আপনি (মুনাফিকদের) বলে দিন, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে (বিজয় ও শাহাদাত এ) দু’ কল্যাণের কোনো একটির অপেক্ষায় আছ? আমরা কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে প্রতিক্ষায় আছি যে, আল্লাহ তাআলা নিজে থেকে তোমাদের শাস্তি পৌঁছাবেন কিংবা আমাদের হাত দিয়ে।”- তাওবা ৫২

সালাফগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে, তা যদি তোমরা প্রকাশ কর, তাহলে (আমাদের হাতে) হত্যা করানোর মাধ্যমে তিনি আমাদের হাত দিয়ে তোমাদের শাস্তি পৌঁছাবেন’। এটিই যথাযথ ব্যাখ্যা। কারণ, তারা যে কুফর তাদের অন্তরে গোপন রাখে, মুমিনদের হাতে তার শাস্তি হত্যার দ্বারাই কেবল হতে পারে। যান্দাকা প্রকাশ হওয়ার পরও যদি এদের তাওবা কবূল হয়, তাহলে মুমিনদের জন্য এটি সম্ভব হবে না যে, তাদের হাতে আল্লাহ তাআলা এদের শাস্তি দেয়ার প্রতিক্ষায় থাকবে। কেননা, মুমিনরা যখনই এদেরকে শাস্তি দিতে যাবে, তখনই তারা বাহ্যত মুসলমান হয়ে যাবে। ফলে মুমিনদের হাতে এদের শাস্তি হবে না কখনই। এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ অনেক।”- **ই’লামুল মুআককিয়িন: ৩/১০৭**

ইবনে তাইমিয়া রহ. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা এখন আর সে আলোচনায় যাচ্ছি না।

**বি.দ্র.**

**যিন্দিক পীর-সূফিদের হত্যা করা জরুরী:**

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২ হি.) বলেন,

**وفي رسالة ابن كمال عن الإمام الغزالي في كتاب [التفرقة بين الإسلام والزندقة] ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب المسكروالمعاصي وأكل مال السلطان، فهذا مما لا أشك في وجوب قتله إذ ضرره في الدين أعظم؛ وينفتح به باب من الإباحة لا ينسد؛ وضررهذا فوق ضررمن يقول بالإباحة مطلقا؛ فإنه يمتنع عن الإصغاء إليه لظهور كفره. أما هذا فيزعم أنه لم يرتكب إلا تخصيص عموم**

**التكليف بمن ليس له مثل درجته في الدين ويتداعى هذا إلى أن يدعي كل فاسق مثل حاله اهـ رد المحتار4\243**

“ইবনে কামাল পাশা রহ. ইমাম গাযালি রহ.-র ‘আততাফরিকা বাইনাল ইসলামি ওয়াযযান্দাকা’ কিতাব থেকে তার নিজের বক্তব্য বর্ণনা করেন: এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কতক সূফি, যারা দাবি করে যে, তারা আল্লাহ তাআলার সাথে এমন এক সম্পর্কের দরজায় উপনীত হয়েছে, যার ফলে তাদের উপর থেকে নামাযের দায়িত্ব রহিত হয়ে গেছে এবং নেশাজাত দ্রব্য পান করা, গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং সুলতানের মাল ভক্ষণ করা তাদের জন্য হালাল হয়ে গেছে। আমার কোনই সন্দেহ নেই যে, এ ধরণের লোককে হত্যা করা অত্যাবশ্যক। কেননা, এদের দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি হয় অনেক বেশি। এদের দ্বারা (হারামসমূহকে) হালালরূপে গ্রহণ করার এমন এক দরজা খোলবে, যা বন্ধ হবার মতো নয়। যেসব লোক নিঃশর্তভাবে সব কিছুকে হালাল বলে, তাদের চেয়েও এসব লোকের অনিষ্ট বেশি। কেননা, সুস্পষ্ট কুফর হওয়ার কারণে লোকজন নিঃশর্ত হালাল দাবিদারদের কথার দিকে কর্ণপাত করবে না। পক্ষান্তরে এ লোকের দাবি হল, সে শুধু এতটুকু করেছে যে, শরীয়তের পক্ষ থেকে আরোপিত দায়-দায়িত্বগুলোকে সে ঐসব লোকের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, যারা (তার দাবি অনুযায়ী) তার স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। এর অনিবার্য পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, প্রত্যেক ফাসেকই দাবি করবে, সে ঐ স্তরে পৌঁছে গেছে।”- **রদ্দুল মুহতার ৪/২৪৩**

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩১৪০

# যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে -২১

## ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৫-০১-২০১৯

**হাল্লাজ ও ইবনে আরাবি প্রসঙ্গ:** বিশ্ব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ দু'জন যিন্দিক: হাল্লাজ ও ইবনে আরাবি। এদের দ্বারা ইসলামের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সংক্ষেপে এ দু'জনের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য দু'জন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরছি।

ইবনে আরাবি: ইবনে আবিল ঈজ্ হানাফি রহ. (৭৯২ হি.) ইবনে আরাবির কিছু কুফরি কথা উল্লেখ করার পর বলেন,

**وكيف يخفى كفر من هذا كلامه ؟ وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين : { لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله}**

**ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار . والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد ولكن في قبول توبته خلاف والصحيح عدم قبولها وهي رو اية معلى عن أبي حنيفة ﷺ والله المستعان. اهـ شرح العقيدة الطحاوية لابن ابى العز الحنفي 492**

"যে ব্যক্তি এ ধরণের কথা বলে, সে কাফের হওয়ার ব্যাপারে কিভাবে অস্পষ্টতা থাকতে পারে?! এ ধরণের কুফরি কথা তার আরোও আছে। সেগুলোর কিছু এমন যে, তার কুফরিটা অস্পষ্ট। আর কিছু আছে সুস্পষ্ট কুফর (যা সকলেই বুঝবে)। এ কারণে সেগুলোর বাতুলতা প্রকাশ হওয়ার জন্য বিচক্ষণতার সাথে যাচাইয়ের

প্রয়োজন পড়ে। কেননা, কিছু বাতিল আছে যা সকল যাচাইকারীর সামনেই ধরা পড়ে। আর কিছু আছে যা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিদগ্ধ পর্যালোচক ছাড়া অন্য কারো চোখে ধরা পড়ে না।

ইবনে আরাবি ও তার সমশ্রেণীর লোকদের কুফর (মক্কার) ঐসব (কাফের) লোকদের চেয়েও বেশি, যারা বলেছিল, 'আমরা কিছুতেই ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না আমাদেরও ঐ জিনিস (অর্থাৎ নবুওয়্যাত) দেয়া হয়, যা আল্লাহর রাসূলদের দেয়া হয়েছিল।'

কিন্তু ইবনে আরাবি ধরণের লোকেরা হচ্ছে ইত্তেহাদি যিন্দিক ও মুনাফিক, যাদের ঠিকানা জাহান্নামের সর্বনিকৃষ্ট স্তরে। মুনাফিকরা যেহেতু বাহ্যত নিজেদের মুসলমান বলে প্রকাশ করে, তাই তাদের সাথে মুসলমানদের মতোই মুআমালা করতে হয়। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মুনাফিকরা অন্তরে কুফর গোপন রেখে বাহ্যত নিজেদের মুসলমান দাবি করতো। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তাদের সাথে মুসলমানদের মতোই মুআমালা করতেন। যদি তাদের কারো থেকে তার লুকানো কুফর প্রকাশ হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই তার উপর মুরতাদের বিধান প্রয়োগ করতেন। তবে তার তাওবা কবূল হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত আছে। সহীহ অভিমত হচ্ছে, কবূল হবে না। মুআল্লা রহ. আবু হানিফা রহ. থেকে এমনটিই বর্ণনা করেছেন।"- শরহুল আকিদাতিত তহাবিয়্যা লি ইবনি আবিল ঈজ: ৪৯২

হাল্লাজ: ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.)-র কাছে হাল্লাজের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি উত্তর দেন,

**من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين؛ فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد كقوله: أنا الله. وقوله: إله في السماء وإله في الأرض...**

**والحلاج: كانت له مخاريق و أنواع من السحر وله كتب منسوبة إليه في السحر . وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر و اتحاده به وأن**

**البشر يكون إلها وهذا من الآلهة: فهو كافر مباح الدم وعلى هذا قتل الحلاج ... وما يحكى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله مثل كتابة دمه على الأرض : الله الله وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك: فكله كذب. فقد جمع المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة ... وما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير لا من العلماء ولا من المشايخ؛ ولكن بعض الناس يقف فيه؛ لأنه لم يعرف أمره وأبلغ من يحسن به الظن يقول: إنه وجب قتله في الظاهر فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد وهذا أيضا خطأ. وقول القائل: إنه قتل ظلما قول باطل فإن وجوب قتله على ما أظهره من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسلمين؛ لكن لما كان يظهر الإسلام ويبطن الإلحاد إلى أصحابه: صار زنديقا فلما أخذ وحبس أظهر التوبة والفقهاء متنازعون في قبول توبة الزنديق فأكثرهم لا يقبلها. اهـ مجموع الفتاوى 2\480-483**

"হাল্লাজ যেসকল (কুফরি) কথা-বার্তায় বিশ্বাসী ছিল, যেগুলোর কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি সেগুলো বিশ্বাস করবে, মুসলমানদের সকলের ঐক্যমতে সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। হুলুল, ইত্তিহাদ এবং যিন্দিক ও মুলহিদদের এ জাতীয় বিভিন্ন কথা-বার্তার কারণে মুসলমানরা তাকে হত্যা করেছে। যেমন, সে বলতো: 'আমিই আল্লাহ', 'আকাশে ইলাহ একজন আর যমিনে ইলাহ আরেকজন (যার দ্বারা সে নিজেকেই উদ্দেশ্য নিতো) ইত্যাদি। ...

হাল্লাজ অনেক অলৌকিক কাণ্ড ঘটাত এবং বিভিন্ন প্রকার যাদু-টোনা জানত। যাদু সম্পর্কে তার নামে কিছু কিতাবও আছে। মোটকথা, যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে এ আকীদা রাখবে যে, তিনি কোন মানুষের ভিতরে অবতরণ করেন এবং তার সাথে মিশে একাকার হয়ে যান এবং মানুষটি ইলাহ হয়ে যায় এবং সেও (তখন) অনেক ইলাহের মধ্যে একজন ইলাহ: সে ব্যক্তি কাফের এবং তার রক্ত হালাল। হাল্লাজকে এর ভিত্তিতেই হত্যা করা হয়েছে। ...

আর হাল্লাজের ব্যাপারে যা বলা হয় যে, তাকে হত্যা করার সময় তার বেশ কিছু কারামত জাহের হয়েছে; যেমন: তার রক্তের দ্বারা যমিনে আল্লাহ আল্লাহ লেখা উঠেছে, হত্যার কারণে সে খুশির বহিঃপ্রকাশ করেছে, এছাড়াও এ জাতীয় যত

কিছু বলা হয়- তার সবগুলোই মিথ্যা। মুসলিম মনীষীগণ অনেক কিতাবে হাল্লাজের কাহিনি বর্ণনা করেছেন; ... কিন্তু উলামা-মাশায়েখদের কোন একজন ইমামের ব্যাপারেও আমাদের এ কথা জানা নেই যে, তিনি হাল্লাজের ব্যাপারে ভাল কিছু বলেছেন।

তবে হ্যাঁ! কেউ কেউ এ ব্যাপারে (পক্ষ-বিপক্ষ কিছু না বলে) চুপ থেকেছেন। তার কারণ, হাল্লাজের বিষয়টা তাদের জানা ছিল না। তার ব্যাপারে যারা ভাল ধারণা রাখেন, বেশির চেয়ে বেশি তারা এ কথা বলেন যে, জাহিরিভাবে তাকে হত্যা করা ফরয ছিল; অতএব, যিনি হত্যা করেছেন, তিনি (তাকে হত্যা করার দ্বারা) মুজাহিদ গণ্য হবেন; আর নিহত ব্যক্তিও শহীদ হবে। তবে বাস্তবে এ কথাটিও ভুল।

আর এ কথা বলা যে, তাকে হত্যা করা জুলুম হয়েছে- এটি একটি বাতিল কথা। কেননা, সে যে ইলহাদ (ও কুফর) জাহের করেছে, সে অনুযায়ী আইম্মায়ে কেরামের সকলের ঐক্যমতে তাকে হত্যা করা ফরয ছিল। কিন্তু যেহেতু সে বাহ্যত নিজেকে মুসলমান প্রকাশ করত আর তার ভক্তবৃন্দের নিকট গোপনে ইলহাদ জাহের করতো, তাই সে ছিল যিন্দিক। এরপর যখন তাকে গ্রেফতার করে বন্দী করা হয়েছে, তখন বাহ্যত তাওবা করেছে। আর যিন্দিকের তাওবা কবূল করা হবে কি'না এ নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মত হল, কবূল হবে না।"- মাজমুউল ফতাওয়া ২/৪৮০-৪৮৩

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩১৮৪

# জিহাদের ব্যাপারে ফতোয়া দেবে কারা?

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৫-০৯-২০১৯

**ফতোয়া দেয়ার জন্য দুই ধরণের ইলম দরকার:**

ক. যে বিষয়ে ফতোয়া দিতে যাচ্ছে, সে বিষয়ের বাস্তবতা বুঝা। সে বিষয়টি পরিপূর্ণ না জেনে ও না বুঝে ফতোয়া দেয়া যাবে না। যেমন, ঝগড়া লেগে স্বামী স্ত্রীকে তালাক জাতীয় কিছু শব্দ বলেছে। মুফতি সাহেবের কাছে জানতে চাওয়া হল, তালাক হবে কি'না? এবং হলে কয় তালাক এবং কোন ধরণের তালাক- রজয়ী না'কি বাইন? এখন মুফতি সাহেবকে প্রথমেই উক্ত ঘটনাটি ভাল করে জানতে ও বুঝতে হবে।

খ. উক্ত বিষয় বা ঘটনার শরয়ী বিধান। যেমন, উপরোক্ত তালাকের মাসআলায় মুফতি সাহেব ঘটনাটি ভাল করে বুঝার পর উক্ত শব্দ দ্বারা ঐ অবস্থায় কি ধরণের তালাক হয় এবং কয় তালাক হয়- সে বিষয়ে তার যথাযথ শরয়ী ইলম থাকতে হবে। ঘটনাটি ভাল করে বুঝার পর এবং সে বিষয়ে শরয়ী বিধান ভাল করে জানা-বুঝার পরই কেবল ফতোয়া দিতে পারবে। এর কোন একটায় কমতি থাকলে ফতোয়া দেয়া জায়েয হবে না।

**ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১ হি.) বলেন,**

**ولا يتمكن المفتي [ولا] الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علمًا**

**والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حُكْم اللَّه الذي حَكَم به في كتابه أو على لسان رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. اهـ**

“মুফতি বা বিচারক দুই ধরণের জ্ঞান ব্যতীত সঠিক ফতোয়া ও সঠিক বিচার করতে সক্ষম হবে না:

এক. ঘটনার প্রকৃত অবস্থা ভালভাবে জানা ও বুঝা এবং আলামত, নিদর্শন ও সার্বিক অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করে ঘটনার প্রকৃত ইলম উদ্ধার করা;

দুই. ঘটনার (শরয়ী) বিধান বুঝা। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এই ঘটনায় তার কিতাবে বা তার রাসূলের যবানে কি নির্দেশ দিয়েছেন তা বুঝা অতঃপর একটিকে অপরটির উপর প্রয়োগ করা।”- **ই’লামুল মুআককিয়িন: ২/১৬৫**

উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে জিহাদ বিষয়ে ফতোয়া দিতে হলে প্রথমে জিহাদের বাস্তব ময়দান, মুজাহিদিনে কেরামের অবস্থা এবং তাদের প্রতিপক্ষ তাগুত-কাফের ও মুরতাদদের অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য ইলম লাগবে। দ্বিতীয়ত বাস্তব ময়দান বুঝার পর জিহাদের ব্যাপারে যথাযথ ও সহীহ শরয়ী ইলম লাগবে। যাদের শরয়ী ইলম নেই তাদের জন্য যেমন ফতোয়া দেয়া জায়েয নেই, ময়দানের জ্ঞান যাদের নেই তাদের জন্যও ফতোয়া দেয়া জায়েয নেই। অতএব, একজন জেনারেল শিক্ষিত ব্যক্তি জিহাদের বাস্তব ময়দানের ব্যাপারে যতই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হোন না কেন, তার জন্য ফতোয়া দেয়া জায়েয নয়। তদ্রূপ, যত বড় আলেমই হোন না কেন, জিহাদের ময়দানের বাস্তবতা জানা না থাকলে তার জন্যও ফতোয়া দেয়া জায়েয নেই। আর যাদের উভয়টাতেই কমতি আছে- যেমনটা বর্তমানে যারা জিহাদ ও মুজাহিদিনের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন ও ভুল ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি- তাদের জন্য তো এর আগেই নাজায়েয।

**শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,**

**والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا. اهـ الاختيارات الفقهية 609-610**

“জিহাদি বিষয়াশয়ে আবশ্যক হল ঐ সকল সহীহ দ্বীনদারদের রায় গ্রহণ করা, সাধারণ দুনিয়াবাসীর অবস্থাদি সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা আছে। সাধারণদের রায় গ্রহণ না করা, সাধারণত যারা দ্বীনের ভাসা ভাসা দিকটাই দেখে থাকে। এদের রায় গ্রহণ করা হবে না। তদ্রূপ, ঐসব দ্বীনদারের রায়ও গ্রহণ করা হবে না, দুনিয়ার ব্যাপারে যাদের অভিজ্ঞতা নেই।”- **আলইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ: ৬০৯-৬১০**

বর্তমানে যারা জিহাদ ও মুজাহিদিনের ব্যাপারে কথা বলছেন, তারা যদি এ উসূলটি রক্ষা করে কথা বলতেন, তাহলে কতই না ভাল হত!

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩২৬০

# যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে -২২

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৫-১১-২০১৯

## তিন. বিদআতিদের গুরু

আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, যারা যমিনে দ্বীনি বা দুনিয়াবি কোন ধরণের ফাসাদ ছড়ায়, প্রয়োজনে ফাসাদ দূর করণার্থে তাদের হত্যা করা বা শাস্তি দেয়া বৈধ। আর স্পষ্ট যে, বিদআতিরা দ্বীনের ব্যাপারে ফাসাদ ছড়াচ্ছে। তাদের প্রতিহত করা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সহীহ আকীদার সংরক্ষণ করা ফরয। এজন্য প্রয়োজনে বিদআতিদের শাস্তি দেয়ার দরকার পড়লে, গ্রেফতার-বন্দীর দরকার পড়লে তা-ই করতে হবে। যদি কিতাল ছাড়া দমন সম্ভব না হয়, তাহলে কিতাল করা হবে। মুনাসিব মনে হলে তাদের নেতৃত্বস্থানীয়দের হত্যাও করা যাবে। আর যদি বিদআত এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তা কুফর ও ইরতিদাদে পৌঁছে গেছে, তাহলে তাদের উপর মুরতাদের বিধান আরোপ হবে।

**শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,**

**وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب، وإن لم يكن في نفس الأمر كفرا. فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه. اهـ مجموع الفتاوى 23\349-350**

“কুফর পর্যন্ত না গড়ালেও বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী দাঈকে কখনও হত্যা করা হয় জনসাধারণের উপর থেকে তার অনিষ্ট প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে; যেমন হত্যা করা হয়ে থাকে মুহারিব(তথা ডাকাত)কে। এমন নয় যে, যাকেই হত্যার আদেশ দেয়া হয়েছে, তা কেবল তার রিদ্দাহর কারণেই। এ হিসেবে (কদরিয়া ফিরকার গুরু) গাইলান আলকদরি ও অন্যানদের হত্যা এর ভিত্তিতে হতে পারে।”- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/৩৪৯-৩৫০

**আরো বলেন,**

**وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وكذلك كثير من أصحاب مالك. وقالوا: إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض؛ لا لأجل الردة؛ ... وهذا لأن المفسد كالصائل. فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل. اهـ مجموع الفتاوى 28\346-347**

"শাফিয়ি, আহমাদ ও অন্যান্য আরো অনেক ইমামের অনুসারিদের এক জামাত কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী বিদআতের দিকে আহ্বানকারী দাঈকে হত্যার অনুমোদন দিয়েছেন। ইমাম মালেকের অনেক অনুসারিও এর অনুমোদন দিয়েছেন। তারা বলেন, ইমাম মালেক রহ. সহ আরো অনেকে কদরিয়াদের হত্যার অনুমোদন দিয়েছেন ফাসাদ ফিল আরদের কারণে; রিদ্দাহর কারণে নয়। ... এর কারণ, ফাসাদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর উপর আগ্রাসীর অনুরূপ। আর আগ্রাসী ব্যক্তি যদি হত্যা ছাড়া বিরত না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করে দিতে হয়।"- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৩৪৬-৩৪৭

**ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২ হি.) বলেন,**

**وفي نور العين عن التمهيد: أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم بحيث توجب الكفر فإنه يباح قتلهم جميعا إذا لم يرجعوا ولم يتوبوا، وإذا تابوا وأسلموا تقبل توبتهم جميعا ... فأما في بدعة لا توجب الكفر فإنه يجب التعزير بأي وجه يمكن أن يمنع من ذلك، فإن لم يمكن بلا حبس وضرب يجوز حبسه وضربه، وكذا لو لم يمكن المنع بلا سيف إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز قتله سياسة وامتناعا. والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة وإن لم يحكم بكفره جاز للسلطان قتله سياسة وزجرا لأن فساده أعلى وأعم حيث يؤثر في الدين. والبدعة لو كانت كفرا يباح قتل أصحابها عاما، ولو لم تكن كفرا يقتل معلمهم ورئيسهم زجرا وامتناعا. اهـ**

"'নূরুল আইন' কিতাবে 'আততামহিদ' কিতাব থেকে বিবৃত হয়েছে: বিদআতিদের বিদআত যদি কুফর পর্যন্ত গড়িয়ে যায় এবং তারা তাওবা করে ফিরে আসতে সম্মত না হয়, তাহলে তাদের সকলকে হত্যা করে দেয়া বৈধ। যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সকলের তাওবা কবুল করা হবে। ... আর যেসব বিদআত কুফরে গড়ায়নি, সেসবের ক্ষেত্রে তা থেকে বিরত রাখা যায় মতো তা'যির করা আবশ্যক। যদি বন্দী ও প্রহার ব্যতীত সম্ভব না হয়, তাহলে বন্দী ও প্রহার বৈধ। তদ্রূপ, যদি অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত বিরত রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে নেতা ও অনুসরণীয় পর্যায়ের বিদআতি হলে সিয়াসতরূপে ও দমনের উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করা বৈধ। বিদআতি যদি লোকজনকে তার বিদআতের প্রতি দাঈ ও আহ্বানকারী হয় এবং তার কারণে বিদআত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে তার ব্যাপারে কুফরের ফায়সালা না হলেও সিয়াসতরূপে ও দমনের উদ্দেশ্যে সুলতানের জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ। কেননা, তার কারণে বড় ধরণের ও ব্যাপক ফাসাদ দেখা দিচ্ছে। কেননা, তার ফাসাদ দ্বীনকে আক্রান্ত করছে। বিদআত যদি কুফরে গড়ায়, তাহলে তাদের সকলকে ঢালাওভাবে হত্যা করা হবে। আর কুফর না হলে দমনের উদ্দেশ্যে তাদের উস্তাদ ও সর্দারকে হত্যা করা হবে।"- রদ্দুল মুহতার ৪/২৪৩

**মোটকথা:** ইরতিদাদ হলে মুরতাদ হিসেবে সকলকে হত্যা করা হবে। আর ইরতিদাদ না হলে শাস্তি দিয়ে হলেও বিদআত দমন করতে হবে। প্রয়োজনে নেতৃত্বস্থানীয় ও গুরু পর্যায়ের বিদআতিদের হত্যা করাও জায়েয হবে- যদিও তারা কাফের হয়ে যায়নি। বিদআত দমনের জন্য হত্যা করা হবে; মুরতাদ হিসেবে নয়।

**বি.দ্র- ১**

এখানে বিদআত বলতে সাধারণ বিদআত উদ্দেশ্য নয়; কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট পরিপন্থী বিদআতে গলিজা উদ্দেশ্য। নতুবা অনেক উলামা ফুকাহাকে হত্যা করা আবশ্যক হবে। কারণ, টুকটাক ও সাধারণ কিছু বিদআত অনেক আলেম-ফকিহের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। এ ধরণের বিদআত এখানে উদ্দেশ্য নয়। এখানে খাওয়ারেজ, মু'তাজিলা ও কদরিয়াদের মতো বিদআত উদ্দেশ্য। বর্তমান সময়কার মাজার ও কবর পূজারিদের নেতৃত্বস্থানীয় ভণ্ড বাবাগুলো এ শ্রেণীতে পড়বে। আর

দেউয়ান বাগীদের মতো খবীসগুলো তো সুস্পষ্ট মুরতাদ। এদেরকে ফাসাদ ফিল আরদের পাশাপাশি ইরতিদাদের কারণেও হত্যা করা আবশ্যক।

**বি.দ্র-২**

যেকোন হত্যার ক্ষেত্রেই তার লাভ-ক্ষতির হিসেব করা আবশ্যক। যদি হত্যার দ্বারা লাভের তুলনায় ক্ষতি হয় বেশি, তাহলে হত্যা করা হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ারেজদের প্রথম ব্যক্তি যুলখুয়াইসিরাকে এজন্যই হত্যা করেননি। মুনাফিকদেরও ছেড়ে দিয়েছেন। এজন্য বিদআতি কোন গুরু বা বাবাকে হত্যা করতে হলে বিজ্ঞ মুজাহিদ উলামায়ে কেরাম ও উমারাদের নির্দেশনা নিয়ে করা উচিৎ। নয়তো লাভের তুলনায় ক্ষতি হতে পারে বেশি।

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩২৭২

# জিহাদ উত্তম না নামায উত্তম?

## ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৪-১৫-২০১৯

আদনানমারুফ ভাইয়ের পোস্টের উপর এক ভাইয়ের প্রশ্ন:

আমরা সাধারণত জানি যে, একজন মানুষ নাবালেগ বা অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম যে ফরজ তার উপর অবশ্যক হয় তা হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া। এই বিষয়ে কোন দলিল আছে? ঈমান আনর পর প্রথম ফরজ নামাজ, জিহাদ, নাকি অন্য কোন ফরজ ইবাদত? আপনার লেখা থেকে বুঝলাম, ঈমানের পর প্রথম ফরজ জিহাদ। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর কিতাবেও আছে, ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা। প্রিয় ভাই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে দিলে ভালো হতো।

**উত্তর:**

**বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম**

আরকানে খামসা তথা ঈমান এবং ফরয নামায, ফরয রোযা, ফরয হজ্ব ও ফরয যাকাত- এগুলোর গুরুত্ব শরীয়তে সবচেয়ে বেশি। এগুলো শরীয়তের মূল ভিত্তি এবং ফরযে আইন। এগুলোর সমকক্ষ অন্য কোন ইবাদাত নেই। এমনকি ফরযে কিফায়া জিহাদও না। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় আমর বিল মা'রূপ, নাহি আনিল মুনকার ও জিহাদ সকল নফল ইবাদাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নফল নামায, নফল রোযা, নফল হজ্ব ও নফল যাকাতসহ অন্য যত নফল ইবাদাত রয়েছে, সেগুলোর চেয়ে জিহাদ উত্তম। এজন্য যদি বলা হয়, **'ঈমানের পর প্রথম ফরয জিহাদ'** কিংবা **'ঈমানের পর সর্বোত্তম ইবাদাত জিহাদ'**- তাহলে আপাত দৃষ্টিতে কথাটা কুরআন সুন্নাহর বিপরীত হয়। কেননা, ঈমানের পর সর্বোত্তম আমল ফরয নামায। এটি কুরআন সুন্নাহয় সুস্পষ্ট। তবে যদি বলা হয়, **'সকল নফল ইবাদাতের চেয়েও উত্তম ইবাদাত জিহাদ'** তাহলে কথাটি ঠিক আছে। এ হল স্বাভাবিক অবস্থার কথা।

পক্ষান্তরে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে এবং নামায রোযার মতো জিহাদও ফরযে আইন হয়ে যায়, তাহলে ফরযে আইন হওয়ার দিক থেকে জিহাদ-নামায একই সারিতে চলে এল। তবে এ ক্ষেত্রেও জিহাদ ফরয নামাযের চেয়ে উত্তম বলা মুশকিল। কুরআন সুন্নাহয় নামাযকে সর্বপ্রথম রাখা হয়েছে। ফরয নামাযের চেয়ে জিহাদ উত্তম এমন কোন হাদিস আছে বলে আমার জানা নেই। তবে এটা সত্য যে, তখন যদি নামায এবং জিহাদের মধ্যে তাআরুজ দেখা দেয় যে, একটা করতে গেলে আরেকটা ছুটে যাবে, তাহলে জিহাদ অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ নামায পিছিয়ে দিয়ে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। তবে জিহাদ নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ট- এ কারণে নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, নামায এমন ইবাদাত যা কাযা করা সম্ভব, পরে আদায় করা সম্ভব। কিন্তু জিহাদ এমন যে, এটি পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। এটি পিছিয়ে দিতে গেলে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করবে। ইসলাম ও মুসলমানদের শেষ করে দেবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ অগ্রাধিকার পাবে। জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে আর নামায পিছিয়ে দিতে হবে। যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন ওয়াক্ত নামায পিছিয়ে দিয়েছিলেন। পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ না থাকায় জিহাদ অগ্রে রাখা হচ্ছে। এতে জিহাদ নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম ক্বারাফি রহ. (৬৮৪ হি.) এর উদাহরণ দিয়েছেন কুরআন তিলাওয়াত এবং আযানের জওয়াব দিয়ে। কুরআন তিলাওয়াত আযানের জওয়াবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মুআযযিন আযান শুরু করে দিলে কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে আযানের জওয়াব দিতে হয়। কারণ, কুরআন তিলাওয়াত পরেও করা যাবে, কিন্তু আযানের জওয়াব আযান শেষ হয়ে গেলে আর দেয়া যাবে না। ইমাম ক্বারাফি রহ. বলেন,

**إذا تعارضت الحقوق قدم منها المضيق على الموسع ... ويقدم الفوري على المتراخي... ولذلك يقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته، وإن كان أعلى رتبة منه كما تقدم حكاية قول المؤذن على قراءة القرآن؛ لأن قراءة القرآن لا تفوت. اهـ**

“একাধিক হকের মাঝে যদি তাআরুজ দেখা দেয় (যে, একটা করতে গেলে আরেকটা করা যাবে না) তাহলে যেটা পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ আছে সেটাকে পিছিয়ে দিয়ে যেটা পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই সেটা করা হবে। ... যেটা এখনই

করা জরুরী সেটাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, যেটা পরে করার সুযোগ আছে সেটার উপর। ... এ কারণেই যেটা ছুটে যাবার আশঙ্কা সেটা অগ্রাধিকার পাবে সেটার উপর, যেটা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা নেই; যদিও তা (যেটা আগে করা হচ্ছে সেটার তুলনায়) উচ্চ মার্যাদার হয়। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত রেখে আযানের জওয়াব দেয়া হবে। কেননা, কুরআন তিলাওয়াত ছুটে যাবার ভয় নেই।"- আলফুরুক: ২/২০৩

লক্ষ করুন- "যদিও তা (যেটা আগে করা হচ্ছে সেটার তুলনায়) উচ্চ মার্যাদার হয়।"

জিহাদ ও নামাযের বিষয়টাও এমনই। নামায পরে কাযা করা যাবে হিসেবে পিছিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নামাযের চেয়ে জিহাদ উত্তম।

ইবনে তাইমিয়া রহ., জাসসাস রহ. বা আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.- তাদের কেউ জিহাদকে ফরয নামাযের চেয়ে উত্তম বলেছেন বলে আমার জানা নেই। তারা এটা বলেছেন যে, ক্ষেত্র বিশেষে ফরযে আইন জিহাদের গুরুত্ব ফরযে আইন নামাযের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ নামায ছুটে গেলেও জিহাদ বন্ধ রাখা যাবে না। জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে আর নামায পরে কাযা করে নিতে হবে। যেখানে তারা জিহাদকে নামাযের চেয়ে উত্তম বলেছেন, সেখানে নফল নামায উদ্দেশ্যে। অনেক জায়গায় স্পষ্ট করেই বলা আছে। আর যেখানে স্পষ্ট বলা নাই, সেখানে উদ্দেশ্য এটাই। আশাকরি বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) এর একটি সুন্দর লেখা আছে। আরবি জানা ভাইদের উচিৎ সেটা পড়ে নেয়া। মাত্র পনের পৃষ্ঠার। শিরোনাম-

**رد على سفر الحوالي وتعليقه على كتاب الشيخ المجاهد عبد الله عزام "الدفاع عن أراضى المسلمين أهم فروض الأعيان "**

এ গেল ফজিলতের কথা। আর ঈমানের পর প্রথম ফরয কোনটি- এ ব্যাপারে কথা হল, ঈমানের পর প্রথম ফরয একেক জনের জন্য একেকটি। যার তাওহিদের জ্ঞান নেই, ঈমান আনার পর প্রথম ফরয তাওহিদের জ্ঞানার্জন। যদি নামাযের সময়ে ঈমান এনে থাকে, তাহলে প্রথম ফরয নামায পড়ে নেয়া। যদি শত্রু আক্রমণের

সময় ঈমান এনে থাকে, তাহলে প্রথম ফরয শত্রু প্রতিহত করা। এভাবে একেক জনের জন্য একেকটা প্রথম ফরয।

যদি আমার ভুল হয়, তাহলে শুধরে দিলে ইনশাআল্লাহ খুশি হবো।

---

এ ব্যাপারে নিচের লেখাটাও দেখা যেতে পারে-

**জিহাদ ও অন্যান্য ফরযের সমন্বয় সাধনই মধ্যমপন্থা**

**https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZfmdE৭ZlqIurUqtijmNW৫mSWAg৫WRWuTmrk**

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩০৩১

# যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায় (পর্ব-১)

আদনানমারুফ

Senior Member

০৬-০৩-২০১৯

অনেকে মনে করেন, শাসক মুরতাদ হয়ে গেলেই শুধু তাকে অপসারিত করার জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়। আর যেহেতু শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে তার বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে তাই শত কুফর-ইরতেদাদে লিপ্ত হলেও তারা শাসকগোষ্ঠীর মুরতাদ হওয়ার বিষয়টা স্বীকার করেন না। তাদের কথাবার্তায় মনে হয়, শাসক মুরতাদ হওয়ার শুধু একটিই পদ্ধতি, তা হলো শাসক নিজেকে নাস্তিক বা মুসলিম নয় বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিবে, কিন্তু এই বন্ধুরা বুঝতে চান না, শাসকের কান্ডজ্ঞান লোপ না পেলে শাসক কোন দিনও এই ঘোষণা দিতে যাবে না। ঘোষণা না দিয়ে শত কুফরী করেও যদি মুসলিম থাকা যায়, বরং আলেমদের সমর্থণ পাওয়া যায়, সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দেওয়া যায়, তাহলে ঘোষণা দিয়ে শুধু শুধু জনরোষের শিকার হওয়ার কি প্রয়োজন?

আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিদ্রোহের পরিবর্তে তারা বর্তমান শাসকদের সংশোধনের জন্য দাওয়াতের পদ্ধতি গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়, কিন্তু এই পদ্ধতির প্রবক্তা মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহিমাহুল্লাহ তার কিতাব ‘রিদ্দাতুন ওলা আবা বাকরীন লাহা’য় (পৃ: ৭-৮) শাসক ও এলিট শ্রেণীর অধিকাংশই যে, ঘোষণা দেওয়া ব্যতীত ভিতরে ভিতরে ব্যাপকভাবে নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে এ গেছে, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাহলে আমরা শাসকদের মুরতাদ বললে তারা আমাদের বিরুদ্ধে এত ক্ষেপে যান কেন, আমাদের খারেজী-চরমপন্থী ইত্যাদি উপাধি দেন কেন?

আসলে শাসকদের মুরতাদ বা মুসলিম হওয়া নিয়ে তাদের সাথে আমাদের মূল বিরোধ নয়, বরং মূল দ্বন্দ্ব হলো, শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ নিয়ে, এজন্য নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যদি কোনদিন কোন শাসক প্রকাশ্যে নাস্তিক হওয়ার ঘোষণা দিয়েও দেয়, তখনও তারা ইমাম না থাকা, শক্তি না থাকা, বড় ফিতনার

ভয় ইত্যাদি বাহানায় যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে চেষ্টা করবে। আর এভাবেই তারা উবাদা বিন সামেতের হাদিস **إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان** 'তবে (শাসকদের থেকে) সুস্পষ্ট কুফর দেখলে যার স্বপক্ষে তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে দলিল রয়েছে, তখন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করবে' (সহিহ বুখারী, ৭০৫৬; সহিহ মুসলিম, ১৭০৯) এবং এ হাদিসের আলোকে মুরতাদ শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের ব্যাপারে উম্মাহর ইজমায়ী সিদ্ধান্তকে কার্যত অস্বীকার করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হাদিসের এমন মিসদাক-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা এবং হাদিসের উপর আমলের জন্য এমন এমন শর্ত আরোপ করা যা পূর্বেও কখনোও পাওয়া যায়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পাওয়া যাবেও না, এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? আর আমাদের মত চরমপন্থীদের দলিল হওয়া ছাড়া এ হাদিসের দ্বারা উম্মাহর কি বা ফায়েদা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বুঝলেন না, মুরতাদ শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ না করে সবর করা বা তাকে দাওয়াত দিয়ে সংশোধন করাই উত্তম, মুরতাদ শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে গেলেই বড় ফিতনার আশংকা !!!!

যাক, এই সংশয়ের বিষয়ে প্রবন্ধের শেষে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করবো, এখন আলোচনার বিষয়বস্তুতে ফিরে আসি, প্রকৃতপক্ষে শাসক মুরতাদ হওয়া, শাসকের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করার একটি ক্ষেত্র মাত্র। মুরতাদ হওয়া ছাড়াও আরো কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে অপসারিত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উলামায়ে কেরাম এমন কিছু ক্ষেত্র বর্ণণা করেছেন এবং এর মধ্যে কিছু ক্ষেত্র তো এমন যেসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে সহিহ হাদিস রয়েছে, এবং উলামায়ে কেরাম এসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন। আর এসবগুলো কারণই বর্তমান শাসকদের মাঝে পুরোপুরি বিদ্যমান। তাই যদি তর্কের খাতিরে ওদের মুসলিম হিসেবে মেনেও নেই, তারপরও নিম্নোলিখিত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে ওদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

আমরা প্রথমে সে ক্ষেত্রগুলোর তালিকা পেশ করবো, এরপর প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার কারণে এক বা দুই পর্বে একটি একটি ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

যেসব ক্ষেত্রে মুরতাদ না হলেও শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা যায়:

১ - নামায তরক করা।

২ - কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা না করা।

৩ - শাসকের পাপাচার ও জুলুম অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া, যার কারণে মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া উভয়টি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৪ - কাফের-মুরতাদদের সাথে জিহাদ পরিত্যাগ করা, ওদের বন্ধুরুপে গ্রহণ করা এবং ওদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা।

এ পর্বে নামায পরিত্যাগকারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করার বিষয়ে সহিহ হাদিস ও আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ। আর আগামী পর্বে এ বিষয়ে কিছু সংশয়ের উত্তর দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আমরা যে আলেমদের বক্তব্য উদ্ধৃত করবো, তারা সবাই হানাফী, মালেকী কিংবা শাফেয়ী মাযহাবের, আর এই তিন মাযহাবে নামায তরক করা কুফরী নয়। বরং শুধু হাম্বলী মাযহাবেই নামায তরক করা কুফরী। এরপরও তিনো মাযহাবের আলেমগণ নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা আমাদের দাবী 'নামায তরক করা শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র' প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

**عن عوف بن مالك، عن رسول الله ﷺ قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»، قيل :يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة .«رواه مسلم: (1855)**

আউফ বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসবে এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসবে, তোমরা তাদের জন্য দোয়া করবে তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করবে। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং তারাও তোমাদেরকে অপছন্দ করবে, যাদেরকে তোমরা লা'নত করবে এবং তারাও তোমাদেরকে লা'নত করবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তরবারি দ্বারা তাদের মোকাবেলা করবো

না? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে। -সহিহ মুসলিম, ১৮৫৫

**عن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع»، قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صلوا» رواه مسلم: (1854)**

উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এমন কিছু লোককে তোমাদের আমির নিযুক্ত করা হবে যাদের কিছু কাজ তোমাদের কাছে ভালো মনে হবে আর কিছু কাজ মন্দ মনে হবে, (অর্থাৎ ভালো-মন্দ সব কাজই করবে), সুতরাং যে তাদের (মন্দ কাজগুলোকে) অপছন্দ করবে সে মুক্তি পাবে, আর যে প্রতিবাদ করবে সেও মুক্তি পাবে, কিন্তু যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, এবং সহযোগিতা করবে সে মুক্তি পাবে না। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, আমরা কি এমন আমিরদের সাথে যুদ্ধ করবো না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা নামায পড়বে ততদিন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। -সহিহ মুসলিম, ১৮৫৪

১. মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ ও মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৪৪৯ হি.) বুখারী শরিফের ভাষ্যগ্রন্থ 'শরহু সহিহিল বুখারী'তে বলেন,

**والذى عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم . ..وروى الآجرى، عن البغوى، عن القواريرى: حدثنا حكيم بن حزام وكان من عباد الله الصالحين حدثنا عبد الملك بن عمير، عن الربيع بن عميلة، عن ابن مسعود عن النبى ﷺ قال: سيليكم أمراء يفسدون، وما يصلح الله بهم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة الله فله الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليه الوزر وعليكم الصبر. (شرح صحيح البخاري لابن بطال: 127/5 ط. مكتبة الرشد: 1423)**

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে কিংবা নামায কায়েম করা ছেড়ে দিলেই শুধু তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ও তাদের অপসারিত করা ওয়াজিব হয়। এছাড়া শুধু জুলুম-অত্যাচারের কারণে তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না, ... ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অচিরেই এমন কিছু আমির তোমাদের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করবে, যারা (জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে) অশান্তি সৃষ্টি করবে, তবে তাদের দ্বারা যতটুকু কল্যাণ হবে তা তাদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির থেকে বেশি, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর আনুগত্য করবে তারা প্রতিদানের হকদার হবে এবং তোমাদের উপর তাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করা আবশ্যক হবে, আর যারা আল্লাহর নাফরমানী করবে তারা গুনাহের ভাগীদার হবে, আর এক্ষেত্রে তোমাদের কর্তব্য হবে সবর ও ধৈর্য্যধারণ। -শরহু সহিহিল বুখারী, ৫/১২৭

ইবনে বাত্তাল আরো বলেন,

**في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور، ولزوم السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة، ما أقام الجمعات والجهاد. (شرح صحيح البخاري لابن بطال: 8/10 ط. مكتبة الرشد: 1423(**

এ সকল হাদিস প্রমাণ করে জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না, বরং তার আনুগত্য করতে হবে, ততদিন পর্যন্ত যতদিন সে জুমুআ কায়েম করবে, এবং জিহাদ জারী রাখবে। -শরহু সহিহিল বুখারী, ১০/৮

২. ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝে আসে যে ফাসেক ও জালেম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ না করার যে আদেশ হাদিসে দেওয়া হয়েছে তা ঐ শাসকের ক্ষেত্রে যে নামায কায়েম করে, জিহাদ জারী রাখে, এবং তার দ্বারা যে কল্যাণ হয় (যেমন নামায কায়েম করা, মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ইত্যাদি) তা তার দ্বারা হওয়া ক্ষতির চেয়ে বেশি। এ বিষয়টিই ইমাম ইবনুল উযির ইয়ামানী রহিমাহুল্লাহু (মৃ: ৮৪০ হি.) তার কালজয়ী গ্রন্থ আররাওযুল বাসিমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি বলেন,

ومن ذلك كلام ابن بطّال الذي أورده المعترض، وقد مرّ، وهو على المعترض لا له، فإنّه روى عن الفقهاء أنّهم اشترطوا في طاعة المتغلّب إقامة الجمعات والأعياد، والجهاد، وإنصاف المظلوم غالباً. (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: 384/2 ط. دار عالم الفوائد)

ইবনে বাত্তালের যে কথার উপর আপত্তিকারী আপত্তি করেছে, সে কথা তো আপত্তিকারীর বিপক্ষেই যায়, কেননা ইবনে বাত্তাল ফুকাহায়ে কেরাম থেকে নকল করেছেন যে, তারা জোরপূর্বক ক্ষমতাদখলকারীর আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে জুমুআ ও ইদ কায়েম করা, জিহাদ জারী রাখা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাজলুমের পক্ষে সুবিচার করা ইত্যাদি বিষয়ের শর্ত করেছেন। -আররাওযুল বাসিম, ২/৩৮৪

৩. কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৫৪৪ হি.) বলেন,

لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة. وذهب بعض البصريين إلى أنها تنعقد لها وتستديم على التأويل، فإذا طرأ مثل هذا على وال من كفر أو تغيير شرع أو تأويل بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك. (إكمال المعلم 6/246 :ط. دار الوفاء: 1419 هـ).

উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ'আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ'আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা'বিলকারী। অতএব শাসক যদি এজাতীয় কাজগুলোর কোন একটি, যেমন, কুফর, শরীয়া পরিবর্তন অথবা বিদ'আতে লিপ্ত হয়, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার

আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, সম্ভব হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা, যদি এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। -ইকমালুল মু'লিম, ৬/২৪৬

৪. ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহও (মৃ: ৬৭৬ হি.) কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহুর উপরোল্লিখিত বক্তব্য সমর্থণ করেছেন। তিনি বলেন,

**قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة. قال :وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له، لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. (شرح مسلم للنووي: 229/12 ط. دار إحياء التراث العربي: 1392)**

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ'আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ'আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা'বিলকারী। কাযী ইয়ায বলেন, শাসকের উপর যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়া পরিবর্তন করে অথবা বিদ'আত করে, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, সম্ভব হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা। -শরহু মুসলিম, ১২/২২৯

৫. মুহাদ্দিস আবুল আব্বাস কুরতুবী মালেকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৫৬ হি.) 'তালখীসু সহিহি মুসলিম' নামে সহিহ মুসলিমের একটি সারসংক্ষেপ তৈরী করেন, এরপর আলমুফহিম নামে সেই সংক্ষিপ্তগ্রন্থের শরাহ লিখেন, এই কিতাবে তিনি বলেন,

**قوله على المرء المسلم السَّمع والطاعة ظاهر في وجوب السمع والطّاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولًا واحدًا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وَجَبَ خَلعُه على المسلمين كلهم، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان و إقامة الحدود ومَنَع من ذلك، وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منها لا يختلف في وجوب خَلعِهِ. (المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: 39/4 ط. دار ابن كثير(1497 :**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "মুসলিমের উপর শ্রবণ ও আনুগত্য ওয়াজিব", প্রমাণ করে, মুসলমানদের জন্য ইমাম, আমির ও কাযীর আনুগত্য করা ওয়াজিব, আর এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে কোন দ্বিমতও নেই, যতক্ষণ না শাসক গুনাহের আদেশ করে। যদি শাসক গুনাহের আদেশ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে গুনাহের কাজে তার আনুগত্য করা জায়েয হবে না। এখন সেই গুনাহটা যদি কুফর হয়, তাহলে সকল মুসলমানের উপর ফরজ হলো, তাকে অপসারণ করা। এমনিভাবে সে যদি নামায, রমযানের রোযা, হুদুদ তথা দণ্ডবিধির মতো দ্বীনের মৌলিক কোন বিধান প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয় এবং সেগুলো পালনে বাধা দেয়, তদ্রুপ সে যদি মদপান ও যিনাকে বৈধতা দান করে এবং সেগুলো থেকে বারণ না করে, তখনও তার অপসারণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। -আলমুফহিম, ৪/৩৯

৬. মুফাসসির আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৭১ হি.) বলেন,

**الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم**

**وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شي من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة: (وألا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وفي حديث عوف بن مالك: (لا ما أقاموا فيكم الصلاة) الحديث. أخرجهما مسلم. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع- قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا أي من كره بقلبه و أنكر بقلبه. أخرجه أيضا مسلم. (الجامع لأحكام القرآن: 271/1 ط. دار الكتب المصرية: 1384)**

ইমাম ফাসেক হয়ে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে সে অপসারিত হয়ে যাবে, এবং প্রকাশ্য ও সুবিদিত ফিসকের কারণে তাকে অপসারণ করতে হবে, ..... আর অন্যান্য আলেমদের মতে ইমাম অপসারিত হবে না, যতক্ষণ না সে কুফরে লিপ্ত হয় কিংবা নামায পরিত্যাগ করে, অথবা নামাযের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয়, কিংবা শরিয়তের কোন বিধান কায়েম করা ছেড়ে দেয়। কেননা উবাদা বিন সামেতের সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে বাইয়াত নিয়েছেন, আমরা আমিরদের সাথে ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধ করবো না, তবে যদি তোমরা সুস্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। আউফ বিন মালিকের সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করবে ততদিন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। ইমাম মুসলিম উল্লিখিত হাদিসদ্বয় বর্ণণা করেছেন। উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এমন কিছু লোককে তোমাদের আমির নিযুক্ত করা হবে যাদের কিছু কাজ তোমাদের কাছে ভালো মনে হবে আর কিছু কাজ মন্দ মনে হবে, (অর্থাৎ ভালো-মন্দ সব কাজই করবে), সুতরাং যে তাদের (মন্দ কাজগুলোকে) অপছন্দ করবে সে মুক্তি পাবে, আর যে প্রতিবাদ করবে সেও মুক্তি পাবে, কিন্তু যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, এবং সহযোগিতা করবে সে মুক্তি পাবে না। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, আমরা কি এমন আমিরদের সাথে যুদ্ধ করবো না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা নামায

পড়বে ততদিন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। ... এই হাদিসটিও ইমাম মুসলিম বর্ণণা করেছেন। -তাফসীরে কুরতুবী, ১/২৭১

৭. তাফসীরে বাইযাবীর লেখক ইমাম বাইযাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৮৫ হি.) 'তুহফাতুল আবরার' নামে ইমাম বাগাভী রচিত হাদিসের কিতাব 'মাসাবীহুস সুন্নাহ'র একটি ব্যাখাগ্রন্থ রচনা করেছেন, এ কিতাবে উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখায় তিনি বলেন,

**وإنما مُنع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عماد الدين، وعنوان الإسلام، والفاروق بين الكفر والإيمان، حذرا من هيج الفتن واختلاف الكلمة، وغير ذلك مما يكون أشد نكاية من احتمال نكرهم والمصابرة على ما ينكرون منهم. (تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة: ط 2/546 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: 1433 هـ(**

নামায হলো দ্বীনের ভিত্তি, ইসলামের পরিচায়ক ও ঈমান-কুফরের মাঝে পার্থক্য, তাই যতদিন পর্যন্ত শাসকরা নামায কায়েম করে ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করলে ফিতনা হবে এবং লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। -তুহফাতুল আবরার, ২/৫৪৬

৭. আল্লামা ত্বীবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৭৪৩ হি.) মেশকাত শরিফের ভাষ্যগ্রন্থ 'আলকাশিফ আন হাকায়িকিস সুনানে' বলেন,

**وأجمعوا على أن الإمامةَ لا تنعقدُ لكافر ولو طرأ عليه الكفرُ انعزل، وكذا لو ترك إقامةَ الصلوات والدعاء إليها) .الكاشف عن حقائق السنن: ص: 2560 مكتبة نزار مصطفى الباز. المكة المكرمة)**

আহলুস সুন্নাহর উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হবে যাবে। এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় তাহলেও। -আলকাশেফ আন হাকায়িকিস *সুনান, পৃ: ৮/২৫৬০

৯. শাফেয়ী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম হাফেয ইবনুল মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮০৪ হি.) সহিহ বুখারীর শরাহ 'আততাওযীহ'তে বলেন,

**وفي هذِه الأحاديث حُجَّةٌ في ترك الخروج على أئمة الجَوْر ولزومِ السمع والطاعة لهم، والفقهاء يجمعون على أن الإمام المتغلِّبَ طاعتُه لازمةٌ ما أقامَ الجماعاتِ والجهادَ. (التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 282/32 ط. دار النوادر: 1429 هـ).**

যালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা এবং তাদের কথা শোনা ও আনুগত্য আবশ্যক হওয়ার প্রমাণ এ হাদীস সমূহে বিদ্যমান রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের আনুগত্য ততদিন আবশ্যক, যতদিন তারা নামাযের জামাত এবং জিহাদ কায়েম রাখে। - আততাওযীহ, ৩২/২৮২

তিনি আরো বলেন

**عن ابن عمر ﷺ عن النبي ﷺ، قال: «السمع والطاعة حق، ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». احتجَّ بهذا الحديث الخوارجُ، فرأوا الخروجَ على أئمة الجَوْر والقيامَ عليهم عندَ ظُهُور جَوْرِهِم، والذي عليه جُمهُورالأئمة المنعُ، إلا بكفرهم بعد إيمانهم أو تركِهم إقامةَ الصلواتِ) .التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 66/18)**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ইমামের আনুগত্য ওয়াজিব, যতক্ষণ না সে কোন অন্যায় কাজের আদেশ দেয়। যদি সে কোন অন্যায় কাজের আদেশ দেয় তাহলে তার কোন আনুগত্য নেই'। এ হাদীস দ্বারা খারেজীরা দলিল দিয়ে থাকে, ফলে তারা জালেম শাসক থেকে জুলুম প্রকাশ পেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তাকে অপসারণ করা জায়েয মনে করে। তবে জুমহুরের মত হলো তা না করা, তবে হাঁ, তারা যদি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করে অথবা নামায কায়েম করা ছেড়ে দেয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। - আততাওযীহ, ১৮/৬৬

১০. হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনুল মালাক রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৫৪ হি.) ‘মাসাবীহুস সুন্নাহ’র শরাহ ‘শরহুল মাসাবীহ’তে উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাখায় বলেন,

**قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة" منعه ﷺ عن ذلك ما داموا مُقِيمي الصلاة الفارقةِ بين الإيمان والكفر، يحذر هيجان الفتنة التي هي أشد من المصابرة على ما ينكر منهم، وفيه دليل على عدم انعزال الإمام بالفسق. (شرح المصابيح لابن ملك: 246/4 ط. إدارة الثقافة الإسلامية: 1433 هـ(**

শাসকরা যতদিন পর্যন্ত ইমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী নামায কায়েম করে ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কেননা এক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করলে ফিতনা হবে এবং লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। এই হাদিস প্রমাণ করে ফিসকের কারণে ইমাম অপসারিত হবে না। -শরহুল মাসাবীহ, ৪/২৪৬

১১. মোল্লা আলী ক্বারী রহ. উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাখায় (মৃ: ১০১৪ হি.) বলেন,

**)قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم (أي أفلا نعزلهم ولا نطرح عهدهم ولا نحاربهم (عند ذلك) أي إذا حصل ما ذكر)قال: لا) أي لا تنابذوهم (ما أقاموا فيكم الصلاة) أي مدة إقامتهم الصلاة فيما بينكم ; لأنها علامة اجتماع الكلمة في الأمة، قال الطيبي: فيه إشعار بتعظيم أمر الصلاة وأن تركها موجب لنزع اليد عن الطاعة كالكفر على ما سبق في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا. (مرقاة المفاتيح: 2396/6 ط. دار الفكر: 1423(**

রাবী বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সময় আমরা কি তাদেরকে সরিয়ে ফেলব না, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ছুড়ে ফেলব না, এবং তাদের সাথে লড়াই করব না? তিনি বললেন না, অর্থাৎ যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে ততক্ষণ তা করো না। কেননা এটি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বজায়

থাকার প্রমাণ বহন করে। আল্লামা ত্বীবী বলেন, উক্ত হাদীসে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের বিষয়টি অনেক গুরুতর এবং শাসক নামায না পড়লে তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে ফেলা আবশ্যক হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি কুফরি প্রকাশ পাওয়ার মতো। যেমনটি উবাদা বিন ছামেতের 'তবে যদি তোমরা কুফরি দেখ' শীর্ষক হাদীসে গত হয়েছে। -মিরকাতুল মাফাতীহ, ৬/২৩৯৬

১২. হিন্দুস্তানের অন্যতম আলেম শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১০৫২ হি.) মিশকাত শরিফের ভাষ্যগ্রন্থ 'লামাআতুত তানকীহ'তে উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাখায় বলেন,

**وقوله: (أفلا ننابذهم) بالسيف، وفي المشارق: أي: ندافعهم ونباعدهم بالقتال، انتهى. وفي (مجمع البحار): نبذته :إذا رميته و أبعدته، أي: نقاتلهم. وقوله: (لا) أي: لا تنابذوهم ما أقاموا الصلاة، وفيه أن ترك الصلاة موجب لمنابذتهم، ونزع اليد من طاعتهم؛ لأن الصلاة عماد الدين، والفارق بين الكفر والإيمان بخلاف سائر المعاصي، وفيه تشديد وتهديد عظيم على ترك الصلاة. (لمعات التنقيح: 454/6 ط. دار النوادر 1435 :هـ)**

সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা নামায কায়েম করবে ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। এ হাদিস প্রমাণ করে, নামায ছেড়ে দেওয়ার কারণে শাসকদের সাথে যুদ্ধ ও তাদের আনুগত্য পরিহার করা ওয়াজিব হয়ে যায়, কেননা নামায হলো দ্বীনের ভিত্তি এবং ঈমান-কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী বিষয়। কিন্তু অন্যান্য গুনাহের বিষয়টা নামাযের মত নয়। (তাই অন্যান্য গুনাহের কারণে ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। হাদিস থেকে নামাযের গুরুত্ব ও নামাযের পরিত্যাগের ভয়াবহ পরিণতি বুঝে আছে। -লামাআতুত তানকীহ, ৬/৪৫৪

১৩. ইমাম নববীর অমরগ্রন্থ 'রিয়াযুস সালিহিন' আমরা সবাই চিনি। মুহাক্কিক আলেমদের নিকট এ কিতাবের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শরাহ হলো আল্লামা ইবনে আল্লান দিমাশকী শাফেয়ী রহ. (মৃত্যু ১০৫৭ হি.) রচিত 'দালিলুল ফালিহীন', এ কিতাবে উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন-

**)قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم (أي أنطيعهم على سوء وصفهم المذكور، فلا ننابذهم، أي نخالفهم بترك الطاعة لهم (قال: لا) أي: لا تنابذوهم (ما) مصدرية ظرفية (أقاموا فيكم الصلاة) أي مدة إقامتهم لها فيكم، وفيه دليل تعظيم الصلاة. ويؤخذ منه: أن ترك إقامة الصلاة كالكفر البواح لقوله في حديث عبادة: «لا إلا أن تروا كفرا بواحا .«وقد تقدم في باب الأمر بالمعروف، وكذا تقدم فيه من حديث أم سلمة: «قالوا :يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة». رواه مسلم، وبه يتبين تفسير ننابذهم في حديث الباب، لأن تفسير السنة بالسنة أولى، وفي المصباح: نابذته الحرب: كاشفته إياها وجاهرته بها. (دليل الفالحين :124/5 ط. دار المعرفة: 1425 ه)**

হে আল্লাহর রাসূল তারা এত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কি আমরা তাদের আনুগত্য করবো, না কি তাদের আনুগত্য পরিহার করে তাদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে তোমরা তাদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ো না। এ হাদীস থেকে নামাযের গুরুত্ব বোঝা যায়। এথেকে এও বোঝা যায় যে, নামায প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দেওয়া কুফরে বাওয়াহের মতই। কেননা উবাদা রাযি. এর হাদীসে এসেছে 'ততক্ষণ কিতাল করবে না, যতক্ষণ না কুফরে বাওয়াহ দেখতে পাবে'। আমর বিল মারুফের অধ্যায়ে এই হাদিসটি গত হয়েছে এবং সেখানে উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিসটিও অতিবাহিত হয়েছে, 'সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতদিন তারা নামায কায়েম করবে ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না' সহিহ মুসলিম। এই হাদিস দ্বারা বুঝে আসে, আমাদের আলোচ্য হাদিসে منابذة (দ্বন্দ্ব) দ্বারা যুদ্ধ উদ্দেশ্য। কেননা হাদিসের ব্যাখা হাদিস দ্বারা করাই উত্তম। -দালিলুল ফালিহীন, ৫/১২৪

*চলবে ইনশাআল্লাহ*

**الجهاد محك الإيمان**

জিহাদ ইমানের কষ্টিপাথর

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪৬৭

# যে সকল কারণে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায় (পর্ব-২)

আদনানমা রুফ

Senior Member

০৬-০৫-২০১৯

গত পর্বে আমরা নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সহিহ হাদিস ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরেছি, এ পর্বে কিছু সংশয়ের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো সংশয়টা হলো, উবাদা বিন সামেতের হাদিসে তো শাসকের পক্ষ থেকে কুফরী প্রকাশ পাওয়া ব্যতীত বিদ্রোহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, আর নামায ছেড়ে দেওয়া হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী তো কুফরী নয়, তাহলে কিভাবে নামায তরকের কারণে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা হবে?

এর উত্তর হলো, নামায পরিত্যাগ করা কুফর না হলেও কুফরের আলামত বা নিদর্শন। কুফরের বিষয়টি যেহেতু একটু জটিল, আর শরিয়তের মূলনীতি হলো, শরিয়ত তার বিধিবিধানের ভিত্তি সুক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের উপর না রেখে সুস্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য বিষয়ের উপর রাখে, তাই শরিয়ত নামায তরক করাকে শাসকের কুফরের আলামত ধরে নিয়ে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের আদেশ দিয়েছে। উপরে আমরা উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখায় ইমাম বাইযাবী, ইবনে মালাক ও শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর যে বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করেছি, তা থেকে এ বিষয়টি খুব সহজেই বুঝে আসে, কেননা তারা সকলেই নামায তরক করাকে কুফরীর আলামত হিসেবে গণ্য করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এর পবিত্র সীরাতেও আমরা এর নযীর দেখতে পাই, আনাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

**كان رسول الله ﷺ يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. (صحيح البخاري: 610 صحيح مسلم: (382**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শত্রুর উপর) ভোরবেলা অতর্কিতে আক্রমণ করতেন। (তবে) তিনি (আক্রমণের পূর্বে) আযান শোনার জন্য মনোযোগ সহকারে অপেক্ষা করতেন, যদি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন, নতুবা আক্রমণ করতেন। সহিহ বুখারী, ৬১০ সহিহ মুসলিম, ৩৮২

হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৫২ হি.) বলেন,

**قال الخطابي: فيه أن الأذان شعار الإسلام، و أنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. (فتح الباري: 90/2 ط. دار الفكر**

খাত্তাবী রহ, বলেন, এই হাদিস প্রমাণ করে, আযান ইসলামের শিয়ার বা নিদর্শন। সুতরাং যদি কোন ভূখন্ডের অধিবাসীরা সকলে মিলে আযান ছেড়ে দেয় তাহলে মুসলিম শাসকের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হয়ে যাবে। -ফাতহুল বারী, ২/৯০

তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করা না করার ভিত্তি ইসলামের আলামত অর্থাৎ আযান শোনা বা না শোনার উপর রাখছেন, অথচ এখানে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, যারা আযান দিচ্ছে না তারা নওমুসলিম হওয়ার কারণে আযান শিখতে পারেননি। যেমনিভাবে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তারা মুসলিম না হয়ে শুধুমাত্র মুসলমানদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আযান দিচ্ছে। এই বিষয়টিই হাফেয ইবনে হাযার তুলে ধরেছেন, তিনি হাদিসের ব্যাখায় বলেন,

**وفيه دلالة على الحكم بالدليل لكونه كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. (فتح الباري: 112/6 ط. دار الفكر)**

হাদিসে দলিল ও আলামত দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত করার প্রমাণ রয়েছে, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র আযান শোনার দ্বারাই যুদ্ধ হতে বিরত থেকেছেন। -ফাতহুল বারী, ৬/১১২

এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, সফরে নামায কসর করার বিধান। মূলত সফরের কষ্টের কারণে সফরে নামায কসর করার বিধান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কষ্টের

বিষয়টি যেহেতু দূর্বোধ্য ও আপেক্ষিক, কারো কাছে একটি বিষয় কষ্টকর হলেও অন্যের জন্য তা একেবারেই সহজ, তাই শরিয়ত কসরের ভিত্তি কষ্টের উপর না রেখে নির্দিষ্ট দূরত্বের সফরের উপর রেখেছে, যা একটি সুস্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য বিষয়, তাই এখন শরয়ী সফর (প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার) করলেই মানুষ কসর করতে পারবে, যদিও এই সফর অত্যাধুনিক ও আরামদায়ক বাহনে কোন কষ্ট ছাড়াই হয়। -দেখুন, মাবসুতে সারাখসী, ১৭/১৫৬ দারুল মা'রেফা, ১৪১৪ হি.; কাশফুল আসরার, ইমাম আব্দুল আযীয বুখারী ৩/৪৬৮ দারুল কুতুব, ১৪১৮ হি.। শরিয়তে এর অসংখ্য নযির রয়েছে, উদাহরণস্বরুপ কিছু নযির উল্লেখ করলাম, আরো নযির জানার জন্য দেখুন, হেদায়া, ১/১৯-২০, দারু ইহইয়াউত তুরাস, এবং হেদায়ার শরাহ ইনায়া ১/৬৪ দারুল ফিকর; আলমুহিতুল বুরহানী, ১/৭৪ দারুর কুতুব, ১৪২৪ হি. এবং বাজলুল মাজহুদ, ২/১৩২ মারকাযুশ শায়েখ আবুল হাসান, ১৪২৭ হি.; ফাতহুল কাদির, ১/১০৭, দারুল ফিকর; আলইখতিয়ার, ৪/১২৯ মাতবাআতুল হালাবী, ১৩৫৬ হি.; তাবয়ীনুল হাকায়িক, ৩/৩৩; তুহফাতুল ফুকাহা, ২/৩৩২, দারুল কুতুব, ১৪১৪; আলওয়াশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ: ২৫৫ মাজমাউল আনহুর, ১/৬০ দারু ইহইয়াউত তুরাস এবং রদ্দুল মুহতার, ১/৩৩১ দারুল ফিকর, ১৪১২ হি.)

এ হলো, উম্মে সালামা রাযিআল্লাহু আনহার হাদিসের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য, কিন্তু থানভী রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের এমন ব্যাখা করেছেন, যার দ্বারা হাদিসের কোন ফায়দাই বাকী থাকে না, তিনি বলেন,

**حديث ثاني میں ترك صلاة اُس زمانه میں كفر هي كي علامت تهي، پس اس كا حاصل كفر ہی ہوا (امداد الفتاوی: 127/5 ط .مكتبه دار العلوم كراچي: 1431 ھ)**

'হাদিসে নামায পরিত্যাগকারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে, কেননা রাসূলের যমানায় নামায তরক করা কুফরের আলামত ছিল। সুতরাং 'যতদিন পর্যন্ত শাসক নামায পড়বে ততদিন তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করবে না' এর অর্থ এটাই যে যতদিন সে মুসলমান থাকবে ততদিন তার বিপক্ষে যুদ্ধ করবে না। -ইমদাদুল ফাতওয়া, ৫/১২৭

এরপর তিনি সেই যমানায় নামায তরক করা যে কুফরের আলামত ছিল এর স্বপক্ষে নিচের হাদিসগুলো উদ্ধৃত করেন,

**جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». رواه مسلم: (82(**

**عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». رواه الترمذي (2621) :وقال: هذا حديث حسن صحيح.**

**عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي: (2622(**

জাবের রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের মাঝে এবং কুফর ও শিরকের মাঝে প্রতিবন্ধক হলো নামায তরক করা। -সহিহ মুসলিম, ৮২

আবু মুসা আশআরী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাদের মাঝে ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য হলো, নামায। সুতরাং যে নামায ছেড়ে দিবে সে কাফের হয়ে যাবে। জামে তিরমিযি, ২৬২১ ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

আব্দুল বিন শাকিক বলখী রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা নামায ব্যতীত অন্য কোন আমল তরক করাকে কুফরী মনে করতো না। -জামে তিরমিযি, ২৬২২

কিন্তু থানভী রহিমাহুল্লাহুর এই বক্তব্যের উপর আমাদের পাঁচটি আপত্তি রয়েছে,

১. নামায তরক করা শুধু রাসূলের যমানায় কুফরের আলামত হবে কেন, রাসূলের হাদিস কি শুধু তার যমানার জন্যই, না কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিম উম্মাহর জন্য? উপরে ইমাম বাইযাবী, ইবনে মালাক ও শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে

দেহলভীর যে বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে আমরা দেখেছি, তারা সকলেই নামাযকে ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী ও নামায তরক করাকে কুফরীর আলামত হিসেবে গণ্য করেছেন, তাদের এই বক্তব্যের ভিত্তি যে, থানভী রহিমাহুল্লাহুর উল্লেখ করা হাদিসগুলো তা সহজেই বোধগম্য।

২. উপরে আমরা যে আলেমদের বক্তব্য নকল করেছি থানভী রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্য তাদের বক্তব্যের বিপরীত, বরং যেহেতু ইমাম কুরতুবী ও অনেকেই নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন এবং থানভী রহিমাহুল্লাহুর পূর্বে কোন আলেম 'নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষেও যুদ্ধ করা যাবে না' একথা বলেননি, তাই বলা যায় থানভী রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্য শরিয়তের দলিল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের বক্তব্যের পরিপন্থী একটি শায ও বিচ্ছিন্ন মত।

৩. থানভী রহিমাহুল্লাহ হাদিসের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা তার পূর্বের একাধিক আলেম স্পষ্টরুপে প্রত্যাখ্যান করেছেন, ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী বলেন,

**وقوله: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة «ظاهره: ما حافظوا على الصلوات المعهودة بحدودها وأحكامها وداموا على ذلك وأظهروه، وقيل: معناه: ما داموا على كلمة الإسلام، ... والأوَّل أظهر) .المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: 66/4 ط. دار ابن كثير: 1417 هـ)**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যতদিন তারা নামায কায়েম করে, ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করো না, এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, যতদিন তারা নির্ধারিত নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয়, নিয়মিত প্রকাশ্যে নামায আদায় করবে, ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসের অর্থ হলো, যতদিন তারা ইসলামের উপর থাকবেন ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। .... কিন্তু হাদিসের প্রথম অর্থটিই বেশি স্পষ্ট। আলমুফহিম, ৪/৬৬

ইমাম ইবনে রসলান শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৪৪ হি.) ও সুনানে আবু দাউদের শরাহ 'শরহু সুনানি আবী দাউদে' হুবহু একই কথা বলেছেন, তার ইবারত দেখুন,

**(قيل: يا رسول الله، أفلا نقتلهم؟) لفظ مسلم: قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ وكذا (قال) سليمان (ابن داود :أفلا نقاتلهم؟) على فعل ذلك (قال: لا ما صلوا) الصلوات الخمس. أي: ما أقاموا فيكم الصلاة المعهودة بحدودها وأحكامها وأظهروا فعلها. وقيل: معناه :ما داموا على كلمة الإسلام، ...والأول أظهر. (شرح سنن أبي داود لابن رسلان 18/377 :ط: دار الفلاح: 1437 هـ)**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যতদিন তারা নামায কায়েম করে, ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করো না, এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, যতদিন তারা নির্ধারিত নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয়, নিয়মিত প্রকাশ্যে নামায আদায় করবে, ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসের অর্থ হলো, যতদিন তারা ইসলামের উপর থাকবেন ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। ... কিন্তু হাদিসের প্রথম অর্থটিই বেশি স্পষ্ট। -শরহু সুনানি আবী দাউদ, ১৮/৩৭৭

৪. থানভী রহিমাহুল্লাহ হাদিসের যে ব্যাখা করেছেন, এর দ্বারা হাদিস থেকে নতুন কোন ফায়েদা পাওয়া যায় না, বরং এই হাদিস ও উবাদা বিন সামেতের হাদিস একই অর্থবোধক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আমরা হাদিসের যে ব্যাখা করেছি, সে অনুযায়ী দুটি হাদিসই নতুন নতুন ফায়দা দেয়। অর্থাৎ কুফর ও নামায তরক উভয় কারণেই শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের আদেশ বুঝে আসে। আর উসূলে ফিকহের মূলনীতি হলো, **التأسيس أولى من التأكيد لأن الإفادة خير من الإعادة** অর্থাৎ দুটি নসের এমন ব্যাখা করা যে, সে দুটি একই অর্থে হয়ে যায় এবং একটি অপরটির তাকীদ হয়, এরচেয়ে এটাই উত্তম যে, নসদুটির এমন ব্যাখা করা হবে যার দ্বারা উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দেয় এবং তা থেকে নতুন নতুন ফায়েদা পাওয়া যায়। (দেখুন, কাশফুল আসরার, ইমাম আব্দুল আযীয বুখারী, ৩/১৪৮ দারুল কুতুব; তাইসীরুত তাহরীর, আমীর বাদশা, পৃ: ৩৫৯ দারুল বায; আলকুল্লিয়্যাত, আবুল বাকা কাফাভী হানাফী, পৃ: ১০৬৫ মুয়াসসাসাতুল রিসালাহ, ১৪১৯ হি.; শরহুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যাহ, আহমদ যারকা, পৃ: ৩১৫ দারুল কলম, ১৪০৯ হি.; আলইহকাম ফি উসূলিল আহকাম, ইমাম আবুল হাসান আমিদী, ৩/২৫-২৬, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪২৬ হি.; আলবাহরুল মুহিত, ইমাম বদরুদ্দীন

যারকাশী, ১/১১৪ দারুল কুতুব, ১৪২১ হি.; ফাতহুল কাদীর, ৮/১৭৫ দারুল ফিকর)

৫. সবচেয়ে বড় কথা হলো, থানভী রহিমাহুল্লাহ হাদিসের এই অর্থ করেছেন, পূর্বে উল্লিখিত উবাদা বিন সামেত থেকে বর্ণিত, 'তবে যদি তোমরা স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও' শীর্ষক হাদিসের কারণে, কেননা এ হাদিসের বাহ্যিক বিবরণ থেকে বুঝে আসে, কুফর ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা যায় না। কিন্তু খোদ থানভী রহিমাহুল্লাহুই আলোচনার ধারাবাহিকতায় একটু পরে গিয়ে বলেছেন, 'ইসলামের পরিপন্থী কানুন তৈরী করে মানুষকে গুনাহে বাধ্য করা কুফরের হুকুমে, তাই কোন শাসক এরকম কানুন তৈরী করলে তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে'। (এ বিষয়ে তার পূর্ণ ইবারত সহ বিস্তারিত আলোচনা আমরা দ্বিতীয় পর্বে করবো ইনশাআল্লাহ) এবং টীকায় এ মতের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে তিনি বলেন,

**چنانچه فقهاء كا أذان وختان كے (جو كه سنن میں سے هیں) ترك عام كو استخفاف دین یا موجب محاربۂ تاركین فرمانا صریح دلیل هے ایسے عموم كے بحكم كفر هونے كي -ملاحظه هو در مختار و رد المحتار باب الأذان ومسائل شتى حكم الختان - 12- أشرف علي-**

'আযান ও খতনা সুন্নতে মুয়াক্কাদা হওয়া সত্ত্বেও ফুকাহায়ে কেরাম আযান ও খতনা ব্যাপকভাবে ছেড়ে দেওয়াকে দ্বীনকে গুরুত্বহীন মনে করার দলিল গণ্য করেছেন এবং যারা এবিষয়গুলো ব্যাপকভাবে ছেড়ে দিবে তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব বলেছেন, এটা প্রমাণ করে যে কানুনের মাধ্যমে মানুষকে ব্যাপকভাবে গুনাহে বাধ্য করা কুফরীর হুকুমে'। -ইমদাদুল ফাতাওয়া, -৫/১৩০

তো প্রশ্ন হলো, যদি ব্যাপকভাবে আযান বা খতনা ছেড়ে দেওয়া এবং ইসলামের পরিপন্থী আইন করে মানুষকে গুনাহে বাধ্য করা কুফরীর হুকুমে হতে পারে, তাহলে নামায তরক করা কেন কুফরীর হুকুমে হতে পারবে না, অথচ পূর্বে উদ্ধৃত আলেমদের বক্তব্যে আমরা দেখেছি, আল্লামা ত্বীবী, মোল্লা আলী কারী ও ইবনে আল্লান রহিমাহুমাল্লহ সবাই নামায তরককে **كالكفر** অর্থাৎ কুফরের মত বা কুফরের হুকুমে ধরেছেন।

আল্লামা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমও থানভী রহিমাহুল্লাহুর মতটিই গ্রহণ করেছেন, তিনি এর স্বপক্ষে কাযী ইয়াযের নিম্মোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন,

**معنى: «ما صلوا» ما داموا على الإسلام، فالصلاة إشارة إلى ذلك. (تكملة فتح الملهم: 293/3 ط. دار إحياء التراث العربي(**

রাসূলের বাণী, 'যতদিন তারা নামায পড়ে' অর্থাৎ যতদিন তারা ইসলামের উপর বাকী থাকে, নামাযের কথা বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে'। -তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/২৯৩

কিন্তু পূর্বে আমরা দেখেছি, কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

**لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة. وذهب بعض البصريين إلى أنها تنعقد لها وتستديم على التأويل، فإذا طرأ مثل هذا على وال من كفر أو تغيير شرع أو تأويل بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك. (إكمال المعلم 6/246 :ط. دار الوفاء: 1419 هـ(.**

উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ'আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ'আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা'বিলকারী। অতএব শাসক যদি এজাতীয় কাজগুলোর কোন একটি, যেমন, কুফর, শরীয়া পরিবর্তন অথবা বিদ'আতে লিপ্ত হয়, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, সম্ভব হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ

খলিফা নিযুক্ত করা, যদি এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। -ইকমালুল মু'লিম, ৬/২৪৬

তো এখানে আমরা দেখছি, কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ সুস্পষ্টরুপে বলছেন, শাসকের থেকে কুফর, নামায তরক, শরিয়ত পরিবর্তন ইত্যাদি কাজ প্রকাশ পেলে তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর ইলমের সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো, কোন বক্তব্য অপর (চাই তা কুরআন-সুন্নাহর বাণী হোক বা কোন আলেমের বক্তব্য) বক্তব্যের বিরোধী হয়ে গেলে যেটা মুহকাম বা দ্ব্যার্থহীন সেটা অনুযায়ী আমল করা হবে, আর যে বক্তব্য মুতাশাবিহ বা দ্ব্যার্থবোধক সেটাকে মুহকামের সাথে মিলিয়ে এমনভাবে ব্যাখা করা হবে যেন দুই বক্তেব্যের মাঝে কোন বিরোধ না থাকে, পরিভাষায় একে رَدُّ الْمُتَشَابِه إِلَى الْمُحْكَم (মুতাশাবিহকে মুহকামের দিকে ফিরানো, মুহকাম অনুযায়ী ব্যাখা করা) বলা হয়। -(দেখুন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত, ৭; আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস, ২/২৮২ দারু ইহইয়াউত তুরাস ১৪০৫ হি.; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৩৬৫ দারু তাইয়েবাহ, ১৪১৯ হি.; বাদায়েউস সানায়ে' ১/২১ দারুল কুতুব, ১৪০৬ হি.; বাহরুল রায়েক, ১/২৫৯ দারুল কিতাবিল ইসলামী; ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, ৪/৫৮ দারু ইবনুল জাওযী, ১৪২৩ হি.; ফাতহুল বারী, ইবনে রজব, ৭/২৪০ মাকতাবাতুল গুরাবা আলআছারিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.)

সুতরাং এই উসুলের আলোকে আমরা বলতে পারি, কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ যে নামায তরক করাকে কুফরের দিকে ইশারা করেছেন এর অর্থ হলো, নামায তরক করা কুফরের আলামত, তাই যেভাবে কুফরী পাওয়া গেলে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তেমনিভাবে নামায তরক করলেও শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আর যদি কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহুর বক্তব্যের যে অর্থ তাকী উসমানী সাহেব বুঝেছেন, সেটাই সঠিক বলে ধরে নিই, তাহলেও এটা নামায পরিত্যাগকারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ না করার তেমন কোন দলিল হতে পারে না। কেননা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী ও ইবনে রাসলান রহিমাহুমাল্লাহ হাদিসের এই অর্থকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং হাদিসের স্বাভাবিক অর্থকেই প্রাধাণ্য দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য আবারও একটু দেখে নিন,

**وقوله: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة «ظاهره: ما حافظوا على الصلوات المعهودة بحدودها وأحكامها وداموا على ذلك وأظهروه، وقيل: معناه: ما داموا على كلمة الإسلام، ... والأوَّل أظهر) .المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: 66/4 ط. دار ابن كثير: 1417 هـ وشرح سنن أبي داود لابن رسلان: 377/18 ط: دار الفلاح: 1437 هـ(**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যতদিন তারা নামায কায়েম করে, ততদিন তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করো না, এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, যতদিন তারা নির্ধারিত নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয়, নিয়মিত প্রকাশ্যে নামায আদায় করে, ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসের অর্থ হলো, যতদিন তারা ইসলামের উপর থাকবেন ততদিন তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না। ... কিন্তু হাদিসের প্রথম অর্থটিই বেশি স্পষ্ট। - আলমুফহিম, ৪/৬৬; শরহু সুনানি আবী দাউদ, ১৮/৩৭৭

*চলবে ইনশাআল্লাহ*

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪৭৪

# যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৩

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৫-১২-২০১৯

**চার. পশুর সাথে সঙ্গমকারী**

এক হাদিসে পশুর সাথে সঙ্গমকারীকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে:

**(من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه)**

“কাউকে কোন পশুর সাথে সঙ্গম করতে দেখলে হত্যা করে দেবে।” - আবু দাউদ: ৪৪৬৬ , তিরিমিযি: ১৪৫৫

**এ হাদিসের বর্ণনাকারী হলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। কিন্তু তার থেকে এর বিপরীত বর্ণনা আছে। তিনি বলেন,**

**ليس على الذى يأتى البهيمة حد**

“পশুর সাথে সঙ্গমকারী ব্যক্তির উপর হদ বর্তাবে না।”- আবু দাউদ: ৪৪৬৭ , তিরিমিযি: ১৪৫৫

এ থেকে বুঝা যায়, হাদিসে যে হত্যার কথা বলা হয়েছে, তা হদ হিসেবে নয় যে, অবশ্যই হত্যা করতে হবে। বরং তা’যির উদ্দেশ্য। যদি কোন ব্যক্তি এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ইমামুল মুসলিমীন তাকে হত্যা করা মুনাসিব মনে করেন, তাহলে তা’যিররূপে হত্যা করতে পারেন। আর যদি হত্যা করার দরকার মনে না করেন, তাহলে অন্য শাস্তি দেবেন।

**আল্লামা আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,**

**وقيل: إنما قال ذلك في فاعل اعتاد وبذلك قتل سياسة عندنا. اهـ البناية 312\6**

“বলা হয়, হত্যার নির্দেশ এমন ব্যক্তির ব্যাপারে দিয়েছেন, যে এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তাকে সিয়াসতরূপে হত্যা করা হবে।”- আলবিনায়া ৬/৩১২

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩২৮২

# আহকামুস সিয়ার: অবতরণিকা

**Ahkamus Siyar**

Junior Member

০৯-৩০-২০১৯

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ...

প্রিয় ভাইয়েরা! সারা বিশ্বেই আজ জিহাদের জোয়ার শুরু হয়েছে। আমাদের এ দেশেও আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘদিন যাবৎ কম-বেশ জিহাদি কার্যক্রম হয়ে আসছে। বিশেষত বর্তমান যুব ও তরুণ সমাজে জিহাদের অবিস্মরণীয় সাড়া দেখা যাচ্ছে। যে যেভাবে পারছে জিহাদের কাজে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছে। সে সুবাদে আমারও ইচ্ছে, জিহাদের কোন না কোন খিদমতে শরীক হওয়ার। জিহাদ নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কুরআন, হাদিস ও ফিকহ থেকে কিছু পড়াশুনার তাওফিক আমার হয়। এবার চাচ্ছি দলীলভিত্তিক জিহাদের কিছু মাসআলা-মাসায়েল ভাইদের সামনে পেশ করবো। আশাকরি অনেকের উপকারে আসবে। ভাইদের কাছে দোয়ার দরখাস্ত আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে তাওফিক দেন এবং কবুল করেন।

**আজ শুভেচ্ছা পর্বে একটি মাসআলা পোস্ট করছি ইনশাআল্লাহ-**

প্রশ্ন: কিতালের পূর্বে কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার কি বিধান? দাওয়াতের প্রকার ও হিকমতসহ আলোচনা করুন?

**উত্তর:** কাফেরদের অবস্থাভেদে কিতালের পূর্বে তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার বিধান ভিন্ন ভিন্ন হয়। কখনো দাওয়াত দেওয়া ফরয, কখনো মুস্তাহাব আবার কখনো দাওয়াত দেয়া নাজায়েয।

ইকদামি জিহাদের সময় যদি কাফেরদের কাছে ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছে, তাহলে আক্রমণ করার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া আবশ্যক। দাওয়াত ব্যতীত আক্রমণ করা জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।” -সূরা নাহল: ১২৫

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

**وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا**

“রাসূল পাঠানো (এবং রাসূলের মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছানো ও সতর্ক করণ) ব্যতীত আমি (কোন জাতিকে) শাস্তি দেই না।” -সূরা ইসরা: ১৫

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত,

**عن ابن عباس، قال: ما قاتل رسول الله ﷺ قوما حتى يدعوهم.**

“হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত না দিয়ে কোন কওমের উপর আক্রমন করেননি।” –মুসনাদে আহমদ, হাদিস ২০৫৩

সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে:

**عن سليمان بن بريدة عن ابيه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا امّر اميرا على جيش أو سرية ... قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ...وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فان هم ابوا فسلهم الجزية، فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم .**

“হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা - বুরাইদা রাদি. - থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন জাইশ-বড় বাহিনী বা সারিয়্যা-ছোট দলের আমীর নিযুক্ত করতেন ... তখন তাকে বলে দিতেন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামে ঐসব লোকের বিরুদ্ধে কিতাল করবে, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে। ... যখন তুমি তোমার দুশমন মুশরিকদের মুকাবেলায় যাবে, তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের আহ্বান জানাবে;

এর যে কোন একটায় তারা সম্মত হলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করবে:

(প্রথমত) তাদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে।

যদি তারা এতে অসম্মতি জানায় তাহলে জিযিয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে।

যদি তারা এতেও অসম্মতি জানায়, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।"- সহীহ মুসলিম ১৭৩১

## দাওয়াতের হিকমত

ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার আগেই আক্রমণ করে বসলে তারা বুঝে উঠতে পারবে না যে, আমরা কেন যুদ্ধ করছি? ধনসম্পদ লুট করার জন্য না'কি দ্বীনের জন্য? দাওয়াত দিয়ে স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, আমাদের যুদ্ধ দ্বীনে হক তথা ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য। তখন হয়তো তারা ইসলাম গ্রহণ করে তার সুশীত ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারে, কিংবা জিযিয়া দিয়ে ইসলামী হুকুমতের অধীনস্ততা বরণ করে নিতে সম্মত হতে পারে। কোনটাতেই সম্মত না হলে তাদের আর কোন উজর বাকি নেই। এবার তরবারিই তাদের সমাধান।

***

পক্ষান্তরে যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে গেছে, তাদেরকে দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেয়া আবশ্যক নয়। দাওয়াত ছাড়াই আক্রমণ বৈধ। সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে,

**إن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارون و أنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية .**

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুস্তালিকের উপর আকস্মিক আক্রমন করলেন। তখন তারা অপ্রস্তুত ও বেখবর ছিল। তাদের গবাদিপশুগুলো পানি পান

করছিল। তিনি তাদের যোদ্ধোপোযোগী পুরুষদের হত্যা করলেন। তাদের নারী-শিশুদের বন্দি করলেন। আর ঐ যুদ্ধেই তিনি উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে গনিমত হিসেবে পেয়েছিলেন।" -সহীহ বুখারী ২৫৪১

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২হি.) সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বলেন,

**وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى ... وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال: كنا ندعو وندع. قلت: وهو منزل على الحالين المتقدمين. (فتح الباري: 6 : 108 ط. دار الفكر(**

"অধিকাংশ আলেমদের মতে দাওয়াত দেওয়ার আবশ্যকতা ইসলামের সূচনালগ্নে ছিল, যখন ইসলামের দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রচার হয়নি। (আর এখন যেহেতু ইসলামের দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রচার হয়েছে, সকলেই ইসলামের কথা জানে, তাই এখন দাওয়াত দেওয়া জরুরী নয়।) তবে যদি এমন কেউ থেকে থাকে, যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, তাহলে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। ... সাঈদ বিন মানসুর রহ. (তার সুনানগ্রন্থে) বিখ্যাত তাবেয়ী আবু উসমান নাহদি রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 'আমরা কোনো কোনো সময় দাওয়াত দিতাম, আবার কোনো কোনো সময় দিতাম না'। আমি বলি- অর্থাৎ হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন- হাদিসটি দুই সময়ে পূর্ব বর্ণিত ভিন্ন দুই অবস্থার উপর প্রয়োগ হবে।" -ফাতহুল বারী ৬/১০৮

অর্থাৎ যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেছে তাদের সাথে দাওয়াত ব্যতীতই যুদ্ধ করতেন, আর যাদের কাছে পৌঁছেনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিতেন।

***

যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেছে, তাদেরকে পুনর্বার দাওয়াত দিলে যদি ফায়েদা হবে বলে আশা থাকে- যেমন, তারা হয়তো মুসলমান হয়ে যাবে বা জিযিয়ায় সম্মত হবে বলে আশা করা যায়- তাহলে দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব। খায়বারের যুদ্ধ যে ইয়াহুদীর সাথে চলছিল, তারা ইসলাম সম্পর্কে সম্যক অবগত

ছিল। তথাপি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠান, তাকে অসিয়ত করে দেন,

**انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، خير لك من أن يكون لك حمر النعم .**

“ধীর-স্থিরভাবে গিয়ে তাদের প্রাঙ্গণে অবতরণ করবে। এরপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার যে হক রয়েছে তার ব্যাপারে তাদেরকে অবগত করবে। আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা একটি মাত্র লোককে হিদায়াত দিলেও তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়ে উত্তম।” -সহীহ বোখারী ৩৭০১

যদি ফায়েদা হবে বলে কোন আশা না থাকে, তাহলে পুনর্বার দাওয়াত মুস্তাহাব নয়। পক্ষান্তরে যদি দাওয়াত দিতে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে- যেমন, তারা দূর্গে আশ্রয় নিয়ে নেবে ফলে সহজে কাবু করা সম্ভব হবে না বা মুসলমানদের ব্যাপারে কোন ষড়যন্ত্র পাকাবে- তাহলে দাওয়াত দেয়া নাজায়েয। তদ্রূপ যদি তারা আমাদের উপর আক্রমণ করে বসে তাহলেও দাওয়াতের কোন বিধান নেই।

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২৯০

# হাদিসে কাফেরদের নারী-শিশু হত্যা করতে নিষেধ এসেছে কি? এ নিষেধের কারণ কি?

[Ahkamus Siyar](#)

Junior Member

১০-০২-২০১৯

প্রশ্ন. হাদিসে কাফেরদের নারী-শিশু হত্যা করতে নিষেধ এসেছে কি? এ নিষেধের কারণ কি?

**উত্তর:**

হ্যাঁ, একাধিক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃত কাফেরদের নারী-শিশু হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন-

**«وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ، «فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان .»**

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। (তা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে দেন।” -সহিহ বুখারী ৩০১৫, সহিহ মুসলিম ১৭৪৪

রাবাহ ইবনে রবি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

**كنا مع رسول الله -ﷺ- في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا، فقال: "انظر علام اجتمع هؤلاء" فجاء، فقال: على امرأة قتيل. فقال: "ما كانت هذه لتقاتل"، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا، فقال: "قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا". (قال شعيب الأرنؤوط :إسناده صحيح(**

“আমরা এক যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি লোকদেরকে একটা কিছুর পাশে একত্রিত দেখতে পেলেন। তখন তিনি একজনকে এ বলে পাঠালেন যে, ‘দেখো তো এরা কেন একত্রিত হয়েছে’? লোকটি এসে জানালেন, (তারা) একজন নিহত মহিলার পাশে একত্রিত হয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আপত্তির সুরে) বললেন, ‘এ তো লড়াই করার মতো ছিল না’। বর্ণনাকারী বলেন, সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগের দায়িত্বে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে তার কাছে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, খালিদকে বলবে সে যেন কোন মহিলাকে বা শ্রমিককে হত্যা না করে।” –সুনানে আবু দাউদ ২৬৬৯

এ সকল হাদীসের আলোকে উলামায়ে ইসলাম ইচ্ছাকৃত নারী-শিশুদের হত্যা করা নাজায়েয বলেছেন।

সহিহ মুসলিমের উল্লিখিত ১৭৪৪ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন-

**أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان.اهـ**

“উলামায়ে কেরাম এই হাদীসের মর্মের উপর আমল করা ও নারী-শিশুদের হত্যা করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত”। –শরহু মুসলিম লিননববী ১২/৪৮

ইবনে বাত্তাল রহ. (৪৫৯ হি বলেন,

**ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم.اهـ**

“ইচ্ছাকৃত হারবিদের নারী ও শিশুদের হত্যা করা সকল আলেমের নিকটই নাজায়েয।” -শরহু সহিহিল বুখারী, ৫/১৭০

ইমাম কাসানি রহ. (৫৮৭ হি.) বলেন-

**أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي ... أما المرأة والصبي، فلقول النبي -عليه الصلاة والسلام - «لا تقتلوا امرأة ولا وليدا» وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فأنكر ذلك وقال - عليه**

**الصلاة والسلام -: «هاه ما أراها قاتلت، فلم قتلت؟ ونهى عن قتل النساء والصبيان».اهـ**

"যুদ্ধাবস্থায় নারী-শিশুদের হত্যা করা জায়েজ নেই। ... কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নারী ও শিশুদের হত্যা করো না। আরো বর্ণিত আছে, তিনি কোন এক যুদ্ধে একজন মহিলাকে নিহত দেখতে পেয়ে তাতে আপত্তি জানিয়ে বললেন- আফসোস! এ তো লড়াই করেছে মনে হয় না; তাহলে কেন তাকে হত্যা করা হলো? তখন তিনি নারী-শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে দেন।" –বাদায়িউস সানায়ে ৬/৬৩

## হত্যা নিষেধ হওয়ার কারণ

হত্যা নিষেধ হওয়ার কারণ হল, নারী-শিশুদের শরীর যুদ্ধের উপযুক্ত নয় এবং সাধারণত তারা যুদ্ধে আসে না। পুরুষরাই যুদ্ধের উপযোগী এবং সাধারণত তারাই যুদ্ধে এসে থাকে। অতএব, কাফেরদের বয়স্ক পুরুষরাই স্বাভাবিক মুসলমানদের জন্য হুমকি স্বরূপ, নারী-শিশুরা নয়, বরং তারা বন্দী হওয়ার পর মুসলমানদের গনিমতে পরিণত হবে। তাই হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, রাবাহ ইবনে রবি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে দেখেছি যে, হত্যা নিষেধের কারণ বলেছেন, 'এ তো যুদ্ধ করার মতো ছিল না'।

কাসানী রহ. (৫৮৭ হি.) নিষেধের কারণ প্রসঙ্গে বলেন,

**لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال.اهـ**

"কেননা, তারা লড়াই করার উপযুক্ত নয়।"- বাদায়িউস সানায়ে ৬/৬৩

ইবনে বাত্তাল রহ. (৪৫৯ হি.) বলেন,

**لأنهم ليسوا ممن قاتل فى الغالب .اهـ**

"কেননা, তারা সাধারণত যুদ্ধ করতে আসে না।"- শরহু সহিহিল বুখারী, ৫/১৭০

বুরহানুদ্দিন মারগিনানী রহ. (৫৯৩ হি.) বলেন

**ولا يقتلوا امرأة ولا صبيا ..." لأن المبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم.اهـ**

“মুসলিম মুজাহিদরা নারী-শিশুদের হত্যা করবে না। ... কারণ, আমাদের মতে হত্যার বৈধতা প্রদানকারী কারণ হল, যুদ্ধের উপযুক্ততা। আর তা তাদের মধ্যে নেই।” -হিদায়া ২/৩৮০

***

বি.দ্র.

১. ইচ্ছাকৃত হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত নিহত হয়ে গেলে কোন সমস্যা নেই।

২. হত্যা নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা যুদ্ধের উপযোগী নয় এবং তারা যুদ্ধ করতে আসে না। অতএব, যাদের বেলায় এর ব্যতিক্রম হবে (তথা নারী-শিশুরাও যুদ্ধে শরীক হবে) তাদের হত্যা করতে সমস্যা নেই।

সামনে আমরা এ দু’টি মাসআলা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩২০

# প্রশ্ন- কাফেরদের নারী শিশুকে কখন হত্যা করা জায়েয? এর দলীল কি?

Ahkamus Siyar

Junior Member

১০-০৫-২০১৯

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

যুদ্ধ বা যুদ্ধের বাইরে সর্বাবস্থায় কাফেরদের নারী-শিশুদের ইচ্ছাকৃত হত্যা করা নাজায়েয। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছে-

**«وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ، «فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان .»**

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। (তা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে দেন।” -সহিহ বুখারী ৩০১৫, সহিহ মুসলিম ১৭৪৪

অপর হাদিসে এসেছে: রাবাহ ইবনে রবি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

**كنا مع رسول الله -ﷺ- في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا، فقال: "انظر علام اجتمع هؤلاء" فجاء، فقال: على امرأة قتيل .فقال: "ما كانت هذه لتقاتل"، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا، فقال: "قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا". (قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح(**

“আমরা এক যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি লোকদেরকে একটা কিছুর পাশে একত্রিত দেখতে পেলেন। তখন তিনি একজনকে এ বলে পাঠালেন যে, ‘দেখো তো এরা কেন একত্রিত হয়েছে’? লোকটি এসে জানালেন, (তারা) একজন নিহত মহিলার পাশে একত্রিত হয়েছে। তখন রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আপত্তির সুরে) বললেন, 'এ তো লড়াই করার মতো ছিল না'। বর্ণনাকারী বলেন, সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগের দায়িত্বে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে তার কাছে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, খালিদকে বলবে সে যেন কোন মহিলাকে বা শ্রমিককে হত্যা না করে।" –সুনানে আবু দাউদ ২৬৬৯

উল্লিখিত হাদিসদ্বয় ও এ মর্মে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের নির্দেশানুসারে স্বাভাবিক অবস্থায় ইচ্ছাকৃত নারী-শিশুদের হত্যা নাজায়েয। তবে হত্যা নিষেধ হওয়ার কারণ হল, নারী-শিশুদের শরীর যুদ্ধের উপযুক্ত নয় এবং সাধারণত তারা যুদ্ধে আসে না। পুরুষরাই যুদ্ধের উপযোগী এবং সাধারণত তারাই যুদ্ধে এসে থাকে। অতএব, কাফেরদের বয়স্ক পুরুষরাই স্বাভাবিক মুসলমানদের জন্য হুমকি স্বরূপ, নারী-শিশুরা নয়, বরং তারা বন্দী হওয়ার পর মুসলমানদের গনিমতে পরিণত হবে। তাই হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, রাবাহ ইবনে রবি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে দেখেছি যে, হত্যা নিষেধের কারণ বলেছেন,

**ما كانت هذه لتقاتل**

'এ তো যুদ্ধ করার মতো ছিল না'।

যাদের বেলায় এর ব্যতিক্রম হবে; তথা যেসব নারী-শিশু প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোনভাবে যুদ্ধে শরীক হবে, তাদের হত্যা করতে সমস্যা নেই।

খাত্তাবী রহ. (৩৮৮ হি.) বলেন-

**فيه دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها أنها لا تقاتل فإذا قاتلت دل على جواز قتلها.اهـ**

"হাদিসটি প্রমাণ করে, মহিলা যদি যুদ্ধ করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। দেখছো না হাদিসে হত্যা করা হারাম হওয়ার কারণ বলা হয়েছে, মহিলা যুদ্ধ করার মতো লোক নয়। অতএব, সে যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে হাদিস বুঝাচ্ছে যে, তাকে হত্যা করা জায়েয।" -মাআলিমুস সুনান ২/২৮০

কাসানী রহ. (৫৮২ হি.) বলেন-

**ولو قاتل واحد منهم قتل، وكذا لو حرض على القتال، أو دل على عورات المسلمين، أو كان الكفرة ينتفعون برأيه، أو كان مطاعا، وإن كان امرأة أو صغيرا؛ لوجود القتال من حيث المعنى.اهـ**

"(যাদের হত্যা করা নিষেধ) তাদের কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাকে হত্যা করা যাবে। তদ্রূপ তাদের কেউ যদি (কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে, মুসলমানদের গোপন খবরাখবর তাদের অবগত করে বা কাফেররা তার বুদ্ধি-পরামর্শের মাধ্যমে উপকৃত হয় কিংবা সে নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি হয় তাহলে নারী হোক শিশু হোক- তাকেও হত্যা করা হবে। কারণ, তার থেকে (সরাসরি না হলেও) পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ পাওয়া গেছে।" -বাদায়িউস সানায়ে ৭/১০১

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন-

**وكذلك يقتل من قاتل من كل من قلنا إنه لا يقتل كالمجنون والصبي والمرأة.اهـ**

"পিছনে আমরা পাগল, শিশু ও নারী যাদের হত্যা করা নিষিদ্ধ বলেছি, তারা যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাদেরও হত্যা করা যাবে।" -ফাতহুল কাদীর ৫/৪৫৪

সারকথা হল, স্বাভাবিক অবস্থায় কাফিরদের নারী-শিশুদের হত্যা করা অবৈধ। তবে তারা যদি কোন না কোন ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তবে তাদের হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে মূলনীতি উল্লেখ করতে গিয়ে কাসানী রহ. বলেন-

وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطاعة والتحريض، وأشباه ذلك على ما ذكرنا.اهـ

"যারা যুদ্ধের উপযুক্ত নয় তাদের হত্যা করা অবৈধ। তবে তারা যদি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কিংবা মতামত, নেতৃত্বদান, উদ্বুদ্ধকরণ বা এ জাতীয় অন্য কোন মাধ্যমে -যা আমরা উল্লেখ করেছি- পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাদেরকেও হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে।" -বাদায়িউস সানায়ে ৭/১০১

**বি.দ্র.**

উপরোক্ত মাসআলা অনুযায়ী বর্তমান মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান, এমপি, মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেত্রীদের হত্যা যাবে। সেনাবাহিনি, র*্যাব, পুলিশ বিভাগ বা গোয়েন্দা বিভাগসহ অন্য যে কোন সামরিক বিভাগে কর্মরত মহিলাদের হত্যা করা যাবে। তদ্রূপ, বাহিনির সেবা-যত্নের জন্য বা ফাহেশা কাজের জন্য যেসব মহিলাকে বাহিনির সাথে রাখা হয়, তাদেরকেও হত্যা করা যাবে। এসব নারী যদি না থাকতো, তাহলে আমেরিকা থেকে এসে এসব সৈন্য আফগানের মতো দূর দেশে থাকতে পারতো না। এতএব, এরাও প্রকারান্তরে বাহিনিরই লোক। এদেরকেও হত্যা করা যাবে। [বিস্তারিত দেখুন- মাসায়িল মিন ফিকহিল জিহাদ; শায়খ আবু আব্দুল্লাহ আলমুহাজির, মাসআলা নং ৬, যে সকল হারবী কাফিরদের ইচ্ছাকৃত হত্যা করা বৈধ নয়]

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩৩৩

# জিহাদ কয় প্রকার? কুরআন সুন্নাহয় এর দলীল কি? এর স্বপক্ষে আকলী-যুক্তিগত দলীল কি?

Ahkamus Siyar

Junior Member

১০-০৭-২০১৯

**উত্তর:**

**জিহাদ দুই প্রকার:**

এক. ইকদামি তথা আক্রমণাত্ম জিহাদ; দুই. দিফায়ি তথা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ।

♣ **ইকদামি জিহাদ:** ইকদামি জিহাদ করা হয় কাফেরদের দেশে গিয়ে। এর উদ্দেশ্য হল, কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণ করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করা। ইসলামের প্রতাপ ও সৌন্দর্য তাদের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা অনায়াসে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়। তা না হলে জিযিয়া প্রদান করত দারুল ইসলামে মুসলমানদের অধীনস্থ যিম্মি হয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“অত:পর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে – মুসলমান হয়ে যায় – এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”- তাওবা ৫

আরো ইরশাদ করেন,

**يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً**

"হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আর তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা দেখতে পায়।"- তাওবা ১২৩

আরো ইরশাদ করেন,

**قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ**

"তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।"- তাওবা ২৯

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

**أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة**

"আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই স্বাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে।"- সহীহ বুখারী ২৫

**ইকদামি জিহাদের বিধান:** ইকদামি জিহাদ ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক মুসলমান আদায় করলে বাকিদের থেকে এর দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। আর কেউই আদায় না করলে সকলেই গুনাহগার হবে। প্রত্যেক বছর একবার/দু'বার অভিযান চালানো ফরয। একবারও না করলে গুনাহগার হবে।

কুরআনে কারীমে এর দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

"যে সকল মুমিন কোনও ওজর না থাকা সত্বেও (যুদ্ধে যোগদান না করে ঘরে) বসে থাকে, তারা আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদকারীগণ সমান নয়। যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তবে তাদের উভয়কেই আল্লাহ তাআলা উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। কিন্তু যারা বসে থাকে, তাদের তুলনায় মুজাহিদগণকে আল্লাহ তাআলা মহা প্রতিদানে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"- সূরা নিসা ৯৫

যারা জিহাদ করবে আর যারা না করবে তাদের উভয়কেই আল্লাহ তাআলা উত্তম পুরস্কার দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। তাহলে যারা জিহাদ না করবে তারা কোন শাস্তির সম্মুখীন তো হবেই না, বরং নিজ নিজ নেক আমলের বদৌলতে উত্তম পুরস্কার পাবে। বুঝা গেল, স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ সকলের উপর ফরযে আইন নয়। যদি ফরযে আইন হতো, তাহলে না করার কোন সুযোগ থাকতো না।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ

"মুসলিমদের সকলে এক সঙ্গে (জিহাদে) বেরিয়ে পড়া উচিৎ নয়। তারা এমন করলো না কেন যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে কিছু কিছু লোক বের হতো?" - সূরা তাওবা ১২২

আল্লাহ তাআলা কিছু সংখ্যক লোককে জিহাদে যেতে বলেছেন, সকলেই চলে যেতে বারণ করেছেন। বুঝা গেল, সকলের উপর ফরয নয়।

**হাদিস থেকে এর দলীল:** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরত। অনেক সময় তিনি নিজে জিহাদে বের হতেন, আবার অনেক সময় সারিয়্যা পাঠাতেন, নিজে মদীনায় অবস্থান করতেন। যদি সর্বাবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন হতো, তাহলে কখনোও তিনি পিছনে থেকে যেতেন না।

**আকলী-যুক্তিগত দলীল:** সকলে জিহাদে চলে গেলে দুনিয়াবি বিষয়াশয় বিনষ্টের সম্মুখীন হবে। নারী-শিশু ও দুর্বলদের দেখাশুনা করার কেউ থাকবে না। এমনকি জিহাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করার মতোও কেউ থাকবে না। অথচ জিহাদের মতো এগুলোও ফরয। এজন্য কেউ জিহাদে যাবে আর কেউ অন্য কাজ করবে। অন্যথায় দ্বীন-দুনিয়া সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

**♣ দিফায়ি জিহাদ:** দিফা অর্থ প্রতিরোধ করা। মুসলিমদের জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু, ভূমি বা দ্বীন-ধর্ম আগ্রাসনের শিকার হলে প্রতিহত করা ফরয। এ জিহাদকে দিফায়ি তথা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বলে।

**দিফায়ি জিহাদের বিধান:** দিফায়ি জিহাদ ফরযে আইন। ফরযে আইন অর্থ সকলকেই শরীক হতে হবে। কেউ পিছিয়ে থাকতে পারবে না- যেমন, নামায রোযা। তবে প্রথমত সকলের উপর ফরযে আইন নয়। যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে, তাদের উপর ফরযে আইন। তারা যদি না পারে বা না করে তাহলে পার্শ্ববর্তীদের উপর বর্তাবে। এভাবে বিস্তৃত হতে হতে এক সময় সমগ্র দুনিয়াব্যাপী ফরযে আইন হয়ে যায়।

**কুরআনে কারীম থেকে এর দলীল-** ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী,

**يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(39) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .(41)التوبة**

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হও, তখন তোমরা যমীনের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের

ভোগ-সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। যদি তোমরা জিহাদে বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন। তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাঁকে বের করে দিয়েছিল; যখন তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয় জন। যখন তাঁরা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিলেন। যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বললেন, 'তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন'। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। তোমরা হালকা ও ভারী যে অবস্থায়ই থাক, জিহাদে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জান।" -তাওবা: ৩৮-৪১

হালকা-ভারী সর্বাবস্থায় জিহাদে বের হতে বলা হয়েছে। বের না হলে আযাব দেবেন বলেছেন। অথচ আমরা দেখেছি যে, জিহাদ সকলের উপর ফরয নয়। বুঝা গেল, এ আয়াত বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন শত্রু আগ্রাসন চালায় এবং সকলে জিহাদে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এছাড়াও আরো বিভিন্ন আয়াত রয়েছে।

**হাদিস থেকে এর দলীল**- উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ। কাফেররা মদীনায় আগ্রাসন চালালে তা প্রতিহত করা ফরয ছিল। এ জন্যই যেসব মুনাফিক বাহানা তুলে সরে পড়তে চেয়েছিল, আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল তাদের সমালোচনা করেছেন।

**আকলী-যুক্তিগত দলীল:** এ সময় যেহেতু সকলে শরীক হওয়া ছাড়া প্রতিরোধ সম্ভব নয়, তাই সকলেকে শরীক হতে হবে। অন্যান্য ফরযের তুলনায় এ ফরয তখন অগ্রগামি। কেননা, অন্যান্য ফরয পরেও আদায় করা যাবে। কিন্তু এ মূহুর্তে প্রতিরোধ ছেড়ে দিলে মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া উভয়ই বরবাদ হবে। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আ'লাম।

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩৫৮

# কাফেররা যদি মুসলমান হয়ে যেতে চায়, তাহলে কি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা যাবে? দলিলসহ জানালে উপকৃত হবো ইনশাআল্লাহ?

[Ahkamus Siyar](#)

Junior Member

১০-১৯-২০১৯

প্রশ্ন- কাফেররা যদি মুসলমান হয়ে যেতে চায়, তাহলে কি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা যাবে? দলিলসহ জানালে উপকৃত হবো ইনশাআল্লাহ?

**উত্তর:**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কাফেররা মুসলমান হয়ে যেতে চাইলে তাদের সাথে কিতাল করা করা যাবে না। বরং জিহাদের উদ্দেশ্যই তো হলো ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে এর সুশীতল ছায়াতলে আনয়ন। যদি তারা দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যেতে চায় তাহলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে; আর লড়াই করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ

“যদি তারা তাওবা করে – মুসলমান হয়ে যায় – এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”- তাওবা ৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

**أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة**

“আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই স্বাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই, মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে।"- সহীহ বুখারী ২৫

অন্য হাদিসে এসেছে,

**عن سليمان بن بريدة عن ابيه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا امّر اميرا على جيش أو سرية ... قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فان هم ابوا فسلهم الجزية، فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم .**

"হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা - বুরাইদা রাদি. - থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন জাইশ-বড় বাহিনী বা সারিয়্যা-ছোট দলের আমীর নিযুক্ত করতেন ... তখন তাকে বলে দিতেন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামে ঐসব লোকের বিরুদ্ধে কিতাল করবে, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে। ... যখন তুমি তোমার দুশমন মুশরিকদের মুকাবেলায় যাবে, তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের আহ্বান জানাবে; এর যে কোন একটায় তারা সম্মত হলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করবে:

(প্রথমত) তাদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। যদি তারা এতে অসম্মতি জানায় তাহলে জিযিয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। যদি তারা এতেও অসম্মতি জানায়, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।"- সহীহ মুসলিম ১৭৩১

বুরহানুদ্দিন মারগিনানি রহ. (৫৯৩ হি.) বলেন-

**وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام ... فإن أجابوا كفوا عن قتالهم.اهـ**

"মুসলমানরা দারুল হারবে প্রবেশ করে যখন কোন শহর বা দূর্গ ঘেরাও করবে তখন তারা সে শহর বা দূর্গে অবস্থানকারী কাফেরদের ইসলাম গ্রহণের আহবান করবে। যদি তারা আহবানে সাড়া দেয় তাহলে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে।" –হিদায়া ২/৩৭৯

কাসানি রহ. (৫৮৭ হি.) বলেন-

**ثم إذا دعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا كفوا عنهم القتال.اهـ**

"মুজাহিদগণ কাফেরদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে নেয় তাহলে লড়াই হতে বিরত থাকবেন।"–বাদায়িউস সানায়ে ৭/১০০

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৪৭৩

# ইসলাম ও কুফুরির যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সহায়তার বিধান নিয়ে ইবনে তাইমিয়ার ওপর আরোপিত অপবাদের দালিলিক খণ্ডন

**salman rumi**

Senior Member

১০-২৪-২০১৯

https://www.facebook.com/groups/২৭২০...৪২৪১২৮৮৪০৯৮৫৪/

*[লেখাটি এক ভাই পাঠিয়েছেন। উনি পাবলিশ করার জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই মূল লেখার এতো পরে এটি পাঠকের মুখ দেখছে আল্লাহর রহমতে। আর না হয় লেখাটি অনেক আগের তৈরি]*

*[যারা আগে পড়েন নি, তারা উপরের লিংকে ঢুকে ভেতরের লেখাটা পড়ে নিলে নীচেরটুকু বোঝা যাবে।]*

**ইসলাম ও কুফুরির যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সহায়তার বিধান নিয়ে ইবনে তাইমিয়ার ওপর আরোপিত অপবাদের দালিলিক খণ্ডন**

হামদ ও সালাতের পর..... ১০ পর্বে রচিত ওস্তাদতুল্য বড় ভাইয়ের "তাওয়াল্লিল কুফফার" (কুফুরি শক্তিকে সহায়তার বিধান) বিষয়ক লেখাটার আঁচ পাঠক মাত্রই অনুভব করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি 'র ফতোয়া সংক্রান্ত পর্বটি পড়ার আগ পর্যন্ত চিন্তা একভাবে কাজ করছিল। হঠাৎ যখন শাইখের বক্তব্য দিয়ে তিনি (নিজ ধারণায়) প্রমাণ করে ফেললেন যে, সহায়তার বিধান সাধারণভাবে ঈমান ভেঙে যাওয়া নয়, তখন আমার মতো অনেককেই হয়তো বড় রকমের ধাক্কা সামাল দিতে হয়েছে। সত্যি! ভাইয়ের মেধার তারিফ না করলেই নয়!!

এই লেখায় আল্লাহর তৌফিক হলে আমরা সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করবো, বড় ভাই যেটা চাচ্ছেন, শাইখুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি'র ফতোয়া থেকে কখনোই সেটা প্রমাণিত হয়না।

ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া সংক্রান্ত পর্বে শুরুতে বড় ভাই অন্য এক ভাইয়ের পোস্ট উল্লেখ করেছেন। বড় ভাইয়ের নিজস্ব প্রথম বক্তব্যে তিনি বলছেন —ইবনে তাইমিয়ার কোন বক্তব্যই নাকি তাওয়াল্লিল কুফফার ঈমান ভঙ্গকারী হওয়ার পক্ষে দ্ব্যর্থহীন নয়। এই বক্তব্য প্রমাণিত করার জন্য তিনি যেটা করেছেন— রিদ্দা'র পক্ষে ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়ার অপব্যাখ্যা করেছেন। কেমন করে? আসুন! সেটাই আমরা দেখি—

★ আমরা সবাই জানি, এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়াগুলোর অন্যতম হচ্ছে—

**فمن قفز عنهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار ; فإن التتار فيهم المكره وغير المكره وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة . منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة ; بخلاف الكافر الأصلي . ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال**

বড় ভাই এটা মানতে রাজি নন। তাঁর দাবি, শাইখের পরবর্তী এ এবারত, (প্রয়োজন না থাকার কারণে যা সাধারণত উল্লেখ করা হয় না) পূর্বের ইবারতে হাকিকী রিদ্দা'র সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছে। এখানে আমরা তাকে বলব, বাস্তবতা হলো, রিদ্দার পক্ষে শায়েখের ফতোয়া অবশ্যই দ্ব্যর্থহীন। বরঞ্চ যে এবারত উল্লেখ না করার কারণে আপনি ইলমি খেয়ানতের কথা বলেছেন —আপনার সেই পরবর্তী এবারতই দ্ব্যর্থবোধক। পরবর্তী এই এবারত কখনই দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে না "তাওয়াল্লিল কুফফার" হাকিকি রিদ্দা নয়। আর আপনি যেটা বলেছেন — উসূলে দ্বীন সম্পর্কে সামান্য ধারণা আছে, এমন যে কেউ রিদ্দার এই তাকসিম (প্রকারভেদ) সম্পর্কে অবগত— এটা আপনার অন্তঃসারশূন্য দাবী মাত্র।এত গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্টে নিজস্ব এজতেহাদ ছাড়া আর একটাও দলিল আনেননি। কৌশলে কথার মারপ্যাঁচে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন। আচ্ছা আপনারাই বলুন তো ছোট কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিকে কি কাফের বলা যাবে?এই যুক্তি দেখিয়ে যে, সে ছোট কাফের? এমন কোন পরিভাষা কি উলামায়ে ইসলাম থেকে পাওয়া যায়?? কাফের বললেই বোঝা যাবে, বড় কুফরীতে লিপ্ত

ব্যক্তি। এখন তার সেই কুফুরি বিভিন্ন পর্যায়ের হতে পারে। আবু জাহেল এবং আবু তালেবের কুফুরি নিশ্চয়ই এক পর্যায়ের না। একইভাবে উপরোক্ত বক্তব্য শাইখুল ইসলাম কিন্তু মুরতাদ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার অর্থ হল হাকিকী রিদ্দায় লিপ্ত ব্যক্তি।

এখানে একটু বলি, শায়েখের পরবর্তী ওই এবারতকে দুরভিসন্ধি নিয়ে দেখলে তাতে **تقسيم الردة** এর একটা ইহতেমাল (সম্ভাবনা) আছে, সেটা মানতেই হবে। কিন্তু এখান থেকে বড় ভাই রিদ্দা'র প্রকার বের করে নিজের মতামত বসাবেন, শাইখুল ইসলাম এমনটি জানলে হয়তো এবারত অন্যভাবে আনতেন। পাঠক গভীরভাবে আমার বক্তব্যের দলিলগুলো লক্ষ করুন: এখানে **ردة عن اصل الدين** কথাটা **بيان الحال** (অবস্থার বিবরণ) , **قيد المقال** (প্রকার বিভাজন) নয়। আমার এই বক্তব্যকে সমর্থন করবে শাইখের বিভিন্ন ইবারত। সেসব জায়গায় তিনি স্পষ্ট কুফুরকে তা'বির করেছেন **عدم التزام شرائع الاسلام** দ্বারা।

উদাহরণস্বরূপ:

★তাতারীদের কালিমা উচ্চারণকে ব্যক্ত করেছেন **مجرد الاعتصام بالاسلام** দ্বারা (মাজমুউল ফাতাওয়া- ২৮/৫০২)এবং মানবরচিত সংবিধানের অনুসরণকে ব্যক্ত করেছেন "হাত্তা ইয়ালতাযিমু শারাই'আহু" দ্বারা (২৮ /৫০৫—মাজমুউল ফাতাওয়া)

★ নুসাইরিদের একটি গ্রুপ, যারা এক ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা বানিয়েছিল। এদের কেউ কেউ তাকে ইলাহ মনে করত, কেউ কেউ নবী, কেউ কেউ তাকে সেজদা করার কথা বলতো, তাদের সম্পর্কে শায়েখকে জিজ্ঞেস করা হলে ইসলামের অন্যান্য রীতিনীতি মেনে নেয়ার পাশাপাশি এসমস্ত কুফুরি কর্মকাণ্ডে জড়ানোকে তিনি ব্যক্ত করেছেন **حتى يلتزموا شرائع الاسلام** দ্বারা (২৮ /৫৫৩—মাজমুউল ফাতাওয়া) বলেননি- **حتى يلتزموا اصل الدين**

★বড় ভাইয়ের অনুকরণে বিশেষ পন্থায় একটা দলিলঃ তিনি বলেছেন, তার বক্তব্যের পক্ষে দলিল খোদ ইবারত। সেরকম করে আমরাও বলতে পারি,

রিদ্দাহ'র মাঝে হুকুমগত কোন পার্থক্য যে নেই, সেটি বোঝার জন্য শায়েখের কিতাব থেকে খুব বেশি নয়, ২৮ নাম্বার খণ্ডের ৫০০ থেকে ৫৫৫ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটু দৃষ্টি বুলালেই ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে। সাথে সাথে শাইখের দ্বিমুখী তা'বিরের রহস্যেরও কিনারা হয়ে যাবে। শাইখের কিতাব পড়ে আমরা দেখতে পাই, ইসলামের তকমাধারী, সে যত বড় কুফুরই করুক না কেন, শায়খের ইবারতে সে **مرتد عن بعض شرائع الاسلام** পক্ষান্তরে, কেউ যদি সরাসরি ইসলামের নামকে ত্যাগ করে বসে, তবে সে **مرتد عن اصل الدين** আর ইতিহাসে এমন মুরতাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

# এবার আসি ভাইয়ের আরেকটা দলিল খণ্ডনে। ৫৩০ নং পৃষ্ঠার শেষে সাধারণত উল্লেখ করা হয় না এমন একটি ইবারত —

**وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام.**

এই ইবারত দ্বারাও ভাই তার পূর্বের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চান। অথচ তা সম্ভব না। কারণ, আমি যদি বলি—

**في ابي طالب عم النبي ﷺ من الكفر بقدر ما كفر من عدم التلفظ بكلمة الاسلام وفي ابي جهل من الكفر بقدر ما كفر من عداوة النبي وغير ذلك**

তবে আমার ইবারত ভুল হবে না আশা করি। কিন্তু এই এবারত দিয়ে নিশ্চয়ই কেউ প্রমাণ করার চেষ্টা করবে না যে, আবু তালিব জান্নাতি!!

এত নাটকীয়তা করে আমি এটাই বোঝাতে চাচ্ছি,শাইখুল ইসলাম রিদ্দা'র পরিমাণের কথা বলেছেন, তার অর্থ এই নয় যে, মূল রিদ্দা'র অনুপস্থিতি ঘোষণা করেছেন। একটা **احتمال** কে কেন **صراحت** মনে করা হয় আমাদের বুঝে আসেনা।
আল্লাহ তায়ালার বাণী :

**ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ..الآية//**

আর ৫৩৪ নং পৃষ্ঠার শেষে এবং ৫৩৫ নং পৃষ্ঠার শুরুতে শায়খ যেসব বলেছেন, সেটা হচ্ছে কুফুরের বিভিন্ন স্তর এর মান নির্ণয়। এর বেশি কিছু নয়।

কেউ যদি ভেবে থাকে, বড় ভাইয়ের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করার জন্য আমি উপরের এ কয়েকটা দলিল ছাড়া আর কিছুই পাইনি, তবে ভুল করা হবে। বরং শায়েখের উপর্যুপরি বক্তব্য বড় ভাইয়ের মতের বিপক্ষে যাবে। পারলে ২৮ নং খন্ডের এ-সংক্রান্ত পুরো আলোচনাটাই অনুবাদ করে দেই! কিন্তু সংক্ষিপ্ত এ পরিসরে সে কি আর সম্ভব?!

ভাইয়ের একটা দলিল ছিল ৫৩৫ নং পৃষ্ঠার শেষ দিককার ইবারত—

**فإنه لا ينضم إليهم طوعا من المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر. ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه يبعث على نيته. مجموع الفتاوى ٢٨/٥٣٥**

তিনি বলতে চান, শাইখ এখানে ফাসেক বলে বোঝাচ্ছেন তাদের মূল ঈমান নষ্ট হবে না। হায়রে দলিল! কোথায় শাইখ বুঝিয়েছেন কাফের সহযোগিতার পূর্বাবস্থা আর সেটাকে তিনি ধরে নিয়েছেন সহায়তার হুকুম হিসেবে। এসব পণ্ডিতি নয়, যখন কেউ আবু হানিফা-ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)দের পদাঙ্ক অনুসারী সত্যনিষ্ঠ কারাবন্দী আলেমদের কথা শুনে সত্যের পথে মানুষকে ডাকতে চায়, তখন তা হয়ে যায় আকাবিরের বুঝ বাদ দিয়ে নস নিয়ে পণ্ডিতি!!

এখানে শাইখুল ইসলাম সাধারণত কারা কারা তাতারীদের দিকে ঝুঁকেছে, তাদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তারা হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনে যারা জিন্দিক, মুনাফিক, কিংবা পাপাচারী মুসলমান; যারা রাফেজী বাতেনী ও জাহমিয়াসহ বিভিন্ন ভ্রান্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বেদাতি। সহায়তার পর তাদের কি হুকুম? সে সম্পর্কে শায়েখের এবারতে কিছু বলা নেই। সামান্য সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই বলে এই নিয়ে এত আস্ফালন! আমরা জানি না কাদের স্বার্থে এসব হচ্ছে?! আমার উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ মিলবে শাইখের ৫৫২নং পৃষ্ঠার এবারতে। এখানেও তিনি সহায়তাকারীদের অবস্থাটাই কেবল বর্ণনা করছেন, তবে হ্যাঁ যে সমস্ত এলেমের দাবিদার লোকেরা সেসময় তাতারীদেরকে সহায়তা করেছিল, শুধু তাদের ব্যাপারে অস্পষ্টভাবে এতোটুকু হুকুম লাগিয়েছেন যে, তারা পূর্বোক্ত শ্রেণীগুলোর চাইতেও নিকৃষ্ট। এর বেশি কিছু না।

ভাই এর সর্বশেষ দলিল ছিল: রাফেযীদের ব্যাপকহারে তাতারি ও কাফের-সহায়তা সত্ত্বেও শাইখুল ইসলাম তাদের তাকফীর করেননি। এটাও নেহায়েত ঠুনকো যুক্তি।

কারণ শায়খের এভাবে তাকফির না করাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে, যা এখানে আলোচ্য নয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন, শেখ আবু মোহাম্মদ মাকদিসী হাফিজাহুল্লাহ। শাইখ আব্দুল কাদের আব্দুল আজিজ রচিত **الجامع في طلب العلم الشريف** এর দ্বিতীয় খণ্ডের টিকা সংকলনগ্রন্থ **النكت اللوامع في ملحوظات الجامع** -তে শাইখ মাকদিসির এসংক্রান্ত পুরো আলোচনা আমি কপি করে দিচ্ছি—

**)ص470) قال المصنف: (ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير الر افضة على التعيين) أهـ.**

**إن أراد عموم الشيعة وأن أحداً لم يكفّر جميعهم على التعيين، فصواب، إذ ليس كل شيعي ممن يتسمون اليوم بالشيعة، وحتى من يتسمى بالجعفرية أو الاثنيْ عشرية والإمامية، ليس جميعهم - خصوصاً عوامهم - يحملون عقيدة الرفض الكفرية، و إنما يحملها غلاتهم الذين اتفق الأئمة على تكفيرهم، فنحن لا نكفّر بالاسم والمذهب لمن كان ينتسب إلى القبلة، بل بحقيقة ما يعتقده أو يفعله أو يقوله من مكفرات نصَّ الشارع عليها.**

**والر افضة أصلاً لا يتسمّون بهذا الاسم، و إنما سمي أهل السنة بذلك من انتحل تلك العقائد الكفرية، فلا شك عندنا أنه كافر بعينه، إذ فيها ما لا يعذر الجاهل فيه مما هو صريح في الكفر، لا مساغ فيه للتأويل؛ كالقول بتحريف القرآن، ومصحف فاطمة الذي يزعمون أنه ثلاثة أضعاف مصحفنا، ما فيه من مصحفنا حرف، ورِدّة جميع الصحابة، إلا نفر يسير عندهم، وعِلْمُ أئمتهم للغيب، وتفضيلهم على الرسل والملائكة، وعقيدة الرجعة، والبداءة، وغير ذلك مما هو مناقض لصريح القرآن، مثبت في أوثق الكتب عندهم كالكافي للكليني وأمثاله.**

এখানে যে বড় ভাই কতটা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছেন, তার ব্যাপারে সেটা কল্পনাও করা যায় না!! তিনি মাজমুউল ফাতাওয়া'র বিভিন্ন খণ্ড থেকে শাইখুল ইসলামের বক্তব্য কেটে কেটে এনে নিজ মতামত দাঁড় করাতে চেয়েছেন। লক্ষ করে দেখুন, তিনি ২৮ নং খণ্ড থেকে ৩ নং খণ্ডে গিয়েছেন।সেখান থেকে ১৮ এবং ২২ নং খণ্ডে যাত্রা করেছেন। অথচ একেক খণ্ডে শাইখুল ইসলাম শিয়াদের একেকরকম দোষ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বড় ভাই শিয়াদের লঘু অন্যায়ের হুকুম একখণ্ড থেকে টেনে এনে অন্য খণ্ডে বর্ণিত গুরুতর অন্যায়ের হুকুম হিসাবে সেটাকে চালিয়ে দিয়েছেন। এত বড় খেয়ানত তার থেকে আমরা আশা করিনি। আর উনার **وجه الاستدلال** মেনে নিলে বলতে হবে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লজ্জাস্থান কাফের (!) আয়েশার সঙ্গে সহবাসের কারণে কিছুকাল জাহান্নামে জ্বলবে" (নাউজুবিল্লাহ! নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক!!)'র মত জঘন্য আরও বহু কথা ও আকিদা কুফরি নয়।( মাজমুউল ফাতাওয়া- ২৮/ ৪৮১) এ পর্যায়ে শায়খের একটা এবারতের কথা এখানে বলবো, (মাজমুউল ফাতাওয়া- ২৮ /৫১৮) খুলুন। পৃষ্ঠার শেষ দিকে শায়েখ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন :

**فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدّين عن أصل الإسلام ،وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره،ليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين،بل هم نوع ثالث،وهذا أصحّ الأقوال الثلاثة فيهم،**

এ এবারত পড়ে আমি থমকে গিয়েছিলাম। কারণ বাহ্যত মনে হবে এই এবারত **مرتد عن بعض الشرائع** এবং **مرتد عن أصل الدين** এর মাঝে সর্বদিক থেকে পার্থক্য নির্দেশ করছে— যেমনটি বড় ভাইয়ের দাবি। কিন্তু যখন আবিষ্কার করলাম এই এবারতে সবচাইতে সুস্পষ্টভাবে বড় ভাইয়ের বিভ্রান্তির জবাব দেয়া হয়েছে,তখন হতবাক হয়ে যাই। লক্ষ্য করুন, ৫১৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বক্তব্যের কিছু আগে শাইখের বক্তব্যে আমরা দেখতে পাই যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে যাকাতের অপব্যাখ্যাকারী এবং খারেজীদেরকে তাকফির করার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। তো এই মতভেদটাকে যদি তাদের সঙ্গে যুদ্ধের নীতির ক্ষেত্রে মতভেদ না ধরা হয়, তাহলে বলতে হবে যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের অস্বীকার এবং খারিজীদের এই আকিদা— নবীজী সাঃ এর ইন্তেকালের পর গুটি কয়েক সাহাবা ছাড়া বাকি সবাই মুরতাদ হয়ে গেছে;

এজাতীয় আকিদা সাধারণভাবে ঈমান ভঙ্গের কারণ নয়। (খারেজী সম্প্রদায় এবং সিদ্দিকে আজমের যুগে যাকাত অস্বীকারকারীদের কর্মকাণ্ড সাধারণভাবে কুফুরী— তার প্রমাণ পেতে খুলুন আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহমতুল্লাহি আলাইহি রচিত "ইকফারুল মুলহীদীন" -'র ২৪-৩১,৯১-৯৩,১০১ এ পৃষ্ঠাগুলো।) অতএব বুঝা গেল ইবনে তাইমিয়ার ৫১৮ নং পৃষ্ঠা সহ আরো যেসব জায়গায় তিনি রিদ্দাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন,সেসব জায়গার বক্তব্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আচরণের প্রশ্নে। হুকুম গত কোন পার্থক্য তিনি নির্দেশ করেননি।আর আমরা তো দেখতেই পেলাম যে, যুদ্ধক্ষেত্রের ওই সমস্ত মাসালা ওলামায়ে ইসলামের মাঝে বিরোধপূর্ণ। দেখুন মাজমুউল— ফাতাওয়া -২৮ /৫৫৮। নয়তো তিনি **تولي الكفار** কে যে বাকি সব ক্ষেত্রে মুত্বলাক্ব মুরতাদ মনে করতেন, তা দেখার জন্য খুলুন —মাজমুউল ফাতাওয়া- ২৮ /৫৩১(মানে'ঈনে যাকাত প্রসঙ্গে বক্তব্য) এছাড়াও শাইখুল ইসলামের **اقتضاء الصراط المستقيم** (১/২২১) এবং মাজমু আল ফাতাওয়া অপর এক খণ্ডে (৭/১৭) **تولّي الكفار** ঈমান ভঙ্গকারী হওয়ার পক্ষে বক্তব্য আছে। এসবের মধ্যে যে সমস্ত এবারতে **قلب** এর উল্লেখ আছে সেটা কখনো মুরজিয়া ভাবধারার পক্ষে দলিল হতে পারে না এর উল্লেখ নিতান্তই **اتفاقي.**

আলোচনার শেষে আমরা খোলাসা এই বলতে পারি, শাইখের ফতোয়া থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কাফেরদের সহায়তা সাধারণভাবেই ঈমান ভঙ্গকারী এবং এ পাপে লিপ্ত ব্যক্তি প্রকৃত মুরতাদ। যদিও দুনিয়াবী হুকুমের বেলায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পটবিশেষে অপরাধ ভেদে সুনির্দিষ্ট করে হুকুম প্রয়োগে তাদের সঙ্গে নমনীয়তার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। এ কারণেই খারিজীদেরকে শাইখুল ইসলাম তৃতীয় প্রকারে ফেলেছেন।

রয়ে গেল ভাইয়ের অন্যান্য পর্ব নিয়ে আলোচনা। সেগুলো নিয়ে সময়-সুযোগমতো পরবর্তীতে আলোচনা করা যাবে ইনশাআল্লাহ! এখন শুধু এতোটুকু বলে রাখি, কাফের সহায়তার হুকুম রিদ্দায়ে হাকীকী হওয়ার পক্ষে এত এত দলিল প্রমাণ রয়েছে যে, তার সামনে বড় ভাইয়ের অপ্রতুল কিছু উদ্ধৃতি কেমন যেন এক আকাশ স্বচ্ছতার মাঝে এক চিলতে কুয়াশা। বিশেষত শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য এ প্রসঙ্গে তো আছেই— যেমনটি পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ্ বুঝ দান করুন!

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫১৮

# মুছলা কাকে বলে? মুছলা হারাম হওয়ার দলীল কি এবং তা কখন হারাম?

Ahkamus Siyar

Junior Member

১০-২৪-২০১৯

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মুছলা অর্থ অঙ্গহানি করা। নাক, কান বা অন্য কোন অঙ্গ কেটে ফেলা। **হাফেজ ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. (৮৫২ হি.) বলেন-**

**المثلة بضم الميم وسكون المثلثة، وهو قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها .اهـ**

"মুছলা ... অর্থ নাক, কান বা অন্য কোন অঙ্গ কেটে ফেলা।" -ফাতহুল বারী ৬/২৩

আমাদের আলোচনায় মুছলা দ্বারা উদ্দেশ্য- কোন কাফেরকে বন্দী করার পর সরাসরি হত্যা না করে অঙ্গহানি করে হত্যা করা, কিংবা হত্যার পর অঙ্গহানি করা। অনেক হাদিসে এর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন, **এক হাদীসে এসেছে-**

**عن عدي بن ثابت، قال: سمعت عبد الله بن يزيد، عن النبي ﷺ: أنه نهى عن النهبة والمثلة.**

"আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনিমতের সম্পদ বন্টন করা ব্যতীত কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যেতে ও মুছলা করতে নিষেধ করেছেন।"– সহিহ বুখারী ৫৫১৬

**সামুরা ইবনু জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,**

**كان نبي الله ﷺ يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة.**

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাদাকা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন আর মুছলা করতে নিষেধ করতেন"। – সুনানে আবু দাউদ ২৬৬৭

**আল্লামা শাওকানী রহ. (১২৫০ হি.) বলেন-**

**قوله: (ولا تمثلوا) فيه دليل على تحريم المثلة، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة.**

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী- 'তোমরা মুছলা করো না' এটি মুছলা হারাম হওয়ার দলীল। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস এসেছে।" -নায়লুল আওতার ৭/২৯৩

তবে মুছলা হারাম হওয়ার এ মাসয়ালাটি সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শত্রু মুসলমানদের হাতে বন্দী হওয়ার পর তাকে হত্যা করার ক্ষেত্রে মুছলা করা অবৈধ। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন হত্যা করার ক্ষেত্রে মুছলা করতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, এক্ষেত্রে তাকে হত্যা করাটাই মূল। কীভাবে হত্যা করা হচ্ছে সেটা বিবেচ্য নয়।

**ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন-**

**ثم لا يخفى أن هذا بعد الظفر والنصر، أما قبل ذلك فلا بأس به إذا وقع قتالا كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقأ عينه فلم ينته فضرب فقطع أنفه ويده ونحو ذلك. اهـ**

"স্পষ্ট যে, মুছলার নিষিদ্ধতা কাফেরদের উপর বিজয়ী হওয়া এবং তাদেরকে বন্দী করার পর। এর পূর্বে যুদ্ধ চলাকালীন মুছলা করতে কোন সমস্যা নেই। যেমন, দু'জনের যুদ্ধ চলাকালীন মুজাহিদ তার প্রতিপক্ষকে হামলা করে তার কান কেটে ফেলল বা তার চোখ নষ্ট করে দিল। প্রতিপক্ষ এরপরও বিরত হলো না। ফলে তার নাক ও হাত বা অন্য কোন অঙ্গ কেটে ফেলল।" -ফাতহুল কাদির ৫/৪৫২

**আরো দেখুন- ১. রদ্দুল মুহতার ৪/১৩১; ২. আলইখতিয়ার ৪/১২০ ও দুরারুল হুক্কাম শরহু গুরারিল আহকাম ১/২৮৩।**

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫১৯

# সংশয়ঃ মুফতি তাকি উসমানির দারুল হারব-দারুল ইসলাম সংক্রান্ত সংশয় নিরসন

abu ahmad

Senior Member

১০-২৮-২০১৯

*অনেকদিন আগে কোন এক ভাই নিচের লেখাটি চেয়ে পোষ্ট দিয়েছিলেন। সে সময় লেখাটি পাইনি। আজ পেয়ে পোষ্ট দিলাম।*

## সংশয়ঃ মুফতি তাকি উসমানির দারুল হারব-দারুল ইসলাম সংক্রান্ত সংশয়

### মুফতি আব্দুল ওয়াহহাব (দা. বা.)

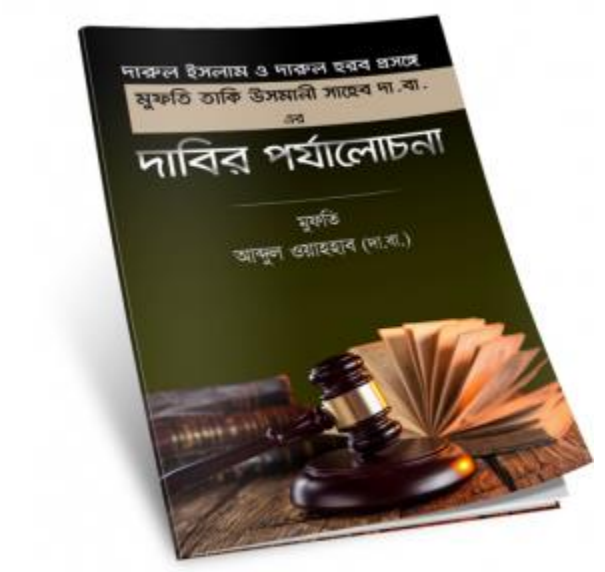


ডাউনলোড লিংক

PDF https://archive.org/download/taqiusm...i%২০usmani.pdf
https://mega.nz/#!l০৫kVK৬I!৩mlNtDYw৪...OUNkO৭JuBvw
MWk
https://www.mediafire.com/file/২k৮২v...smani.pdf/file

WORD
https://archive.org/download/taqiusm...%২০usmani.docx
https://mega.nz/#!৮tg২iSTD!ujnyuuhTo...mF৫GEizSzcwUBk
https://www.mediafire.com/file/swiz৩...mani.docx/file

দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের মাসআলা ইসলামী শরীয়তের একটি বুনিয়াদি মাসআলা যার উপর আরো অসংখ্য মাসআলার ভিত্তি। 'ফিকহ' তথা ইসলামী আইন শাস্ত্রের সকল কিতাবেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর আলোচনা রয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করে অসংখ্য অগণিত মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

মুফতী শফী রহ. বলেন:

**جو لوگ فقه اور فتاوی سے مناسبت رکھتے هیں ان پر یه بات مخفي نہیں که تقریبا فقه کے تمام ابواب نماز، روزه، نکاح ، طلاق اور بالخصوص بیع وشراء، اجاره و دیگر معملات میں سیکڑو مسائل شرعیه دار الاسلام کے لیئے کچ هے اور دار الحرب کے لیئے دوسرا- اس لیئے اگر یوں کہا جائے که احکام شرعیه کا ایك بہت بڑا حصه اس پر موقوف هے که ان پر عمل کرنے والے جس ملك میں آباد هے پہلے اسکا دار الاسلام یا دار الحرب هونا متعین کریں تو بالکل صحیح و دورست هے-**

"যারা ফিকহ ও ফতোয়ার সাথে সম্পর্ক রাখেন তাদের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত, বিবাহ-তালাক, বিশেষত: ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারা এবং অন্যান্য মুআমালা সহ ফিকহের প্রায় সকল অধ্যায়ের অসংখ্য শরয়ী মাসআলা দারুল ইসলামে এক রকম, দারুল হরবে অন্য রকম।

এ কারণে যদি বলা হয়, "শরীয়তের আহকামের একটা বিশাল বড় অংশ এমন রয়েছে যেগুলোর উপর আমল করার জন্য প্রথমে বসবাসরত রাষ্ট্র কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব তা নির্ণয় করে নেয়া পূর্বশর্ত" যদি এমন বলা হয় তাহলে তা সম্পূর্ণ সঠিক।"[জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৫/২০৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খেলাফতের পতনের পর নতুন করে এ মাসআলার আলোচনার প্রয়োজন পড়ে। কারণ কাফেররা বিশাল খেলাফতকে ভেঙে টুকরা টুকরা করে একেক অংশে নামধারী একেক মুসলমানকে শাসন ক্ষমতায় বসায়। তারা আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকে। আর যারা আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে আইম্মায়ে কেরামের ইজমা-ঐক্যমতে তারা মুরতাদ। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের পর্যাপ্ত ফতোয়াও এ ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে।

তদ্রুপ আইম্মায়ে কেরাম এ ব্যাপারেও একমত যে, ইসলামী শাসনাধীন কোন রাষ্ট্র কাফের বা মুরতাদরা দখল করে নিয়ে তাতে ইসলামী শাসন রহিত করে কুফরী তথা শরীয়ত বিরোধী শাসন চালু করে দিলে এবং মুসলমানরা তাদের থেকে তা উদ্ধার করে ইসলামী শাসন জারি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে উক্ত রাষ্ট্র আর 'দারুল ইসলাম' তথা ইসলামী রাষ্ট্র থাকে না, বরং 'দারুল কুফর' তথা কুফরী রাষ্ট্র হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে কোন দ্বিমত নেই।

এ হিসেবে বর্তমানে শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দ্বারা শাসিত গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দারুল হরব। নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের অনেক লেখা এবং ফতোয়া এ ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বর্তমান উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এ উভয়টি বিষয়েই ভিন্নমত পোষণ করেন।

প্রথমতঃ তিনি কুফরী আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মুসলিম নামধারী মুরতাদ শাসকদেরকে মুরতাদ মানেন না।

দ্বিতীয়তঃ এদের ক্ষমতাধীন কুফরী আইন দ্বারা শাসিত গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে দারুল হরব মানেন না। বরং তিনি এ সবগুলো রাষ্ট্রকে 'দারুল ইসলাম' তথা 'ইসলামী রাষ্ট্র' মনে করেন।

তাঁর এই দুই দাবির কারণে উপমহাদেশে (বিশেষত বাংলাদেশে যেখানে ওলামায়ে কেরামর বিশাল অংশ তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর মতো ব্যক্তিদের অনুসরণ করে থাকেন) কী পরিমাণ বিভ্রান্তি যে ছড়াচ্ছে তা অস্পষ্ট নয়।

আপনি আজ ওলামায়ে কেরামের কাছে এই দুই মাসআলা আলোচনা করতে গেলে তাদের অনেকে শুধু এ কথাটাই বলবেন- তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. তো এর বিপরীত বলেন! এমতাবস্থায় তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর উক্ত দাবিদ্বয়ের দলীলভিত্তিক পর্যালোচনা করে তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা নির্ধারণ করা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই এ ব্যাপারে কলম ধরা। তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তার যোগ্যও নই। আর এত কোন ফায়েদাও নেই। তবে –

**لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة**

**[**দ্রুতগামী অশ্ব কখনো মুখ থুবরে পড়ে এবং ধারালো চাপাতি কখনো ভোঁতা হয়ে যায়।**]**

অতএব, বড়দের ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। আর ভুলকে ভুল হিসেবে ধরিয়ে দিয়ে উম্মাহকে তা থেকে রক্ষার পথ বাতলে দেয়াই প্রকৃত খায়ের খাহী। কিংবা অন্তত যদি আমার বুঝে না আসে তাহলে একজন তালিবে ইলম হিসেবে দাবির পক্ষে দলীলের আবেদন করার অধিকার নিশ্চয়ই আমার রয়েছে।

তবে আমি এ পুস্তিকাতে শাসকগোষ্ঠীর মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না। তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম দাবি করতে গিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের যেসব বক্তব্যকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন সেগুলো পর্যালোচনা করাই এ পুস্তিকার মূল উদ্দেশ্য।

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. তাঁর "ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত" নামক কিতাবে এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলে দাবি করেছেন। তার এ দাবির পক্ষে তিনি হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট তিন জন ইমামের তিনটি উদ্ধৃতি এনেছেন।

১ম জনঃ শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০ হি.)। যিনি 'আল-মাবসূত' এবং 'শরহুস সিয়ারীল কাবীর' এর প্রণেতা।

২য় জনঃ 'জামিউর রুমুজ' এর প্রণেতা আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.)।

৩য় জনঃ 'ফাতাওয়া শামী'র প্রণেতা আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.)।

তিনি এই তিন ইমামের উদ্ধৃতিত্রয় এনে বুঝাতে চাচ্ছেন-

[বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যেগুলোতে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত কায়েম নেই, বরং সেসবের শাসকরা আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে সেগুলো সব 'দারুল ইসলাম' তথা 'ইসলামী রাষ্ট্র'। আইন কি চলছে সেটা দেখার বিষয় নয়। আইন ইসলামী হোক কুফরী হোক সর্বাবস্থায়ই সেগুলো 'দারুল ইসলাম' তথা ইসলামী রাষ্ট্র।]

এই তিন ইমামের উদ্ধৃতিত্রয় এনে তিনি একথাও বুঝাতে চাচ্ছেন-

[এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র বলা নিজস্ব মনগড়া কোন কথা নয়; বরং পূর্বসূরি ইমামগণের মতানুসারেই সেগুলো দারুল ইসলাম। তাঁদের কারো বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আর কারো বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্টই বুঝা যায়।]

অর্থাৎ প্রথম দুইজন ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০) এবং আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আর আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

অথচ বাস্তবে এই তিন ইমামের কারো বক্তব্য থেকেই এসব রাষ্ট দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া বুঝা যায় বলে মনে হচ্ছে না। ইমামগণের বক্তব্যগুলোর পর্যালোচনা এবং সেগুলোর সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র দেখার পর তাঁদের বক্তব্য অনুসারে এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলার কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর বক্তব্য এবং তার পর্যালোচনায় যাওয়ার পূর্বে বর্তমান কুফরী শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকরা মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ওলামাদের কয়েকটা ফতোয়া উল্লেখ করবো।

***

কুফরী শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে কুফরী শাসন গ্রহণ করার ফিতনা এই উম্মতের মাঝে দুইবার দেখা গেছে। প্রথমবারঃতাতারীদের যামানায়।

দ্বিতীয়বারঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খেলাফেতের পরাজয়ের পর।

তাতারীদের যামানাঃ তাতারীরা তুর্কি জাতি। তুর্কিস্তান সংলগ্ন চীনে ছিল তাদের বসবাস। দৈহিক ও সামরিক দিক থেকে তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সংখ্যায় ছিল অগণিত। তাদের পুরুষ মহিলা সকলেই যুদ্ধে পারদর্শী। প্রথমে তারা কাফের ছিল।

৬১৬ হিজরীর দিকে তারা মুসলিম বিশ্বে আক্রমণ চালায়। প্রথমে খাওয়ারিজম ও তার আশপাশের এলাকাগুলোতে হামলা চালায়। একে একে বুখারা, সমরকন্দ সহ মা ওরাউন নহর ও খোরাসানের দেশগুলো দখল করে নেয়।

৬৫৬ হিজরিতে তৎকালীন আব্বাসী খেলাফতের রাজধানী বাগদাদে প্রবেশ করে। খলীফার শীয়া উজির ইবনে আলক্বামীর প্ররোচনায় তারা খলীফাকে হত্যা করে। এরপর বাগদাদে প্রবেশ করে নজির বিহীন হত্যাযজ্ঞ চালায়।

তৎকালীন শামের অনেকাংশও তারা দখল করে নেয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে ইসলামী খেলাফতের বিশাল অংশ তারা দখল করে নেয়। তবে ইসলামী শাসনকে তারা অবলুপ্ত করেনি। মুসলমানদেরকে তারা শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করার সুযোগ দেয়।

তবে তারা নিজেরা তাদের নেতা চেঙ্গিস খানের রচিত 'ইয়াসিক' নামক সংবিধান অনুযায়ী চলত। চেঙ্গিস খান তা বিভিন্ন ধর্মের নিয়ম নীতি এবং তার নিজস্ব চিন্তা ধারার সমন্বয়ে রচনা করেছিল। তাদের পারস্পরিক বিচার কার্য এই 'ইয়াসিক' দিয়েই চলত।

৬৮০হিজরিতে তাতারীরা মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের বিরোদ্ধে যুদ্ব অব্যাহত রাখে।

মুসলমান হওয়ার পরও তারা তাদের পূর্বের সংবিধান 'ইয়াসিক' অনুযায়ীই চলতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সংবিধান আগের মতো 'ইয়াসিক'ই রয়ে যায়।

· আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাদ দিয়ে কুফরী সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করার কারণে তৎকালীন ওলামায়ে কেরাম তাদেরকে কাফের ফতোয়া দেন।

· যারা ইসলামী আদালতে বিচারের জন্য না গিয়ে তাতারীদের আদালতে বিচারের জন্য যাবে ওলামায়ে কেরাম তাদেরকেও কাফের হয়ে যাবে বলে ফতোয়া দেন।

· যারা তাতারীদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে তারাও কাফের হয়ে গেছে বলে ফতোয়া দেন।

এদের মধ্যে প্রখ্যাত মুফাসসির, তাফসীরে ইবনে কাসীরের প্রণেতা হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু-৭৭৪হি.) এর ফতোয়া এবং ইবনে কাসীর রহ. এর উস্তাদ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু-৭২৮হি.) এর ফতোয়া সর্বজন প্রসিদ্ধ।

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু-৭৭৪হি.) এর ফতোয়াঃ হাফেয ইবনে কাসীর রহ. এর এ ব্যাপারে দু'টি ফতোয়া রয়েছে।

একটি– তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা মায়েদার ৫০ নং আয়াত-

**أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون**

"তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসন ব্যবস্থা কামনা করে! বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?" এর ব্যাখ্যায়।

অপরটি – তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' তে ৬২৪ হিজরীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে যেখানে চেঙ্গিস খানের আলোচনা এসেছে সেখানে। চেঙ্গিস খান ৬২৪ হিজরিতে মারা যায়। এজন্য 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' তে তার প্রসঙ্গ ৬২৪ হিজরির আলোচনায় এসেছে।

প্রথম ফতোয়াঃ

**أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون**

“তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসন ব্যবস্থা কামনা করে! বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?” **[**সূরা মায়েদা:৫০**]**

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন:

**ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها. وفيها كثير من الاحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله – ﷺ – فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكِّم سواه في قليل ولا كثير**

“আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির নিন্দা করছেন যে আল্লাহর দৃঢ় বিধানকে ছেড়ে দেয়। অথচ তা সকল কল্যাণকে সমন্বিত করে, সকল ক্ষতিকারক বস্তুকে নিষিদ্ধ করে। আল্লাহর বিধান ছেড়ে দিয়ে সে ফিরে যায় এমন কিছু মতামত, রীতিনীতি ও প্রথার দিকে, যা প্রণয়ন করেছে মানুষেরাই। আল্লাহর শরীয়াতের সাথে যার নেই কোন সম্পর্ক।

যেমনটা করতো জাহিলী যুগের মানুষেরা। তারা তাদের চিন্তা প্রসূত মতামত থেকে প্রণীত জাহিলী ভ্রান্ত বিধান দ্বারা ফয়সালা প্রদান করতো। এবং যেমন তাতাররা তাদের ঐসব রাষ্ট্রীয় আইন কানুন দিয়ে বিচার ফয়সালা করছে, যা তারা গ্রহণ করেছে তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান থেকে। যে চেঙ্গিস খান তাদের জন্য “ইয়াসিক” নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে।

ইয়াসিক হলো ইসলামী, নাসরানি, ইহুদীসহ বিভিন্ন শরীয়তের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংবিধান। তাতে এমন অনেক বিধানও আছে, যা সে শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। অত:পর তা তার অনুসারিদের নিকট পরিণত হয়েছে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে। একে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করার উপর অগ্রাদিকার দেয়।

যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের । তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের দিকে ফিরে আসে, এবং কম হোক বেশি হোক কোন কিছুর ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছুকে বিচারকরূপে গ্রহণ না করে।

[তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ড:৩, পৃ: ১৩১]

একটি লক্ষ্যনীয় বিষয়ঃ আইন প্রণেতা এবং তার বাস্তবায়নকারী উভয়ই কাফেরঃ

ইবনে কাসীর রহ. যেসব তাতারীকে কাফের ফতোয়া দিয়েছিলেন তারা তাদের কুফরী সংবিধান ইয়াসিকের রচয়িতা ছিল না। ইয়াসিক রচনা করে ছিল তাতারীদের নেতা চেঙ্গিস খান, যে ৬২৪ হিজরিতে মারা যায়। আর ইবনে কাসীর রহ. ইন্তেকাল করেন ৭৭৪ হিজরিতে। তাঁর মাঝে এবং চেঙ্গিস খানের মাঝে দেড়শো বছরের ব্যবধান।

ইবনে কাসীর রহ. এর যামানার তাতারীরা কুফরী সংবিধান প্রণয়ন করেনি । পূর্বের সংবিধান অনুসরণ করে চলেছে মাত্র।

এ থেকে স্পষ্ট , কুফরী সংবিধানের প্রণেতারা যেমন কাফের, এর দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরাও তেমনি কাফের।

অতএব, আমাদের সমাজের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী যদি নিজেরা শরীয়ত বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন নাও করে তবুও পূর্বের কুফরী সংবিধান অনুসরণের কারণে তারা মুরতাদ।

যেমন, কুফর যারা আবিষ্কার করে আর যারা তাতে লিপ্ত হয় উভয়ই কাফের। বিদআত যারা আবিষ্কার করে আর যারা তার অনুসরণ করে উভয়ই বিদআতী। এখানে শাসকদের ক্ষেত্রেও তাই।

দ্বিতীয় ফতোয়াঃ 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' তে চেঙ্গিস খানের জীবনী আলোচনায় নমুনা স্বরুপ ইয়াসিকের কতগুলো শরীয়ত বিরোধী আইন উল্লেখ করার পর বলেন-

**وفي كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين**

"এই সবগুলোর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার বান্দা নবীগণ – আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম – এর উপর আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ শরীয়তের বিরোধিতা। যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ সুদৃঢ় শরীয়াতকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন রহিত শরীয়ত অনুযায়ী বিচারের জন্য যাবে সে কাফের হয়ে যাবে। তাহলে ঐ ব্যক্তির বিধান কী হতে পারে যে ইয়াসিক অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করে এবং তাকে শরীয়তের উপর অগ্রাধিকার দেয়? যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে মুসলমানদের ইজমা-ঐকমতে কাফের হয়ে যাবে।"[আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খন্ড:১৩, পৃষ্ঠা:১৩৯]

নির্দেশনাঃ বর্তমান সংবিধান ইয়াসিকের চেয়েও নিকৃষ্টঃ ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, তাতারদের ইয়াসিক নামক সংবিধানের চেয়ে বর্তমান সংবিধানগুলো আরো নিকৃষ্ট ও জঘন্য। কেননা ইয়াসিকের মাঝে তো অপরাধগুলোকে অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং তার শাস্তিও বিধান করা হয়েছে, যদিও তা ছিল কুরআন সুন্নাহর বিপরীত। কিন্তু আমাদের বর্তমান সংবিধানগুলো তো অপরাধগুলোকে অপরাধ বলেই আখ্যায়িত করে না বরং অনেক অপরাধকে ভাল কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করে। ইয়াসিকের অনুসারীদের বিধানই যদি এই হয় তাহলে তার চেয়ে নিকৃষ্ট সংবিধানের অনুসারীদের বিধান কী হবে?

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু-৭২৮হি.) এর ফতোয়াঃ যে সমস্ত ব্যক্তি মুসলমান ও তাতারদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধে তাতারদের পক্ষ গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে সাহায্য করেছিল – তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) নিম্নোক্ত ফতোয়া প্রদান করেন:

**وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الامراء فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام ، وإذ كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين؟؟ (الفتاوى الكبرى(**

"সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে যে কেউ তাতারদের পক্ষ নিবে, তাতারদের বিধান ও তার বিধান একই বলে গণ্য হবে। চেঙ্গিস খান ইসলামী শরীয়াত থেকে যে পরিমাণ দূরে সরে গেছে তাদের মাঝেও ঐ একই পরিমাণ ইরতিদাদ বিদ্যমান। যেখানে সালাফগণ যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারিদেরকে নামাজ, রোজা আদায় করা এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ না করা সত্ত্বেও মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাহলে ঐ ব্যক্তির বিধান কী হতে পারে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করে?" [আল-ফাতাওয়াল কুবরা, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:৩৩২]

উসমানী খেলাফেতের পরাজয়ের পর কুফরী শাসনঃ দ্বিতীয় বার মুসলিম বিশ্বে কুফরী শাসনের ফিতনা দেখা দেয় ১ম বিশ্ব যুদ্ধে উসমানী খেলাফতের পরাজয়ের পর। খেলাফতের পরাজয়ের পর কাফেররা বিশাল খেলাফতকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে একেক অংশে মুসলিম নামধারী একেক মুরতাদকে ক্ষমতায় বসায়। তারা আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকে। তখন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম শাসকদের এ কাজকে ইরতিদাদ এবং তাদেরকে মুরতাদ বলে ফতোয়া দেন। এখানে আমি তাঁদের কয়েক জনের ফতোয়া উল্লেখ করবো।

১. শাইখুল ইসলাম মোস্তফা সবারী (রহঃ) এর ফতোয়াঃ ১ম বিশ্ব যুদ্ধে উসমানী খেলাফতের পরাজয়ের পর মুরতাদ কামাল আতাতুর্ক যখন ১৯২৪ সালে উসমানী খেলাফতের রাজধানী তুরস্ক থেকে ইসলামী শাসন দূর করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করে, তখন উসমানী খেলাফতের সর্বশেষ শাইখুল ইসলাম মোস্তফা সবারী (রহঃ) উক্ত কাজকে কুফর ও রিদ্দাহ বলে ফতোয়া প্রদান করেন এবং সেখান থেকে হিজরত করে মিশরে চলে আসেন।

তিনি এর বিরুদ্ধে কলম ধরে কুফর ও ইরতিদাদের নতুন এ রূপকে শরয়ী দলিল ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের মুসলমানদের সামনে স্পষ্ট করে তুলেন। আমি এখানে তাঁর লেখা থেকে নির্বাচিত দু'টি অংশ তুলে ধরছি-

এক) তিনি এটিকে ঈমানের সাথে সংঘার্ষিক সাব্যস্ত করেন:-

**والحق أن ترويج فصل الدين عن الدولة سواء كان هذا الترويج من رجال الحكومة اوالكتاب والمفكرين في مصلحة الدولة والأمة لا يتفق مع الإيمان بأن الدين منزل من عند الله ؛ وأن أحكامه المذكورة في الكتاب والسنة أحكام الله المبلغة بواسطة رسوله ؛ وكل من أشار بمبدأ الفصل إلي المجتمع ؛ فهو إما : مستطبن للإلحاد ؛ او بليد جاهل بمعني فصل الدين عن الدولة ومغزاه-**

"সত্য কথা হচ্ছে, (দ্বীন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহতে বিদ্যমান দ্বীনের বিধানগুলো রাসূলের মাধ্যমে অবতীর্ণ আল্লাহরই বিধান) এই বিশ্বাসের সাথে "রাষ্ট্র থেকে ধর্ম পৃথকীকরণ" একত্র হতে পারে না। চাই তা প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে করা হোক, অথবা দেশ ও জাতির কল্যাণ বিষয়ের লেখক ও বুদ্ধিজীবিদের পক্ষ থেকে হোক।

যে ব্যক্তিই সমাজকে রাষ্ট্র থেকে ধর্ম পৃর্থক করার পরামর্শ দেবে হয়তো সে গোপনে গোপনে নাস্তিকতা পোষণকারী অথবা নির্বোধ এবং ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথকীকরণের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ।" **[**মাওকিফুল আকল, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:২৮০**]**

দুই) রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে শর'য়ী বিধান পৃথককারীকে তিনি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত বলে ফতোয়া দেন:

**فإذا خرج عن الإسلام من لا يقبل سلطة الدين عليه بالأمر والنهي وتدخله في أعماله حال كونه فردا من أفراد المسلمين ؛ فكيف لا يخرج من لا يقبل هذه السلطة وهذا التدخل ؛ بصفة أنه داخل في هيئة الحكومة؟**

"যেখানে কোন মুসলমান তার সাধারণ সামাজিক জীবনে যদি তার উপর দ্বীনের এই কতৃত্বকে মেনে না নেয় যে, দ্বীন তাকে আদেশ ও নিষেধ প্রদান করবে এবং

তার কার্যাবলীর মধ্যে দখল নেবে, তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়; তাহলে ঐ ব্যক্তি কিভাবে খারিজ না হবে, যে রাষ্ট্রীয় জীবনে এই কতৃত্ব এবং এই দখলদারিত্বকে মেনে না নেবে?!"[মাওকিফুল আকল খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:২৯৪]

২-৩. আহমদ শাকের রহ. ও তাঁর ভাই মাহমূদ শাকের রহ. এর ফতোয়াঃ উসমানী খেলাফতের পতনের পর মানব রচিত সংবিধান যখন মিশরের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে পরিণত হয় তখন মিশরের সবচেয়ে বড় আলেম, মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ আল্লামা আহমাদ শাকের (রহঃ) ও তার ভাই মাহমূদ শাকের (রহঃ) এই বিধান রচনাকারীদেরকে কাফের ও মুরতাদ ফতোয়া প্রদান করেন।

আহমদ শাকের রহ. এর ফতোয়াঃ আহমদ শাকের (রহঃ) গত শতাব্দীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। হাদীস শাস্ত্রে যার খিদমাত ও অবদান ভুলবার নয়। ফিক্বহে হানাফীতে তাঁর ছিল অগাধ পান্ডিত্য। তিনি জামেয়া আযহার থেকে ফিক্বহে হানাফীর উপর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সনদ লাভ করেন। ফিক্বহে হানাফী অনুযায়ী মিশরে প্রায় ২০ বছর ক্বাজী হিসেবে বিচার ফয়সালা করেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে এ সমস্ত শাসকদের কুফরির বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেন:

**إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة. ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام – كائناً من كان – في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. اهـ**

"এ সমস্ত মানব রচিত আইন যে كفر بواح তথা সুস্পষ্ট কুফর তা সূর্যের মতো স্পষ্ট। এতে কোন ধরনের অস্পষ্টতা বা প্যাঁচ নেই। মুসলমান দাবীদার কোন ব্যক্তির জন্য এ সব বিধান অনুযায়ী আমল করা, সেগুলোর আনুগত্য করা বা এগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনই সুযোগ নেই, সে যেই হোক না কেন। এ ক্ষেত্রে তার কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না।"[উমদাতুত তাফসীর, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:১৭৩-১৭৪] তিনি আরো বলেন:

**نري في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها، نقلت عن أوربة الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها**

**وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لايخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل دينه أويعاديه من حيث لايشعر، وهي في كثير من أحكامه أيضا تو افق التشريع الإسلامي، أو لا تنافيه علي الأقل وإن العمل بها في بلادالمسلمين غير جائز، حتي في ما و افق التشريع الإسلامي، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلي مو افقته للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلي مو افقته القو انين أوربة أو لمبادئها وقواعدها، وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه، فهو آثم مرتد بهذا، سواء أ وضع حكما مو افقا للإسلام أومخالفاكلمة الحق 95-96)**

"কিছু কিছু মুসলিম দেশে দেখতে পাচ্ছি পৌত্তলিক ও নাস্তিক্যবাদী ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত আইন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সেগুলো এমন আইন যা ইসলামের শাখাগত ও মৌলিক অনেক বিধানের গোড়ার সাথেই সাংঘর্ষিক। তাতে তো এমন কিছু বিধানও রয়েছে যা ইসলামকে নস্যাৎ ও ধ্বংস করে ফেলে। এ বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট। এ ব্যাপারে শুধু ঐ ব্যক্তিই দ্বিমত পোষণ করতে পারে যে নিজের সাথে প্রতারণা করছে এবং সে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। অথবা সে দ্বীনের বিরোধিতা করছে অথচ তা অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছে না। হ্যাঁ, তার অনেক বিধান ইসলামি শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। অথবা অন্তত সাংঘর্ষিক নয়।

মুসলিম দেশগুলোতে এই সংবিধান কার্যকর করা কোনভাবেই বৈধ নয়। এমনকি সে বিধানগুলোও নয়, যেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা যে বা যারা এই সংবিধান রচনা করেছে তারা লক্ষ্য করেনি যে, এটা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখছে না'কি সাংঘর্ষিক হচ্ছে। বরং তারা লক্ষ্য করেছে, তা পশ্চিমাদের সংবিধানের সাথে অথবা তার মৌলিক দিকগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কি হচ্ছে না? এবং ওটাকেই মূল ভিত্তি রূপে গ্রহণ করছে। অতএব সে এ কাজের দ্বারা পাপিষ্ঠ মুরতাদে পরিণত হবে। চাই সে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান রচনা করুক বা সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করুক।" [কালিমাতুল হক্ব : ৯৫-৯৬]

তিনি আরো বলেন:

**ومن حكم بغيرما أنزل الله عامدا عارفا فهو كافر. ومن رضي عن ذلك و أقره فهو كافر, سواء أ حكم بما يسميه شريعة أهل الكتاب أم بما يسميه تشريعا وضعيا . فكله كفر و خروج من الملة, أعاذنا الله من ذلك**

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জেনে শুনে আল্লাহর বিধান ব্যতিরেকে ভিন্ন বিধানে বিচার ফয়সালা করে সে কাফের। যে এ ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বা স্বীকৃতি প্রদান করে সেও কাফের। চাই সে এমন বিধান দ্বারা ফায়সালা করুক যাকে সে আহলে কিতাবের শরীয়াত বলে থাকে, কিংব এমন বিধান দ্বারা ফায়সালা করুক যাকে সে মানব রচিত বিধান বলে থাকে। এর প্রতিটিই কুফরি যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।"[দেখুন: শায়খের তাহকীককৃত মুসনাদে আহামাদ, ৭৭৪৭ নং হাদীসের প্রাসঙ্গিক আলোচনা]

আল্লামা মাহমূদ শাকের (রহঃ) এর ফতোয়াঃ আল্লামা আহমদ শাকের (রহঃ) এর ভাই আল্লামা মাহমূদ শাকের (রহঃ) বলেন:

**فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه و إيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لايشك أحد من أهل القبلة على اختلافه في تكفير القائل به والداعي إليه.)اهـ**

"এ ধরনের কাজ (অর্থাৎ নতুনভাবে সংবিধান রচনা) আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা, তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রাহ্যতা প্রকাশ এবং মহান আল্লাহ তায়ালার বিধানের উপর কাফেরদের বিধানকে প্রাধান্য প্রদান। এ সকল কাজ কুফর। কোনো মুসলমান, চাই সে যে মতেই বিশ্বাসী হোক, এর প্রবক্তা এবং এর দিকে আহ্বানকারীর কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।"[উমদাতুত তাফসীর, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:১৫৭]

৪. শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহঃ) এর ফতোয়াঃ ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সিরিয়ায় যখন কিছু ব্যক্তি সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে ধর্মীয় বিধানকে পৃথক করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে তখন সিরিয় কিছু আলেম শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহঃ) কে তাদের ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি

তাদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে হক্ককে সাহায্য না করে যে ব্যক্তি নীরব ভূমিকা পালন করে তাকে মুরতাদের সহায়তাকারী বোবা শয়তান আখ্যা দেন।

কাউসারী (রহঃ) লিখেন:

**إن هذه هي أدعى الدواهي وأعظم المصائب، يذوب لهولها قلب كلِّ مؤمن صادق الإيمان، ولا سيّما في مثل بلاد الشام التي لها ماض مجيد في خدمة الإسلام، فالمسلم إذا طالب بمثل ذلك في سلامة عقله يجري عليه حكم الردة في بلد يكون فيه الإسلام نافذ الأحكام، وفي غيره يُهجر هذا المطالب هجرا كليًا فلا يكلم ولا يعامل في أمر أصلاً حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ويتوب وينيب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن دين الإسلام جامع لمصلحتي الدنيا والآخرة، ولأحكامهما دلالة واضحة لا ارتياب فيها، فتكون محاولة فصل الدين من الدولة كفرا صارخًا منابذا لإعلاء كلمة الله، وعداءً موجها إلى الدين الإسلامي في صميمه، ويكون هذا الطلب من هذا المطالب إقرار منه بالانبتار والانفصال فيلزمه بإقراره، فنعده عضوًا مبتورًا من جسم جماعة المسلمين وشخصًا منفصلاً عن عقيدة الإسلام، فلا تصح مناكحته ولا تحل ذبيحته لأنه ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب**

“নিশ্চয়ই এটি চরম বিপর্যয়, কঠিন মুসিবত; যার ভয়াবহতায় সত্য ঈমানের অধিকারী প্রতিটি মুমিনের হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বিশেষ করে সিরিয়ার মত রাষ্ট্রে, যার অতীত ভরপুর রয়েছে ইসলামের নানা খেদমতে। কোন মুসলমানের আকল সুস্থ থাকা সত্ত্বেও যদি সে এ ধরনের প্রয়াস চালায়, তাহলে যদি সেই অঞ্চলে ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়িত থাকে তবে তার উপর মুরতাদের বিধান জারি হবে। আর যদি এমন এলাকা হয় যেখানে ইসলামী বিধান জারির সামর্থ্য নেই তাহলে এই কাজে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ বয়কট করতে হবে। তার সাথে কোন ধরনের কথা বা লেনদেন করা যাবে না। যতক্ষণ না জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে; আর সে তাওবা করে ফিরে আসে। কুরআন ও সুন্নাহর নসগুলো স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, ইসলাম ধর্ম

দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ ও বিধি-বিধানের সমাহার। তাই রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট কুফর। আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার বিরোধিতা। দ্বীনে ইসলামের একেবারে গোড়ার সাথে দুশমনি। উপরুক্ত কাজে ইচ্ছুক ব্যক্তির এই প্রয়াসই তার পক্ষ থেকে (দ্বীন থেকে) পৃথক হয়ে যাওয়া ও বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। তার স্বীকারোক্তির দ্বারাই এই হুকুম তার উপর বর্তাবে। ফলে আমরা তাকে মুসলিম উম্মাহর শরীর থেকে একটি কর্তিত অঙ্গ এবং ইসলামী বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি বলে গণ্য করব। তার সাথে বিবাহ বৈধ হবে না, তার জবেহকৃত পশুর গোশত হালাল হবে না। কেননা সে মুসলমানও নয়, আহলে কিতাবও নয়।" এর পর কাউসারী (রহঃ) এই ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণ পেশ করেন। অতঃপর বলেন,

**وأما الساكت من أهل الشأن عن تأييد الحق في مثل تلك الكارثة فإنما هو شيطان أخرس وردء لأهل الردة**

"এই কঠিন বিপর্যয়ে শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যে সত্যকে সাহায্য না করে নীরবতা অবলম্বন করবে সে হলো বোবা শয়তান এবং মুরতাদদের সহায়ক" [দেখুন: মাক্কালাতুল কাউসারীঃ হুকমু মুহাওলাতি ফাসলিদ দ্বীন, পৃষ্ঠা: ৩৩০/৩৩১, প্রকাশনা: আল-মাকতাবুত তাউফীকিয়্যাহ্]

৫. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম আলুশ শায়খ (রহঃ) এর ফতোয়াঃ সউদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী বিশিষ্ট ফকীহ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম আলুশ শায়খ (রহঃ) নিম্নোক্ত ফতোয়া দেন,

**لو قال من حكَّم القانون : "أنا أعتقد أنه باطل" فهذا باطل لا أثر له ، بل هو عزل للشرع ، كما لو قال أحد : "أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل." وأما إذا جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وأن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل**

"মানব রচিত বিধানকে বিচারক হিসেবে গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি বলে: (আমি বিশ্বাস রাখি এটা বাতিল) তাহলে তার এ কথা ধর্তব্য হবে না। বরং তার এই কাজ হচ্ছে শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়া । যেমন, যদি কেউ বলে: (আমি মূর্তি পূঁজা করি,

তবে আমি বিশ্বাস করি যে, এটা বাতিল।) আর যদি শ্রেণিবিন্যাস করে সুশৃংখলভাবে আইন প্রণয়ন করে তবে তা কুফর। যদিও বলে, (আমরা ভুল করছি। শরীয়াতের বিধানই অধিক ইনসাফপূর্ণ।)" [আল-ফাতাওয়া, খন্ড:১২, পৃষ্ঠা:২৮০]

৬. আল্লামা শানক্বিতী (রহঃ) এর ফতোয়াঃ তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআনের অন্যতম তাফসীর গ্রন্থ "আদওয়াউল বায়ান" প্রণেতা প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা শানক্বিতী (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সম্পূর্ণ স্পষ্টরূপে এ সমস্ত শাসকদের হুকুম বর্ণনা করেছেন যে, তারা মুরতাদ। আল্লাহ তায়ালার বাণী –

**وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا )الكهف: ٢٦)**

তিনি কাউকে নিজ বিধানের ক্ষেত্রে শরীক করেন না। [সূরা কাহাফ: ২৬]

এর ব্যাখ্যায় এ সমস্ত শাসকদের কুফরির ব্যাপারে একাধিক দলিল পেশ করার পর তিনি বলেন:

**وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم.**

"(উপরোল্লিখিত) এ সমস্ত আসমানী দলিল-প্রমাণ দ্বারা পূর্ণরূপে স্পষ্ট যে, যারা ঐ প্রণীত কানূনের অনুসরণ করে যা শয়তান তার বন্ধুদের মাধ্যমে প্রণয়ন করেছে, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মাধ্যমে যে বিধান দিয়েছেন তার বিপরীত, তাদের কাফের ও মুশরেক হওয়ার ব্যাপারে শুধু সে ব্যক্তিই সন্দেহ করতে পারে, আল্লাহ যার অর্ন্তদৃষ্টি নিভিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরই মতো তাকেও ওহীর নূর থেকে অন্ধ করে দিয়েছেন।" [তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২৫৯]

এ ছাড়াও তিনি উক্ত তাফসীর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে অনেক দলিল পেশ করেন যার দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ সমস্ত শাসক ইসলামের গন্ডি থেকে

খারিজ হয়ে গেছে। যা হোক, এখানে বিস্তারিত আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। নমুনাস্বরুপ নির্ভরযোগ্য ওলামাদের কয়েকজনের ফতোয়া উল্লেখ করা হল।

***

এরপর আরোও কয়েকটা জরুরী বিষয় আত্মস্থ করে নেয়া চাই।

১. ইসলামী আইন চালু না, থাকা আর কুফরী আইন চালু থাকা এক নয়ঃ একটি বিষয় খুব ভালভাবে খেয়াল রাখা চাই, ইসলামী শাসন পরিপূর্ণ জারি না থাকা আর কুফরী শাসন জারি থাকা এক নয়। বরং এ দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টো বিষয়। দ্বিতীয়টি কুফর, কিন্তু প্রথমটি সর্বাবস্থায় কুফর নয়।

রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ইসলামী শরীয়তের উপর হওয়ার পর এবং এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধানের সকল আইন ইসলামী হওয়ার পর যদি শাসকের গাফলতির কারণে, কিংবা শাসক জালেম বা ফাসেক হওয়ার কারণে রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলামী পরিবেশ বজায় না থাকে; বিচারকরা কখনোও কখনোও শরীয়ত পরিপন্থি ফায়সালা দিয়ে ফেলে, তাহলে শাসক বা বিচারক কেউই কাফের হয়ে যায় না, যদি তাদের মাঝে অন্য কোন কুফর না পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই যদি কুফরী হয়, যেখানে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত অনুযায়ী বিচার না করে বরং মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে বিচার করা হয়- তাহলে কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী এসব শাসক কাফের ও মুরতাদ। যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, নামাজ-রোযা ও অন্যান্য হুকুম আহকাম পালন করে। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরাম সকলে একমত। যেমন, নামাজ না পড়া, আর গাইরুল্লার জন্য নামাজ পড়া এক নয়। নামাজ না পড়া সর্বাবস্থায় কুফর নয়। বেনামাজী সর্বাবস্থায় কাফের নয়। কিন্তু গাইরুল্লার জন্য নামাজ পড়া সর্বাবস্থায় কুফর এবং এ ধরণের ব্যক্তি সর্বাবস্থায় কাফের। যদিও সে নিজেকে মুসলমান দাবি করে। কিন্তু অনেকে এ দুটো বিষয়কে এক করে ফেলেন। ফলে নিজেও মারাত্মক বিভ্রান্তির শিকার হন, অন্যকেও বিভ্রান্ত করেন।

২. খেলাফত যামানা আর বর্তমান যামানা এক নয়ঃ ইসলামী খেলাফত যতদিন কায়েম ছিল ততদিন শাসন ব্যবস্থা ইসলামী ছিল। তবে শাসকরা কম বেশ জুলুম

করতেন। বিচারকরা কখনোও কখনোও শরীয়ত পরিপন্থি ফায়সালা দিয়ে দিতেন। কিন্তু এটা কুফর নয়। আইম্মায়ে কেরাম জালেম শাসকদের বিরোদ্ধে জিহাদ তো করেছেন, কিন্তু তাদেরকে কাফের ফতোয়া দেননি।

পক্ষান্তরে বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই কুফরী । সেখানে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত অনুযায়ী বিচার না করে বরং মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে বিচার করা হয়। আর কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকরা কাফের ও মুরতাদ। যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, নামাজ-রোযা ও অন্যান্য হুকুম আহকাম পালন করে।

কিন্তু অনেকে এ দুই যামানাকে এক করে ফেলেন। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে খেলাফত যামানার শাসকদের মতো জালেম মুসলমান মনে করেন। ফলে নিজেও মারাত্মক বিভ্রান্তির শিকার হন, অন্যকেও বিভ্রান্ত করেন।

৩. 'দারুল মুসলিমীন' না বলে 'দারুল ইসলাম' কেন বলা হল? সমস্ত ফিকহের কিতাবে বলা হয়, 'দারুল ইসলাম'। 'দারুল মুসলিমীন' বলা হয় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে ইসলামের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়, মুসলমানদের দিকে নয়। এ থেকে বোঝে আসে, কোন রাষ্ট্র 'দারুল ইসলাম' হওয়ার জন্য তাতে মুসলমান থাকা জরুরী নয়, কিন্তু ইসলাম থাকা জরুরী। আবার ইসলাম পরাজিত হয়ে থাকলে হবে না। বিজয়ী বেশে থাকা শর্ত। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. তাঁর ফতোয়ায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

অতএব, যেখানে ইসলাম বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। যদিও তাতে মুসলমান না থাকে। যেমন, দারুল ইসলামের ঐ অংশ যেখানে যিম্মি কাফেররা বসবাস করে।

আর যেখানে ইসলাম বিজয়ী নয় তা দারুল ইসলাম নয়। যদিও তাতে অনেক মুসলমান থাকে। যেমন, ঐ দারুল হরব যেখানে মুসলমানরা কাফেরদের অনুমতি নিয়ে বা তাদের গাফলতির সুযোগে বসবাস করে।

৪. রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া অসম্ভবঃ তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. অত্যন্ত জোর দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছেন- কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় এবং সাংবিধানিকভাবে কুফরী বিধান জারি থাকলেও এবং মুসলমান জনসাধারণ ইসলামী শাসন জারি করতে না পারলেও রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া সম্ভব।

কিন্তু আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য দেখলে এই ধারণা সঠিক মনে হয় না। কেননা কোন রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র না কুফরী রাষ্ট্র এবং তা মুসলমানদের হাতে না কাফেরদের হাতে তা বুঝা যাবে তাতে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় বিধান থেকে। ইসলামী বিধান চললে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম, আর কুফরী বিধান চললে রাষ্ট্র দারুল কুফর। রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র কখনো ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারে না এবং তা মুসলমানদের হাতে থাকতে পারে না।

কেননা, কোন মুসলমান শাসক রাষ্ট্রীয়ভাবে কুফরী আইন জারি করে দিলে সে আর মুসলমান থাকে না। মুরতাদ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে নমুনাস্বরূপ নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি ফতোয়া এইমাত্র উল্লেখ করেছি।

মুরতাদ শাসককে হটিয়ে ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসক নির্বাচন করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। যদি উক্ত মুরতাদ শাসক ইসলামী শাসন রহিত করে রাষ্ট্রে কুফরী শাসন জারি করে দেয় এবং মুসলমানরা তাকে হটিয়ে ইসলামী শাসন জারি করতে না পারে তাহলে রাষ্ট্র আর দারুল ইসলাম থাকে না, দারুল কুফর হয়ে যায়। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. তাঁর ফতোয়ায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

অতএব, এদিক থেকে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে কুফরী বিধান জারি থাকা রাষ্ট্র দারুল হরব হওয়া এবং তা কাফেরদের হাতে থাকার নিদর্শন।

শাসকগোষ্ঠীর মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি যদি আমরা আপাতত নাও ধরি তবুও আইম্মায়ে কেরামের স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়, যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী তা দারুল হরব। আইম্মায়ে কেরামের অনেকেই সুস্পষ্ট বলে গেছেন, দারুল হরব ঐ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান চলে। অতএব, রাষ্ট্রীয়ভাবে কুফরী বিধান চলার অর্থই রাষ্ট্র দারুল কুফর।

উল্লেখ্য যে, আইম্মায়ে কেরামের কারো কারো বক্তব্যে এসেছে, দারুল হরব ঐ রাষ্ট্র যেখানে কাফেরদের শাসন চলে; আবার কারো কারো বক্তব্যে এসেছে, দারুল হরব ঐ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান চলে। আসলে এ দুইয়ের মাঝে কোন তাআরুজ বা বিরোধ নেই। কারণ মুসলিম শাসক যখন আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাদ দিয়ে কুফরী বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তখন আর সে মুসলমান থাকে না। মুরতাদ হয়ে যায়। এরপর যখন তাকে হটিয়ে ইসলামী শাসন কায়েম না করা যায় তখন রাষ্ট্র দারুল হরব হয়ে যায়। অতএব, রাষ্ট্রে কুফরী বিধান চলার অর্থই হচ্ছে তা কাফের

বা মুরতাদদের দখলে আছে। কাজেই রাষ্ট্রে কুফরী বিধান চলার যে অর্থ, রাষ্ট্র কাফেরদের হাতে থাকারও একই অর্থ। এ কারণেই কেউ বলেছেন, দারুল হরব ঐ রাষ্ট্র যেখানে কাফেরদের শাসন চলে, আবার কেউ বলেছেন, দারুল হরব ঐ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান চলে। মূলত উভয় কথার উদ্দেশ্য একই।

এবর আসুন আইম্মায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য লক্ষ্য করিঃ

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০ হি.) বলেন,

**فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين، فكانت دار حرب .وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوى فيه للمسلمين.**

[প্রত্যেক ঐ ভূখন্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা কাফেরদের হাতে। কাজেই তা দারুল হরব। আর প্রত্যেক ঐ ভূখন্ড যেখানে ইসলামী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে।](আল–মাবসূতঃ ১০/১১৪)

আল্লামা কাসানী রহ.(মৃত্যুঃ ৫৮৭ হি.) বলেন,

**أَنَّ قَوْلَنَا دَارُ الْإِسْلَامِ وَدَارُ الْكُفْرِ إضَافَةُ دَارٍ إلَى الْإِسْلَامِ وَإِلَى الْكُفْرِ، وَإِنَّمَا تُضَافُ الدَّارُ إلَى الْإِسْلَامِ أَوْ إلَى الْكُفْرِ لِظُهُورِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْكُفْرِ فِيهَا... فَإِذَا ظَهَرَ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِي دَارٍ فَقَدْ صَارَتْ دَارَ كُفْرٍ.**

[আমরা যে বলি, 'দারুল ইসলাম', 'দারুল কুফর' এর অর্থ: রাষ্ট্রকে ইসলাম ও কুফরের দিকে সম্বন্ধিত করা। রাষ্ট্রকে তখনই ইসলামের দিকে বা কুফরের দিকে সম্বন্ধিত করা হবে যখন তাতে ইসলাম বা কুফর বিজয়ী থাকবে।... কাজেই যখন কোন রাষ্ট্রে কুফরী বিধান বিজয়ী হয়ে যাবে, তখন তা দারুল কুফর হয়ে যাবে।](বাদায়িউস সানায়ী': ৬/১১২)

কাজী আবু ইয়ালা হাম্বলী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৫৮ হি.) বলেন,

**وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر فهي دار إسلام، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر**

[প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে ইসলামী বিধান বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। আর প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী তা দারুল কুফর।](আল-মু'তামাদ ফিল উসূলঃ ২৭৬)

ইমাম মারদাবী রহ. (মৃত্যু: ৮৮৫হি.) বলেন,

**ودار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر**

[দারুল হরব ঐ ভূখন্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী।][আল–ইনসাফঃ৪/১২১]

ইবনু মুফলীহ আল-হাম্বলী রহ. (মৃত্যু: ৭৬৩হি.)- যিনি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর শাগরেদ – তিনি বলেন,

**فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر، ولا دار لغيرهما**

[প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানদের আহকাম বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। আর যদি তাতে কাফেরদের আহকাম বিজয়ী হয় তাহলে তা দারুল কুফর।এই দুই প্রকার রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যকোন রাষ্ট্র নেই।][আল–আদাবুশ শরঈয়্যাহঃ ১/২১২]

'আল–মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল–কুয়েতিয়্যাহ' তে দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে-

**دار الإسلام هي: كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة.اهـ**

[দারুল ইসলাম প্রত্যেক এমন ভূখন্ড যেখানে ইসলামী বিধান বিজয়ী রয়েছে।]

**دار الحرب هي: كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة.اهـ**

[দারুল হরব প্রত্যেক এমন ভূখন্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী রয়েছে।]['আল–মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ্ আল–কুয়েতিয়্যাহ': ২০/২০১, হরফ: দাল]

অতএব, রাষ্ট্রীয় আইন কুফরী হবে কিন্তু রাষ্ট্র হবে ইসলামী – এটা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র অবশ্যই দারুল কুফর এবং তা কাফেরদের হাতে। চাই আসলী কাফের হোক, বা মুরতাদ কাফের হোক।

৫. ‘হয়তো দারুল’ ইসলাম নতুবা ‘দারুল হরব’; মাঝামাঝি কোন সূরত নেইঃ বর্তমান কুফরী আইন দ্বারা শাসিত গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে অনেকে দারুল আমান বলে থাকেন। আবার কেউ কেউ দারুল মুসলিমীনও বলেন।

কিন্তু দলীলের আলোকে তাদের এই বক্তব্য সহীহ বলে ধরা যায় না। কারণ-রাষ্ট্র হয়তো ‘দারুল ইসলাম’ নতুবা ‘দারুল হরব’। মাঝামাঝি কোন সূরত নেই। যা দারুল ইসলাম নয় তা দারুল হরব। ফুকাহায়ে কেরাম রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম ও দারুল হরব ব্যতীত তৃতীয় কোন প্রকারে ভাগ করেননি। কোন মাজহাবের ফিকহের কোন কিতাবে দারুল আমান বা দারুল মুসলিমীন নামে এমন কোন তৃতীয় প্রকার পাওয়া যায় না যা দারুল ইসলামও নয় আবার দারুল হরবও নয়। অতএব বলা যায়, দারুল আমান বা দারুল মুসলিমীন নামক পরিভাষা যা বর্তমানে অনেকে ব্যবহার করছেন তা নব আবিস্কৃত এবং ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা-ঐক্যমতের পরিপন্থি।

একটু পূর্বে আলোচনা করে এসেছি, রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া অসম্ভব। বরং যেখানে কুফরী বিধান চালু থাকবে তা দারুল হরব। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এ ধরণের রাষ্ট্রকে তৃতীয় কোন নাম দারুল আমান বা দারুল মুসলিমীন দেয়া যাবে না। বরং দারুল হরব বলতে হবে। দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের মাঝামাঝি কোন রাষ্ট্র আছে বলে মনে করা ক্বদরিয়্যাদের আকিদা। ক্বদরিয়্যাদের একটা ভ্রান্ত আকিদা হলো, কবীরা গুনাহকারীরা মুসলমানও নয়, কাফেরও নয়; বরং তারা ঈমানদার ও কাফেরের মাঝিমাঝি এক স্তরের মানুষ। কিন্তু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, মানুষ দুই প্রকারইঃ হয়তো ঈমানদার, নয়তো কাফের। মাঝামাঝি কোন প্রকার নেই।

ক্বদরিয়্যারা মানুষের ক্ষেত্রে যেমন এই ভ্রান্ত আকিদা রাখে যে, ঈমানদার ও কাফেরের মাঝামাঝি এক প্রকার মানুষ রয়েছে, তদ্রুপ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এই ভ্রান্ত আকিদা রাখে যে, দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের মাঝামাঝি এক প্রকার রাষ্ট্র রয়েছে যাকে তারা ‘দারুল ফিসক’ তথা ‘ফাসেকি রাষ্ট্র’ নাম দেয়।

ফকীহে বাগদাদ কাজী আবু ই’য়ালা হাম্বলী রহ. (মৃত্যু: ৪৫৮হি.) বলেন-

**وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر فهي دار إسلام، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار كفر ، خلافا للقدرية في قولهم: إن كلا دار كانت الغلبة فيها للفساق دون المسلمين ولا الكفار: فإنها ليست بدار كفر ولا دار إسلام ، بل هي دار فسق. وهذا بناء على أصلهم في القول بالمنزلة بين منزلتين ... ولايجوز كون مكلف ليس بمؤمن ولا كافرو، كذلك الدار أيضا لا يخلو من أن تكون دار كفر أو دار إسلام.اهـ**

[প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে ইসলামী বিধান বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। আর প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী তা দারুল কুফর। ক্বদরিয়্যারা এর বিপরীত মত পোষণ করে থাকে। তারা বলে, প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানরাও নয়, কাফেররাও নয় বরং ফাসেকরা বিজয়ী তা দারুল কুফরও নয়, দারুল ইসলামও নয়। বরং তা 'দারুল ফিসক'। তাদের এ আকিদা তাদের 'মানযিলাতুন বাইনাল মানযিলতাইন' – দুই স্তরের মাঝামাঝি স্তর – মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।... কোন মুকাল্লাফ ব্যক্তি – আকেল বালেগ পুরুষ বা মহিলা – মুমিনও হবে না, কাফেরও হবে না এটা যেমন অসম্ভব, রাষ্ট্রও তেমনি দারুল কুফর বা দারুল ইসলামের কোন একটা না হয়ে পারে না।](আল-মু'তামাদ ফিল উসূলঃ ২৭৬)

যারা কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকদেরকে মুসলমান মনে করে তারা যখন এসব রাষ্ট্রকে দারুল আমান বলেন তখন বিষয়টা বড়ই আশ্চর্য্য লাগে। কারণ তারা দারুল আমানের সংজ্ঞা, উদাহরণ, দৃষ্টান্ত সবকিছু দেন নবীযুগের হাবশা দিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যখনকার হাবশাকে দারুল আমান বলা হচ্ছে তখনকার হাবশার শাসক মুসলমান ছিল না কাফের ছিল ?! সে হাবশা তখন মুসলমানদের হাতে ছিল না কাফেরদের হাতে ?! যদি তখন সেখানকার শাসক কাফের হয়ে থাকে, যদি তা কাফেরদের হাতে থেকে থাকে তাহলে তো তা দারুল হরব। হ্যাঁ, যেখানে সেখানে মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে দ্বীন পালন করতে পারতো এ কারণে তাকে দারুল আমান বলা হয়েছে। অতেএব, বিশেষ পরিস্থিতিতে তখনকার মক্কা যা তখন দারুল খওফ তথা ভীতিসংকুল রাষ্ট্র ছিল তার তুলনায় হাবশাকে দারুল আমান (নিরাপদ রাষ্ট্র) বলা হয়েছে। অতএব, দারুল আমান মূলত দারুল হরবই।

অতএব, যারা এসব শাসককে মুসলমান মনে করে এবং এসব রাষ্ট্রকে দারুল হরব মনে করে না তারা এসব রাষ্ট্রকে দারু আমান বলা বড়ই আশ্চর্য্য জনক।

কেউ হয়তো বলতে পারেন, আইম্মায়ে কেরামের যামানায় বর্তমানের মত কুফরী শাসন ছিল না, ফলে তাঁরা শুধু দারুল ইসলাম আর দারুল কুফর এ দু'ভাগেই ভাগ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান কুফরী শাসনের যামানায় তৃতীয় আরেকিটি প্রকারের প্রয়োজন।

উত্তরে বলবো–কুফরী শাসন ছিল না কথাটা ঠিক নয়। তাতারীদের কথা আমরা আলোচনা করে এসেছি। তাদের শাসন ব্যবস্থা কুফরী ছিল। যার ফলে আইম্মায়ে কেরাম তাদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের বিরোদ্ধে কিতালকে ফরয বলে ঘোষণা দিয়েছেন। নিজেরাও সশস্ত্রভাবে তাদের বিরোদ্ধে কিতাল করেছেন। আর রাষ্ট্র মুরতাদদের হাতে চলে যাওয়ার পর তা যে দারুল হরব তা আর ফতোয়ার অপেক্ষায় থাকে না। বর্তমান কুফরী শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলো কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব এই প্রশ্ন যেমন হচ্ছে, তাতারীদের দখলকৃত তখনকার রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারেও এই প্রশ্ন হয়েছিল যে, সেগুলো কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব? তখন স্পষ্টভাবে ফতোয়া দেয়া হয়েছে, এসব রাষ্ট্র দারুল হরব।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু: ৭২৮হি.) – যিনি তাতারী মুরতাদদের বিরোদ্ধে জিহাদে জীবন ব্যয় করেছেন – তিনি একটু ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। তাতারীদের দখলকৃত 'মারিদীন' – যা বর্তমানে তুরস্কে অবস্থিত – এর ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তা কি দারুল হরব না দারুল ইসলাম? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ অর্থে দারুল ইসলামও নয়, আবার দারুল হরবও নয়; বরং তা 'দারে মুরাক্কাবাহ্' তথা দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের সমন্বিত একটা রূপ।

ফতোয়াটি তাঁর ভাষায় নিম্নরূপঃ

**وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام , لكون جندها مسلمين , ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه.**

[আর তা দারুল হরব না'কি দারুল ইসলাম – তো এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তা 'দারে মুরাক্কাবাহ্'। যাতে উভয় দিকই বিদ্যমান। দারুল ইসলামের সমপর্যায়েরও নয় যেখানকার সৈনিকগণ মুসলমান হওয়ার কারণে তাতে ইসলামী বিধান চলছে; আবার দারুল হরবের মতোও নয় যেখানকার অধিবাসীরা কাফের। বরং তা তৃতীয় একটি প্রকার। সেখানকার মুসলমানদের সাথে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী মুআমালা করা হবে, আর ইসলামী শরীয়ত থেকে যারা খারিজ হয়ে গেছে তাদের বিরোদ্ধে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী কিতাল করা হবে।](মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৪০–২৪১)

কিন্তু শাইখুল ইসলামের এই তৃতীয় প্রকার গ্রহণযোগ্য হয়নি। কেননা, তা পূর্ববর্তী আইম্মায়ে কেরামের ইজমা-ঐক্যমতের বিপরীত। এ কারণে তাঁর এ মত 'তাফাররুদ' তথা 'ইজমা পরিপন্থি বিচ্ছিন্ন মত' বলে বিবেচিত হয়েছে। স্বয়ং তাঁর শাগরেদ ইবনু মুফলিহ রহ. (মৃত্যু: ৭৬৩ হি.) এ মতকে পূর্বসূরি আইম্মায়ে কেরামের বিপরীত বিচ্ছিন্ন মত বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনু মুফলিহ রহ. বলেন-

**فصل في تحقيق دار الإسلام و دار الحرب**

**فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر، ولا دار لغيرهما ، وقال الشيخ تقي الدين، وسئل عن ماردين ... والأول هو الذي ذكره القاضي و الأصحاب.اهـ**

['দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হরব' এর বিশ্লেষণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানদের আহকাম বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। আর যদি তাতে কাফেরদের আহকাম বিজয়ী হয় তাহলে তা দারুল কুফর। এই দুই প্রকার রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যকোন রাষ্ট্র নেই। শায়খ তাকী উদ্দীন – ইবনে তাইমিয়া রহ. – কে 'মারিদীন' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন – এরপর তিনি ইবনে তাইমিয়া রহ. এর পূর্বোক্ত ফতোয়াটি উল্লেখ করেন। তারপর বলেন: তবে কাজী – আবু ই'য়ালা রহ. (মৃত্যু: ৪৫৮হি.) যার বক্তব্য আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি

– এবং মাজহাবের অন্যান্য ইমামগণ প্রথমটিই উল্লেখ করেছেন।][আল–আদাবুশ শরঈয়্যাহঃ ১/২১২]

এখানে লক্ষ্যনীয় যে,

**والأول هو الذي ذكره القاضي و الأصحاب.اهـ**

[কাজী – আবু ই'য়ালা – এবং মাজহাবের অন্যান্য ইমামগণ প্রথমটিই উল্লেখ করেছেন।] এই বাক্যটিতে আরবি ভাষা অনুযায়ী তিনটা তা'কিদ ব্যবহার করা হয়েছেঃ

১. মুবতাদা (সাবজেক্ট-উদ্দেশ্য) ও খবর (অবজেক্ট-বিধেয়) উভয়কে মা'রেফা আনা হয়েছে।

২. যমীরে হসর (সীমাবদ্ধতা নির্দেশক সর্বনাম) **هو** আনা হয়েছে, যা বুঝায় খবরটি মুবতাদার মাঝে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ কাজী সাহেব এবং মাজহাবের অন্যান্য ইমামগণ রাষ্ট্রের প্রকার দু'টিই উল্লেখ করেছেনে, তৃতীয় কোন প্রকার উল্লেখ করা হয়নি।

৩. জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ্ (বিশেষ্যবাচক বাক্য) আনা হয়েছে।

যারা ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাবাদির সাথে সম্পর্ক রাখেন তাদের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, এ ধরণের তাকিদপূর্ণ বাক্য মাজহাবের সর্বসম্মত ও মুফতা বিহি মতটি (যার উপর ফতোয়া দেয়া হয়) বুঝানোর জন্য এবং তার বিপরীত মতটিকে 'যয়ীফ' (দুর্বল) এবং 'তাফাররুদ' (বিচ্ছিন্ন মত) বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

অর্থাৎ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর এ মতটি মাজহাবের আইম্মায়ে কেরামের ইজমা-ঐক্যমতের বিপরীত দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন একটি মত। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

অতএব, রাষ্ট্রের প্রকার দু'টিই রয়ে গেল। হয়তো দারুল ইসলাম, নতুবা দারুল হরব। তৃতীয় কোন প্রকার নেই।

অধিকন্তু যদি শাইখুল ইসলামের এ মত গ্রহণযোগ্যও হত তবুও তা দারুল আমানের প্রবক্তাদের পক্ষে দলীল হতো না। কারণ:

শাইখুল ইসলামের ফতোয়াতে দারুল আমান বলে কিছু নেই। শাইখুল ইসলাম তাঁর ফতোয়াতে তাতারীদের হুকুমতের বিরোদ্ধে কিতাল করার ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে যারা কুফরী আইন দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রগুলোকে দারুল আমান বলতে চান তারা এর দ্বারা বুঝাতে চান: যেহেতু সেগুলো দারুল আমান কাজেই সেগুলোর হুকুমতের বিরোদ্ধে কিতাল করা যাবে না। কিন্তু শাইখুল ইসলাম উল্টো কিতাল করার ফতোয়া দিয়েছেন। কাজেই শাইখুল ইসলামের ফতোয়া দারুল আমানওলাদের জন্য সুবিধাজনক নয়।

***

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর বক্তব্যের পর্যালোচনাঃ

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. "ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত" নামক কিতাবে কুফরী আইন দ্বারা শাসিত বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে 'দারুল ইসলাম' তথা 'ইসলামী রাষ্ট্র' দাবি করেছেন।

পর্যালোচনায় যাওয়ার আগে "ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত" থেকে তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর বক্তব্যটি তুলে ধরছি।

তিনি বলেন –

## پانچوا باب: دفاع اور امور خارجہ

**اس باب کا موضوع یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں دوسرے ملکوں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیئے پہلے یہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فقہ می دنیا کے ملکوں کے لیئے جو دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ایک دار الاسلام اور دوسرے دار الحرب یا دار الکفران دو اصطلحات کا مطلب کیا ہے؟**

### دار الاسلام اور دار الحرب

دار الاسلام" سے مراد وہ ملک ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں ہو، اور اس پر انکا مکمل تسلط اس طرح قائم ہو کہ وہاں انہی کے احکام جاری اور نافذ ہوتے ہوں۔ چنانچہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ دار الاسلام کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں:

فإن دار الإسلام اسم للموضع الذی یکون تحت ید المسلمین"

یعنی: " دار الاسلام اس جگہ کا نام ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں ہو" ۔شرح السیر الکبیر باب 127ج4ص86

اور جامع الرموز میں "الکافی" کے حوالے سے اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:

دار الاسلام ما یجری فیہ حکم امام المسلمین وکانوا فیہ آمنین".

یعنی: دار الاسلام وہ ہے جس میں مسلمانوں کے امام (سربراہ) کا حکم چلتا ہو اور مسلمان اس می امن سے رہتے ہوں "۔جامع الرموز ج4ص556(

اگرچہ مسلمانوں کے تسلط میں ہونے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیئے کہ اس ملک میں تمام احکام اسلامی شریعت کے مطابق جاری ہوں، لیکن اگر مسلمان حکمرانوں کی غفلت سے اس میں شریعت کا مکمل نفاذ نہ ہو، تب بھی اگر اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، تو اسے دار الاسلام ہی کہا جائے گا۔

جامع الرموز کی مذکورہ بالا عبارت میں جو کہا گیا ہے کہ اس ملک میں "مسلمانوں کے امام کا حکم چلتا ہو" اس سے بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا ہے کہ یہاں حکم سے مراد تمام احکام شریعت ہیں، لہٰذا اگر مسلمانوں کے زیر تسلط کسی ملک میں شریعت کے تمام احکام نافذ نہ ہوں تو اسے دار الاسلام نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ درحقیقت کسی ملک کے دار الاسلام قرار پانے کے لیئے اصل بات یہ ہے کہ اس پر مکمل اقتدار مسلمانوں کو حاصل ہو، اور انہیں اپنے احکام جاری کرنے کی مکمل قدرت حاصل ہو۔ پھر اگر وہ اپنی غفلت یا کوتاہی سے اسلام کے تمام احکام جاری نہ

کریں تو یہ انکے لیئے شدید گناہ ہے، اور ان پر واجب ہے کہ تمام احکام شریعت کو نافذ کریں، لیکن انکی اس مجرمانہ غفلت کی وجہ س ملک دار الاسلام کی تعریف سے خارج نہیں ہوتا-اوپر آپ نے دیکھا کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے دار الاسلام کی تعریف میں صرف یہ بات ذکر فرمائی کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہو، اور اسی بات کو جامع الرموز کی عبارت میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے احکام چلتا ہو، یعنی اس کے احکام نافذ ہوتے ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ احکام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں—چونکہ اس دور میں اس بات کا تصور مشکل تھا کہ کوئی ملک مسلمانوں کے تسلط میں ہونے کے باوجود اپنے باشندوں پر اسلامی احکام نافذ نہ کرے، اس لیئے اس دور میں یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا کہ اگر مسلمانوں کے زیر اقتدار کسی ملک میں شریعت مکمل طور پر نافذ نہ ہو تو اسے دار الاسلام کہا جائیگا یا نہیں؟ بلکہ صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ دار الاسلام وہ ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں ہو، اور اس میں انہی کا حکم چلتا ہو- لیکن بعد کے زمانوں میں مسلمان حکمرانوں کی غفلت سے ایسی صورت حال پیش آئی کہ کوئی ملک مسلمانوں کے زیر اقتدار بھی ہے، اور اس می شریعت کے احکام پوری طرح نافذ نہیں ہیں، تو بعد کے فقہائے کرام نے اس کی صراحت بھی فرمادی -چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وبہذا ظہر إن ما فی الشام من جبل تیم اللہ المسمی بجبل الدروز و بعض البلاد التابعۃ کلُّہا دار إسلام، لأنہا وإن کانت لہا حکام دروز إو نصاری، ولہم قضاۃ علی دینہم و بعضہم یعلنون بشتم الإسلام والمسلمین، و لکنہم تحت حکم ولاۃ إمورنا، و بلاد الإسلام محیطۃ ببلادہم من کل جانب، وإذا إراد ولی الأمر تنفیذ إحکامنا فیہم نفذہا".

یعنی: " اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ شام میں جو جبل تیم اللہ کا علاقہ ہے جسکا نام جبل الدروز بھی ہے، وہ اور اسکے تابع جو شہر ہیں، وہ سب دار الاسلام ہیں، کیونکہ اگرچہ ان علاقوں میں عیسائی اور دورزی حکام موجود ہیں، اور انکے قاضی بھی ہیں جو اپنے دین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور ان

میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو علانیہ اسلام اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتیں ہیں، لیکن وہ ہمار حکام کے ما تحت ہیں، اور اسلامی ممالک ہر طرف سے انکو گھیرے ہوے ہیں، اور اگر ولی الامر ان پر ہمارے احکام نافذ کرنا چاہے تو نافذ کر سکتا ہے "۔رد المحتار، کتاب الجہاد، فصل فی استئمان الکافر، قبیل باب العشر والخراج ج12 ص660 طبع جدید(

اس سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ کسی ملک کے دار الاسلام ہونے کے لیئے اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اقتدار اور قبضہ مکمل ہے یا نہیں؟ اگر اقتدار مکمل ہے تو اس ملک کو دار الاسلام کہا جائے گا، اور اس پر دار الاسلام ہی کے احکام جاری ہونگے، اگرچہ مسلمان حکمرانوں کی غفلت سے وہاں شریعت کا مکمل نفاذ نہ ہو سکا ہو((-

[পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র নীতি

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো – ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কী ধরণের সম্পর্ক রাখতে পারবে?

এই মাসআলা বুঝার জন্য প্রথমে ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে 'দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হরব' বা 'দারুল কুফর' নামে যে দুটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তার দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা আলোচনা করে নেয়া মুনাসিব-উপযোগী মনে হচ্ছে।

'দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হরব'

দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ রাষ্ট্র যা মুসলানদের কব্জায় রয়েছে এবং তাতে তাদের এমন পরিপূর্ণ দখলদারিত্ব কায়েম রয়েছে যে, তাতে তাদের আহকাম কার্যকরীভাবে চলে।

যেমন আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন,

فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين

"'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে।"(শরহুস সিয়ারীল কাবীর: পরিচ্ছেদ-১২৭, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৬)

'জামিউর রুমুজ' এ 'আল-কাফি' এর বরাত দিয়ে এর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে,

**دارالإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين وكانوا فيه آمنين**

"'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর শাসন চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে।"(জামিউর রুমুজ:খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৫৬)

যদিও মুসলমানদের হাতে থাকার ফল এই হওয়ার কথা ছিল যে, উক্ত রাষ্ট্রে সকল আইন ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক চলবে, কিন্তু মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যদি পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি নাও থাকে, তবুও যদি ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকে তাহলে তাকে দারুল ইসলামই বলা হবে।

জামিউর রুমুজের উপরোক্ত বক্তব্যে যা বলা হয়েছে, "ঐ ভূখন্ডে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর শাসন চলে" এ থেকে কারো কারো এই সন্দেহ হয়ে গেছে,

'এখানে হুকুম দ্বারা ইসলামী শরীয়তের সকল বিধান উদ্দেশ্য। কাজেই যদি মুসলমানদের আয়ত্বাধীন কোন রাষ্ট্রে শরীয়তের সকল বিধান জারি না থাকে তাহলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে না।'

কিন্তু এ কথা দুরস্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম বলে প্রতীয়মান হওয়ার জন্য জন্য মূল বিষয় হচ্ছে তাতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা থাকা এবং তাতে তাদের আহকাম জারি করার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা। এরপর যদি তারা তাদের গাফলতি এবং ত্রুটির কারণে সকল আহকাম জারি না করে তাহলে এটা তাদের জন্য মারাত্নক গুনাহ। শরীয়তের সকল আহকাম জারি করা তাদের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু তাদের এই আমার্জনীয় গাফলতির কারণে উক্ত রাষ্ট্র দারুল ইসলামের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে না।

তুমি দেখেছ, আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় শুধু এতটুকু বলেছেন, তা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে।

আর এ বিষয়টাকেই জামিউর রুমুজের বক্তব্যে এভাবে বলা হয়েছে, "তাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর শাসন চলে"। অর্থাৎ তার আইন কার্যকর হয়। ঐ আইন শরীয়তসম্মত কি'না তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি।

যেহেতু ঐ যামানায় 'কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে থাকা সত্বেও তার অধিবাসীরা তাতে ইসলামী আহকাম জারি করবে না, তা কল্পনা করাও মুশকিল ছিল , ফলে ঐ যামনায় সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়নি, মুসলমানদের অধিনস্থ কোন রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি না থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে কি'না। বরং শুধু এতটুকু বলার উপর ক্ষ্যান্ত করা হয়েছে, "'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে এবং তাতে তাদেরই হুকুম চলে"।

কিন্তু পরবর্তী যামানায় মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যখন এমন সূরত সামনে আসলো, 'কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের ক্ষমতাধীন কিন্তু তাতে ইসলামী শরীয়ত পরিপূর্ণ জারি নেই' তখন পরবর্তী যামানার ফুকাহাগণ তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন {যে, এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম}।

যেমন- আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

**وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلُّها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم و بعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، ولكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها".**

"এ থেকে বুঝে আসে, শামের 'তাইমুল্লাহ্' পাহাড় যাকে 'দারুয পাহাড়'ও বলা হয় এবং এর অন্তর্গত আরো কতক শহর সবগুলোই দারুল ইসলাম। কেননা সেগুলোর শাসক যদিও দারুয বা নাসারা এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিচারকও রয়েছে যারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে, তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে কটুক্তি করে

থাকে; কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলমান শাসকদের অধীনস্থ। দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুসলমান শাসকগণ যখনই চাইবেন তাদের উপর আমাদের আহকাম জারি করে দিতে পারবেন।"('রদ্দুল মুহতার', কিতাবুল জিহাদ, 'বাবুল উশরি ওয়াল খারাজ' এর একটু আগে 'ইসতি'মানুল কাফের' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬৬০, নতুন সংস্করণ।)

এ থেকে এ বিষয়টি আরোও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য মূল গুরুত্ব হলো তাতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ কব্জা ও ক্ষমতা আছে কি'না। যদি পরিপূর্ণ ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে ঐ রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলা হবে এবং তার উপর দারুল ইসলামেরই আহকাম জারি হবে। যদিও মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে তাতে পরিপূর্ণরুপে শরীয়ত জারি হতে না পারে।] [ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩২৪-৩২৭]

সামনে গিয়ে বর্তমান মুসলমান নামধারী শাসকদের দখলে থাকা কুফরী আইন দ্বারা শাসিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম দাবি করে তিনি বলেন-

**اور چونکہ ان میں سے ہر ملک میں اقتدار مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں ہے اس لئے ان میں سے ہر ایک پر دار الاسلام کی تعریف بھی صادق آتی ہے-**

[যেহেতু এ সব রাষ্ট্রের প্রত্যেকটার ক্ষমতা মুসলমানদেরই হাতে, এ কারণে এগুলোর প্রত্যেকটার উপর দারুল ইসলামের সংজ্ঞা প্রযোজ্য।] [ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩৩১]

তাঁর এ দুই বক্তব্যে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, (বর্তমান মুসলিম নামধারী শাসকগোষ্ঠী যদিও কুফরী আইন দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করছে তবুও তারা মুসলমান। তাদের ক্ষমতাধীন রাষ্ট্রগুলো 'দারুল ইসলাম' তথা ইসলামী রাষ্ট্র। শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০) এবং আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আর আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।)

আমরা আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যগুলোকে পর্যালোচনা করে দেখবো, তাঁদের বক্তব্যগুলো থেকে তাঁর এ দাবির কোন সমর্থন পাওয়া যায় কি'না। সাথে সাথে তাঁদের এ বক্তব্যগুলোর প্রকৃত প্রয়োগ ক্ষেত্র কী হবে তাও আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহের পর্যালোচনাঃ

পর্যালোচনার সারকথাঃ শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০হি.) এর যামানায় কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। যেমনটা তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. নিজেও স্বীকার করেছেন।

কাজেই তাঁর বক্তব্যঃ "'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে" দ্বারা এ কথা কীভাবে বোঝা যাবে, কুফরী আইন দিয়ে পরিচালিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম ?! কুফরী আইন তো তাঁর যামানায় ছিলই না।

বরং তাঁর যামানায় যেহেতু পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম ছিল কাজেই 'মুসলমানদের হাতে থাকা'র দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য, মুসলমানরা তাতে নিরাপত্তার সাথে শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারে।

অতএব, তাঁর বক্তব্য থেকে যেসব রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম রয়েছে সেগুলো দারুল ইসলাম বোঝা যায়। কুফর শাসিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না।

আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্যঃ "'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যেখানে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর শাসন চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে।"

এখানে 'ইমামুল মুসলিমীন' একটা পরিভাষা। আর পরিভাষার একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে। সম্ভাব্য সকল অর্থই উদ্দেশ্য হয় না।

যেমন, 'সালাত' একটা পরিভাষা। যা একটা নির্দিষ্ট ইবাদাত বোঝায়। সালাতের আভিধানিক অর্থ – দোয়া। কিন্তু পরিভাষায় সকল দোয়াকেই সালাত বলে না।

আল্লামা কূহুসতানী রহ. দারুল ইসলামের সংজ্ঞা প্রদানের পূর্বে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, এখানে 'ইমামুল মুসলিমীন' দ্বারা আহলুল হল ওয়াল আকদ কতৃক বাইয়াতকৃত শরয়ী ইমাম উদ্দেশ্য।

তদ্রুপ এখানে 'ইমামুল মুসলিমীনের শাসন' দ্বারা সব ধরণের শাসন উদ্দেশ্য নয়। জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম, ঈমানী-কুফরী সব ধরণের শাসন উদ্দেশ্য নয়।

বরং এখানে 'ইমামুল মুসলিমীনের শাসন' দ্বারা ইসলামী শাসন উদ্দেশ্য। কেননা ইমাম নিযুক্ত করাই হয় ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য। শরীয়তের বিরোদ্ধাচরণের জন্য নয়। যে ইমাম শরীয়তের বিরোদ্ধাচরণ করে সে আর ইমাম হওয়ার যোগ্য থাকে না। তাকে সরিয়ে ফেলা উম্মতের উপর ওয়াজিব।

তদ্রুপ তাঁর বক্তব্যঃ 'মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে' দ্বারা দ্বীন পালন সহ নিরাপত্তা উদ্দেশ্য। যে নিরাপত্তা লাভের জন্য দ্বীন বিসর্জন দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তা উদ্দেশ্য নয়। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. তাঁর ফতোয়ায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

অতএব, কূহুসতানী রহ. এর বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ালঃ "'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যা আহলুল হল ওয়াল আকদ কতৃক বাইয়াতকৃত শরয়ী ইমামের শাসনাধীন রয়েছে। যেখানে ইসলামী আহকাম চলে এবং মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে তাদের দ্বীনের বিধি-বিধান পালন করতে পারে।"

যে রাষ্ট্রে ইসলামী আহকাম চলে না বরং কুফরী বিধান চলে; যেখানে হুদুদ, কেসাস, জিহাদ সহ দ্বীনের অন্যান্য বিধান বাস্তবায়ন জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয় সেসব রাষ্ট্রকে এই বক্তব্যে 'দারুল ইসলাম' তথা ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়নি।

আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যের সার কথা- আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত শরয়ী আইন দ্বারা শাসিত ইসলামী রাষ্ট্রের একটা অংশে কাফেররা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। মুসলমান শাসকদের উচিৎ ছিল তাদেরকে দমন করা, কিন্তু তারা তা সামর্থ্য থাকা সত্তেও তাদেরকে দমন করেননি। এই সুযোগে কাফেররা সেখানে কুফরী করে বেড়াচ্ছে। এই দমন না করা তাদের অপরাধ।

এ থেকে বোঝা যায়, কোন ইসলামীর রাষ্ট্রের শাসকের শিথিলতার কারণে যদি তাতে অন্যায় অপরাধ এমনকি কুফরীও চলতে থাকে তাহলেও তা দারুল ইসলামই

থেকে যাবে। দারুল কুফর হয়ে যাবে না। কিন্তু এ থেকে কিছুতেই এ কথা বোঝা যায় না, যেসব রাষ্ট্রের শাসকরা আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে সেগুলো সব 'দারুল ইসলাম' তথা 'ইসলামী রাষ্ট্র'। বিস্তারিত আলোচনা আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যের পর্যালোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

***

পর্যালোচনাঃ

ইমাম সারাখসী রহ. (মৃত্যু-৪৯০হি.) এর বক্তব্যের পর্যালোচনাঃ মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্তব্যের একটা অংশ উল্লেখ করেছেন।

ইমাম সারাখসী রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যটি নিম্নরুপ-

**باب : ما يقطع من الخشب ، وما يصاب من الملح وغيره**

**(وإذا خرجت سرية بإذن الإمام لقطع الشجر فوصلوا إلى مكان يخاف فيه المسلمون ، ثم قطعوا الخشب وجاءوا به فهو غنيمة يخمس). لأن الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون من جملة دار الحرب ، فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين ، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون .فإن قيل : كما أن المسلمين لا يأمنون في هذا المكان ، فكذلك أهل الحرب لا يأمنون فيه .قلنا : نعم ، ولكن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب ، فلا تصير دار الإسلام إلا بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه . وهذا ؛ لأن ما كان ثابتا فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره ، ولا يرتفع إلا باعتراض معنى هو مثله أو فوقه ، وإذا ثبت أنه من أرض أهل الحرب فما يكون فيه من الخشب يكون في يد أهل الحرب . فهذا مال أصابه المسلمون من أهل الحرب بطريق القهر، وهو الغنيمة بعينه .اهـ**

বক্তব্যের তরজমায় যাওয়ার পূর্বে ইমাম সারাখসী রহ. কোন প্রেক্ষিতে কথাটি বলেছেন তা জেনে নেয়া যাক। ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্তব্যের প্রেক্ষাপট

বিশ্লেষণঃ সারাখসী রহ. গনীমতের আলোচনায় কথাটি বলেছেন। মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দল দারুল হরব থেকে শক্তি প্রয়োগ করে যে মাল নিয়ে আসে তাকে গনীমত বলে। গনীমতের বিধান হচ্ছে- তার খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) বাইতুল মালে জমা দিতে হবে। কোন মাল গনীমত হওয়ার জন্য তা দারুল হরব থেকে লাভ করা শর্ত। দারুল হরব থেকে লব্ধ না হলে তা গনীমত হবে না। এখন প্রশ্ন হলো, দারুল হরব বলতে কী বুঝায় ?

-যেসব রাষ্ট্র সরাসরি কাফেরদের দখলে আছে সেগুলো তো দারুল হরব হওয়া স্পষ্ট।

-তদ্রুপ যে সব রাষ্ট্র সরাসরি মুসলমানদের হাতে আছে, মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে ইসলামী শরীয়ত পালন করতে পারছে, কাফেররা সেখানে মুসলমানদের থেকে আমান (নিরাপত্তা) নেয়া ব্যতীত বসবাস করেতে পারে না – সেগুলো দারুল ইসলাম হওয়াও স্পষ্ট।

-কিন্তু যেসব ভূখন্ড মুসলমানদের হাতেও নেই, কাফেরদের হাতেও নেই সেগুলোর কী বিধান?

সেগুলো কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব ?

না'কি এ দুটোর কোনটিই নয়; বরং তৃতীয় নতুন আরেকটি প্রকার ?

যদি এসব ভূখন্ড দারুল হরব হয় তাহলে সেখান থেকে লব্ধ মাল গনীমত বলে গণ্য হবে এবং তা থেকে খুমুস নেয়া হবে। আর যদি দারল হরব না হয় তাহলে তা থেকে লব্ধ মাল গনীমত ধরা হবে না এবং তা থেকে গনীমতের খুমুসও নেয়া হবে না।

সারাখসী রহ. বলেন, এসব ভূখন্ড দারুল হরব । কাজেই সেখান থেকে লব্ধ মাল গনীমত বলে গণ্য হবে এবং তা থেকে খুমুসও নেয়া হবে। এখন এখানে আপত্তি হতে পারে, এসব ভূখন্ড তো কাফেরদের দখলে নেই, যেমন তা মুসলমানদের দখলেও নেই। মুসলমানরা যেমন সেখানে নিরাপদ নয়, কাফেররাও সেখানে নিরাপদ নয়। কাফেরদের দখলে যেহেতু নেই কাজেই তা দারুল হরব হয় কীভাবে?

সারাখসী রহ. জওয়াব দেন- এসব ভূখন্ড কাফেরদের দখলে না থাকলেও দারুল হরব। কেননা, দারুল হরব হওয়ার জন্য কাফেরদের হাতে থাকা জরুরী নয়।

মুসলমানদের হাতে না থাকলেই তা দারুল হরব। চাই তা কাফেরদের দখলে থাকুক বা না থাকুক। কেননা এসব ভূখন্ড এক সময় কাফেরদের হাতে ছিল। তখন সেগুলো দারুল কুফর ছিল। মুসলমানদের হাতে না আসলে সেগুলো দারুল কুফর হিসেবেই থেকে যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবী হয়ে আসলেন তখন সারা দুনিয়া কাফেরদের হাতে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের দ্বারা মানব জাতি ঈমানদার ও কাফের এ দুই দলে ভাগ হয়ে পড়ে। তিনি আল্লাহ তাআলার আদেশে মুমিনদেরকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। মদীনা দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম দারুল ইসলাম। আর বাকি সারা দুনিয়া দারুল কুফর হিসেবেই রয়ে যায়। এরপর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী যামানার মুসলমানগণ তরবারী হাতে বিশ্বের সকল প্রান্তে ছুটে যান। তাঁরা যেসব এলাকা বিজয় করে সেখানে ইসলামী শাসন কায়েম করতে পেরেছেন সেগুলো দারুল ইসলাম হয়েছে। আর যেগুলোতে ইসলামী শাসন কায়েম করতে পারেননি সেগুলো আগের মতো দারুল কুফরই রয়ে গেছে। সেগুলো বর্তমানে কাফেরদের হাতে থাকলেও যেমন দারুল হরব, কাফেরদের হাতে না থাকলেও আগে থেকে দারুল হরব ছিল সে হিসেবে এখনো তা দারুল হরব। মোট কথা- ইসলামী শাসনাধীন নয় এমন সকল ভূখন্ডই দারুল হরব। চাই তা বর্তমানে কাফেরদের হাতে থাক বা না থাক।

অর্থাৎ ঐ তৃতীয় প্রকার ভূখন্ড যা মুসলমানদের হাতেও নেই, কাফেরদের হাতেও নেই সেগুলোও যে দারুল হরব একথা বুঝানোর জন্যই তিনি বলেছেন –

**فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين**

"দারুল ইসলাম ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে।" অর্থাৎ দারুল ইসলাম হতে গেলে মুসলমানদের দখলে আসা আবশ্যক। যা মুসলমানদের দখলে নেই তা দারুল হরব। চাই তা কাফেরদর হাতে থাকুক বা না থাকুক। যখন সাব্যস্ত হলো, যে জায়গা থেকে কাঠ আনা হয়েছে তা দারুল হরব, তখন উক্ত কাঠ গনীমত বিবেচিত হবে এবং তা থেকে খুমুস নেয়া হবে।

এবার সারাখসী রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যটির প্রতি লক্ষ্য করি। তাহলেই বিষয়টি বুঝে এসে যাবে ইনশাআল্লাহ।

**باب : ما يقطع من الخشب ، وما يصاب من الملح وغيره**

**وإذا خرجت سرية بإذن الإمام لقطع الشجر فوصلوا إلى مكان يخاف فيه المسلمون ، ثم قطعوا الخشب وجاءوا به فهو غنيمة يخمس.) لأن الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون من جملة دار الحرب ، فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين ، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون. فإن قيل : كما أن المسلمين لا يأمنون في هذا المكان ، فكذلك أهل الحرب لا يأمنون فيه . قلنا : نعم ، ولكن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب ، فلا تصير دار الإسلام إلا بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه . وهذا ؛ لأن ما كان ثابتا فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره ، ولا يرتفع إلا باعتراض معنى هو مثله أو فوقه ، وإذا ثبت أنه من أرض أهل الحرب فما يكون فيه من الخشب يكون في يد أهل الحرب . فهذا مال أصابه المسلمون من أهل الحرب بطريق القهر، وهو الغنيمة بعينه .اهـ**

"[পরিচ্ছেদঃ যে কাঠ কাটা হয় এবং লবণ বা অন্য যা কিছু লাভ হয় (তার বিধান)ইমামের অনুমতিক্রমে কোন সারিয়্যা (দল) গাছ কাটতে বের হয়ে যদি এমন স্থানে পৌঁছে যেখানে মুসলমানরা ভয়ে থাকতে হয়, তারপর সেখান থেকে কাঠ কেটে নিয়ে আসে তাহলে তা গনীমত। তা থেকে (বাইতুল মালের জন্য) খুমুস (এক পঞ্চমাংম ) নেয়া হবে।] {কেননা যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ নয় তা দারুল হরবের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দারুল ইসলাম হচ্ছে ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের হাতে রয়েছে। আর তার (অর্থাৎ মুসলমানদের হাতে থাকার) আলামত হচ্ছে- সেখানে মুসলমানরা নিরাপদ।

যদি বলা হয় – ঐ ভূখন্ডে মুসলমানরা যেমন নিরাপদ নয়, দারুল হরবের অধিবাসীরাও সেখানে নিরাপদ নয় (তাহলে তা দারুল হরব হয় কীভাবে?)। (উত্তরে) বলবো – হ্যাঁ (কথা ঠিক যে, দারুল হরবের অধিবাসীরা সেখানে নিরাপদ

নয়।) কিন্তু (এর পরও তা দারুল হরবের অন্তর্ভুক্ত। কেননা,) এসব ভূখন্ড এক সময় হরবী কাফেরদের হাতে ছিল। কাজেই হরবীদের কতৃত্ব সর্ব দিক থেকে নি:শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তা দারুল ইসলাম হবে না। কারণ- যা এক সময় বিদ্যমান ছিল, তার কোন নিদর্শন বাকি থাকলেও তা বিদ্যমান রয়েছে বলেই ধরা হবে। তার সমপর্যায়ের বা তার চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু তার স্থান দখল না করে নেয়ার আগ পর্যন্ত তা দূরীভূত হবে না। অতএব, যখন তা হরবী কাফেরদের ভূখন্ড প্রমাণিত হলো, তখন তাতে যে কাঠ রয়েছে তা হরবীদের দখলে রয়েছে। অতএব, ইহা (অর্থাৎ কেটে আনা কাঠ) এমন মাল যা মুসলমানরা দারুল হরবের অধিবাসীদের থেকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লাভ করেছে। আর এটাই তো গনীমত।}"(শরহুস সিয়ারিল কাবীরঃ ৪/২৫২)

বি.দ্র. থার্ড ব্র্যাকেট [ ] যুক্ত অংশটুকু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য। সেকেন্ড ব্র্যাকেট { } যুক্ত অংশটুকু ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যা। আর ফার্স্ট ব্র্যাকেট ( ) যুক্ত অংশটুকু বুঝানোর সুবিধার্থে আমার নিজের থেকে লাগানো।

এবার প্রত্যেক বিবেকবানের নিকট আমার প্রশ্ন: ইনসাফের সাথে বলুন, ইমাম সারাখসী রহ. কি এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন- [যেসব রাষ্ট্র নামধারী মুসলমান শাসকদের দখলে আছে; যারা সেগুলোতে আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে; মুসলমান জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে তাদের সর্বচেষ্টা ব্যয় করেও শাসকদের দিয়ে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাস্তবায়ন করাতে পারছে না; বরং যারা সহীহ ত্বরীকায় শরীয়ত কায়েম করতে চাচ্ছে জঙ্গী, সন্ত্রাসী ইত্যাদী জঘন্য উপাধীতে ভূষিত করে তাদেরকে দমন করার জন্য তারা তাদের সর্ব শক্তি ব্যয় করছে; তারা একা তাদেরকে দমন করতে না পেরে আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তির সাথে জোট গঠন করেছে; নিজ দেশে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য যেমন তারা তাদের যাবতীয় সামর্থ্য ব্যয় করছে, বিশ্বের যে কোন প্রান্তের সম্ভাব্য যে কোন ইসলামী শক্তিকে দমন করতেও তারা তেমনই তাদের সর্বসাধ্য ব্যয় করছে; মোট কথা কুফরকে টিকিয়ে রাখতে এবং ইসলামকে মিটিয়ে দিতে যা তাদের সামর্থ্যে আছে তাই তারা ব্যয় করছে']

ঐ আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি যার হাতে আমাদের জান : ইমাম সারাখসী রহ. কি তাঁর এ বক্তব্যে এই ধরণের রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র বুঝাতে চাচ্ছেন ????

কোন বিবেকবান ব্যক্তি দাবি করতে পারবে ইমাম সারাখসী রহ. এই ধরণের কুফরী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে চাচ্ছেন ??

তিনি তো শুধু তাঁর এ বক্তব্যে দারুল হরব সংক্রান্ত একটা আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন । এসব কুফরী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলার কোন ইশারা ঈঙ্গিতও তো এতে নেই।

আর কীভাবেই বা তা সম্ভব অথচ তাঁর যামানায় কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। যেমনটা তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. নিজেও স্বীকার করেছেন। কাজেই তাঁর এ বক্তব্য থেকে কীভাবে বোঝা যাবে, কুফরী আইন দিয়ে পরিচালিত এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম ?! কুফরী আইন তো তাঁর যামানায় ছিলই না।

বরং তাঁর যামানায় যেহেতু পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম ছিল কাজেই 'মুসলমানদের হাতে থাকা'র দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য, মুসলমানরা তাতে নিরাপত্তার সাথে শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারে। অতএব, তাঁর বক্তব্য থেকে যেসব রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম রয়েছে সেগুলো দারুল ইসলাম বোঝা যায়। কুফর শাসিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না। বরং মাবসূতে তো তিনি পরিষ্কার বলেছেন, যে সব রাষ্ট্রে কুফরী বিধান জারি আছে সেগুলো দারুল হরব। তাঁর বক্তব্যটি লক্ষ্য করুন-

**فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين، فكانت دار حرب.**

[প্রত্যেক ঐ ভূখন্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা কাফেরদের হাতে। কাজেই তা দারুল হরব।](আল-মাবসূতঃ ১০/১১৪)

কাজেই সারাখসী রহ. এর বক্তব্য থেকে এসব কুফর শাসিত রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র দাবি করার কোন সুযোগ আছে বলে আমরা দেখছি না।

***

‘জামিউর রুমুজ’ এর বক্তব্যের পর্যালোচনাঃ

‘জামিউর রুমুজ’এ আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যু-৯৫০হি.) বলেন,

**دارالإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين وكانوا فيه آمنين**

“দারুল ইসলাম ঐ ভূখন্ড যাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর শাসন চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে।”(জামিউর রুমুজ:খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৫৬)

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. বলছেন, এই সংজ্ঞা থেকে বুঝে আসে: বর্তমান কুফরী আইন দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম। কেননা, এখানে বলা হয়েছে, ‘যেখানে ইমামুল মুসলিমীনের শাসন চলে’ তাই দারুল ইসলাম। বর্তমানে কুফরী আইন দ্বারা শাসনকারী শাসকরা হচ্ছেন আমাদের ইমামুল মুসলিমীন।

আর ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম দ্বারা তার যে কোন হুকুম হোক তাতে কোন অসুবিধা নেই। চাই ইসলামী হোক, চাই কুফরী হোক। চাই শিরকী হোক। কুফর শিরক যাই হুকুম তো চলছে ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম। কাজেই রাষ্ট্র দারুল ইসলাম।

পর্যালোচনাঃ তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. জামিউর রুমুজের পূর্ণ বক্তব্যের উদ্ধিতি দেননি। যতটুকু এনেছেন তার আগে-পরে আরো কথা আছে যা জামিউর রুমুজের উল্লিখিত অংশটুকুর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, যার পর আর কারো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।

জামিউর রুমুজের পূর্ণ বক্তব্যটি তুলে ধরলে পরিষ্করা হয়ে যেত এ বক্তব্যটি তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর দাবির পক্ষে দলীল হয় কি’না।

স্পষ্ট হয়ে যেত এখানে ইমামুল মুসলিমীন দ্বারা কোন ধরণের ইমাম উদ্দেশ্য। কোন ধরণের ইমামের শাসন চললে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হবে বলা হয়েছে এখানে।

আসুন আমরা জামিউর রুমুজের পূর্ণ বক্তব্যটির প্রতি লক্ষ্য করি। ‘কিতাবুল জিহাদ’ এর শুরুতে কয়েক পৃষ্ঠা পর আল্লামা কূহুসতানী রহ. বলেন-

**واعلم أن من أمهات هذا الباب معرفة الإمام والدارين. فالإمام من بايعه أهل الحل والعقد،ونفذ حكمه فيهم خوفا و قهرا. فلا يصير إماما إلا بهذين، كما في النظم وغيره. ودار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين ... كما في الكافي**

“ভাল করে জেনে রাখ, এ অধ্যায় (অর্থাৎ জিহাদ) এর ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়গুলোর অন্যতম (দু’টি বিষয়) হচ্ছে: ‘ইমাম’ (অর্থাৎ ইমামুল মুসলিমীন) এবং ‘দারাইন’ (তথা দারুল ইসলাম ও দারুল হরব) এর পরিচিতি জেনে নেওয়া। (শোনো) ইমাম হচ্ছেন তিনি, (১.) আহলুল হল ওয়াল আকদ যাকে বাইয়াত দিয়েছেন এবং (২.) তার ভয় ও দাপটের কারণে তার শাসন কার্যকর ভাবে চলছে।

এই দুই শর্ত পাওয়া যাওয়া ব্যতীত (কোন মুসলমান) ইমাম হতে পারবে না। যেমনটা ‘নজম’ ও অন্যান্য কিতাবে আছে। আর দারুল ইসলাম হচ্ছে ঐ ভূখন্ড যেখানে ইমামুল মুসলিমীনের শাসন চলছে।... যেমনটা ‘আল-কাফি’ তে বলা হয়েছে।” [জামিউর রুমুজঃ ৫৫৪]

এখানে আল্লামা কূহুসতানী রহ. প্রথমে ইমাম বলতে কাকে বুঝায় তা উল্লেখ করেছেন। তার পর বলেছেন,দারুল ইসলাম হচ্ছে ঐ ভূখন্ড যেখানে ইমামুল মুসলিমীনের শাসন চলছে।”

অতএব, বিষয়টা স্পষ্টই ছিল যে, ইমামুল মুসলিমীন দ্বারা যে কেউ উদ্দেশ্য নয়। ইমামুল মুসলিমীন দ্বারা ঐ ইমাম উদ্দেশ্য যাকে উম্মতে মুসলিমার আহলে হল্ ওয়াল আকদ বাইয়াত দিয়ে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর শরীয়ত কায়েমের জন্য মুসলমানদের প্রতিনিধিরুপে নির্বাচন করেছেন। এমন ইমামের শাসন চললে তখন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হবে। যারা কাফেরদের সাথে মিলে ইসলামী খেলাফতের পতন ঘটিয়ে কুফরী শাসন কায়েমের জন্য মুসলমানদের উপর চেপে বসেছে তাদের শাসন চললে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হয়ে যাবে একথা তিনি বলেননি। এমনকি পরবর্তীতে কেউ এসে যেন যে কাউকে ইমাম দাবি করে রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম দাবি করতে না পারে এ জন্য তিনি প্রথমেই ইমাম কাকে বলে তা পরিষ্করা

করে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকি উসমানী দা.বা. এত সুস্পষ্ট বিষয়টাও কেন জানি এড়িয়ে গেলেন। তারপর নিজে থেকেই জামিউর রুমুজের বক্তব্যটির এমন একটা ব্যাখ্যা দিলেন যা সুস্থ বিবেক-জ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। আমরা তাকি উসমানী দা.বা. এর মতো ব্যক্তিদের থেকে এমনটা আশা করিনি। উনাদের মত ব্যক্তিরা যদি এত সুস্পষ্ট বিষয়গুলোর এমন তাহরীফ ও অপব্যাখ্যা করেন তাহলে ওলামায়ে কেরামের উপর থেকে জনসাধারণের আস্থা উঠে যাবে। এর ফলে জনসাধারণ যে গোমরাহির শিকার হবে তার দায়ভার দুনিয়াতে না হোক আখেরাতে হলেও এমন বড় ব্যক্তিদের উপরই বর্তাবে।

***

ইমাম ও ইমামতের বিষয়টাকে আমরা চলুন আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করি।

এখানে তিনটা বিষয়ঃ

১. ইমামত।

২. ইমাম।

৩. ইমাম নির্বাচনকারী আহলে হল্ ওয়াল আকদ।

ইমামত কি?

আল্লামা ইবনে খালদূন রহ. বলেন-

**هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ... فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به**

“ইমামত হচ্ছে, শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় সকলকে চালানো যাতে করে তাদের পরকালীন কল্যাণও অর্জিত হয়, এবং ঐ সমস্ত দুনিয়াবী কল্যাণও অর্জিত হয় যেগুলোর পরিণতি শেষ পর্যন্ত আখেরাতের কল্যাণই দাঁড়ায়।... অতএব, মূলত ইমামত হচ্ছে- শরীয়ত প্রণেতা (তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিনিধি রুপে দ্বীন হেফাজত করা এবং দ্বীন অনুযায়ী দুনিয়া পরিচালনা করা।”[মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদূন : ১৯০]

অতএব, কুফরী শাসন দ্বারা শাসন করা কিছুতেই ইমামত হবে না। আর একে ইমামত না বলা গেলে এ ধরণের শাসককে ইমামও বলা যাবে না।

***

আহলে হল্ ওয়াল আকদ কারা?

আহলে হল্ ওয়াল আকদ হচ্ছেন উম্মাহর ঐ সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি যাদের পছন্দ গোটা উম্মাহর পছন্দ বলে গণ্য হবে।

তবে যে কেউ আহলে হল্ ওয়াল আকদ হওয়ার দাবি করার সুযোগ নেই। আহলে হল্ ওয়াল আকদ হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে।

আল্লামা মা ওয়ারদি রহ. বলেন-

**فَأَمَّا أَهْلُ الاِخْتِيَارِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ ثَلَاثَةٌ : أَحَدُهَا : الْعَدَالَةُ الْجَامِعَةُ لِشُرُوطِهَا .وَالثَّانِي : الْعِلْمُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا .وَالثَّالِثُ : الرَّأْيُ وَالْحِكْمَةُ الْمُؤَدِّيَانِ إِلَى اخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلْإِمَامَةِ أَصْلَحُ، وَبِتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ أَقْوَمُ وَأَعْرَفُ.اهـ**

“ইমাম নির্বাচনকারী (আহলে হল্ ওয়াল আক্দ) এর মাঝে তিন শর্ত বিবেচ্য:

**এক.** পরিপূর্ণ শর্তাবলী সহ আদালত তথা ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা বিদ্যমান থাকা।

**দুই.** পরিপূর্ণ শর্তাবলী বিশিষ্ট উপযুক্ত ইমাম নির্বাচনের পর্যাপ্ত ইলম থাকা।

**তিন.** ইমামতের সর্বাধিক উপযুক্ত এবং কল্যাণমূলক পরিচালনায় সর্বাধিক যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিটিকে নির্বাচন করতে পারার মত রায় ও হিকমত থাকা।”[‘আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ’- লিল মা ওয়ারদি রহ. : ১৭-১৮]

আহলে হল্ ওয়াল আকদ এর জন্য যে কাউকে ইমাম নির্বাচন করার সুযোগ নেই। ইমাম হতে নির্দিষ্ট যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আর তাদেরকেই কেবল ইমাম হিসেবে নির্বাচন করা যাবে।

আল্লামা মা ওয়ারদি রহ. বলেন-

**فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلاخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ شُرُوطُهَا فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَكْمَلَهُمْ شُرُوطًا وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إِلَى طَاعَتِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ.اهـ**

"ইমাম নির্বাচনের জন্য যখন আহলে হল্ ওয়াল আকদ একত্রিত হবে, ইমামতের উপযুক্ত পর্যাপ্ত শর্তবিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্থা যাছাই করে দেখবে। অত:পর তাদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে ইমামতের জন্য নির্বাচন করবে যার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। ইমামতের শর্তগুলো যার মাঝে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। দ্রুতবেগে লোকজন যার আনুগত্যের দিকে ছুটবে। যাকে বাইয়াত দেয়ার ব্যপারে লোকজন কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব করবে না।" [**'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ'- লিল মা ওয়ারদি রহ. : ২৫]**

ইমামের মধ্যে কি কি শর্ত পাওয়া যেতে হবে? ইমামের জন্য অনেক শর্ত। যেমন-

১. মুসলমান হওয়া।

২. পুরুষ হওয়া।

৩. বালেগ হওয়া।

৪. আদেল তথা নেককার হওয়া, ফাসেক না হওয়া।

৫. শরয়ী আদালতের কাজী তথা বিচারক হওয়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া।

৬. যে কোন পরিস্থিতিতে সঠিক সমাধান ও সিদ্ধান্ত দেয়ার মত যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া।

৭. সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অনুভূতি সম্পন্ন হওয়া।

৮. হুদুদ, কেসাস সহ শরীয়তের অন্যান্য আহকাম বাস্তবায়নে সক্ষম হওয়া।

৯. ইসলামের ভূমি হেফাজত করা এবং কাফের মুশরেকদের বিরোদ্ধে জিহাদ করার মত বিরত্ব ও সাহসের অধিকারী হওয়া।

১০. কুরাইশ বংশের হওয়া।

[দেখুন: ‘আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ’- লি আবি ইয়া’লা রহ. : ২০, ‘আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ’- লিল মা ওয়ারদি রহ. : ১৯-২০, ‘ফতোয়া শামী : ১/৫৪৭-৫৪৮]

শুধু যোগ্যতা থাকলে আর আহলে হল্ ওয়াল আক্দ বাইয়াত দিলেই ইমাম হয়ে যাবে না। ইমামতের মূল উদ্দেশ্য শরীয়ত বাস্তবায়ন। যদি জনসাধারণকে শক্তি বলে নিয়ন্ত্রণ করে শরীয়ত বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য না থাকে তাহলেও ইমাম হবে না।

‘আদ-দুররুল মুখতার’ এ বলা হয়েছে-

**(والإمام يصير إماما ) بأمرين : (بالمبايعة من الأشراف والأعيان، وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته. فإن بايع الناس) الإمام (ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه) عن قهرهم (لا يصير إماما)**

“দুই শর্ত পাওয়া যাওয়ার শর্তে ইমাম হক ও শরীয়ত সম্মত ইমাম বলে গণ্য হবেনঃ
(১). সম্ভ্রান্ত এবং নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বাইয়াত দেয়া।

(২). তার দাপট ও প্রভাব প্রতিপত্তির ভয়ে জনসাধারণের মাঝে তার শাসন কার্যকর হওয়া। যদি লোকজন ইমামের হাতে বাইয়াত দেয় কিন্তু তিনি তাদেরকে নিজ শক্তি বলে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তাদের মাঝে তার শাসন কার্যকর হয়নি, তাহলে তিনি ইমাম বলে গণ্য হবেন না।”[আদ-দুররুল মুখতার : ৪/২৬৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইমামতের ব্যাপারে বলেন-

**أَنَّهُ مَتَى صَارَ إِمَامًا، فَذَلِكَ بِمُبَايَعَةِ أَهْلِ الْقُدْرَةِ لَهُ ... وَإِنَّمَا صَارَ إِمَامًا بِمُبَايَعَةِ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْقُدْرَةِ وَالشَّوْكَةِ ... فَإِنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا تَحْصُلُ مَصَالِحُ الْإِمَامَةِ ... اهـ منهاج السنة:530/1**

“তিনি কখন ইমাম বলে গণ্য হয়েছেন? তা হয়েছে যখন ক্ষমতাশীলগণ তাকে বাইয়াত দিয়েছেন।... জুমহুরে সাহাবা যারা ক্ষমতা ও দাপটের অধিকারী তাদের

বাইয়াতের পরই কেবল তিনি ইমাম বলে গণ্য হয়েছেন। ... কেননা ইমামতের উদ্দেশ্য ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি যার দ্বারা ইমামতের কাংখিত কল্যাণ লাভ হবে।"[মিনহাজুস্ সুন্নাহ্ : ১/৫৩০]

বি.দ্র. বিশেষ পরিস্থিতিতে ফিতনা দমনের জন্য বা ইসলাম ও মুসলানদের কল্যাণে এমন ব্যক্তিকেও ইমাম বানানো যেতে পারে যার মাঝে ইমামতের সবগুলো গুণ পরিপূর্ণ নেই। তবে ভালভাবে লক্ষনীয় যে, এ কাজটি করা হবে শুধু ইসলামের কল্যাণে। যেমন, একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ দ্বীনদার, কিন্তু তিনি প্রভূত দাপটের অধিকারী নন। ফলে তিনি ইসলামের শত্রুদেরকে দমন করে ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদেরকে হেফাজত করতে পারবেন না। আরেকজন ব্যক্তি এমন আছেন যিনি পরিপূর্ণ দ্বীনদার নন, কিন্তু তার দাপটের দ্বারা তিনি ইসলামের শত্রুদেরকে দমন করে ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদেরকে হেফাজত করতে পারবেন। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ইমাম বানানো হবে। কেননা, প্রথম ব্যক্তির দ্বীনদারী তার নিজের উপকারে আসলেও তিনি ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদের কল্যাণ সাধনে সমর্থ্য নন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি পরিপূর্ণ দ্বীনদার না হওয়াটা তার নিজের জন্য ক্ষতিকর হলেও তার যে দাপট রয়েছে তা দ্বারা তিনি ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদের কল্যাণ সাধনে সমর্থ্য রাখে। আর ইমামত যেহেতু উম্মাহর সাথে সম্পৃক্ত বিষয় কাজেই তাদের কল্যাণকেই প্রাধান্য দেয়া হবে। অতএব, যার দ্বারা উম্মাহর দ্বীন ও দুনিয়ার সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হবে তাকেই ইমাম বানানো হবে। তবে বিশেষ জরুরত না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিপূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ইমাম বানাতে হবে।

যাহোক, ইমাম বানানো হবে ইসলাম হেফাজতের জন্য। আহলুল হল ওয়াল আকদ এমনই একজনকে নির্ধারণ করে তার হাতে বাইয়াত দেবেন। ইসলাম, ইসলামের ভূমি ও মুসলমানদের দ্বীনী ও দুনিয়াবি কল্যাণ সাধনের জন্য যার হাতে বাইয়াত দেয়া হবে তিনিই হবেন ইমামুল মুসলিমীন। আল্লামা কূহুসতানী রহ. এই ধরণের ইমামের শাসন চললে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র হবে বলেছেন। যারা কুফর বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের উপর চেপে বসেছে তারা আইম্মাতুল মুসলিমীন নয়। তারা তাগুত। তারা আইম্মাতুল কুফর। তাদের আনুগত্য করা হবে না, তাদের বিরোদ্ধে কিতাল করা হবে। আর তা চলবে-

**حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله**

যতক্ষণ না কুফর ও ফাসাদ দূর হয়ে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম হয়।

***

আল্লামা শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর বক্তব্যঃবর্তমান কুফরী আইন দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম প্রমাণ করার জন্য মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. তিনজন ইমামের বক্তব্য এনেছিলেন।

আমরা ইতিমধ্যে শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০ হি.) এবং 'জামিউর রুমুজ' এর প্রণেতা আল্লামা কূহুস্তানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখেছি এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলার মত কোন দলীল ঐ বক্তব্যগুলোর কোনটাতেই নেই।

এবার রয়ে গেল 'ফাতাওয়া শামী'র প্রণেতা আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.)এর বক্তব্যটি। আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যটিকে তিনি অত্যন্ত জোরদার একটা দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।

তিনি বলতে চাচ্ছেন-

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০) এবং আল্লামা কূহুস্তানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য থেকে তো এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। কিন্তু আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্টই বুঝা যায়।

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর বক্তব্যটি আবার লক্ষ্য করুন। তিনি বলছেন- [যদিও মুসলমানদের হাতে থাকার ফল এই হওয়ার কথা ছিল যে, উক্ত রাষ্ট্রে সকল আইন ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক চলবে, কিন্তু মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যদি পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি নাও থাকে, তবুও যদি ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকে তাহলে তাকে দারুল ইসলামই বলা হবে। ... সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় শুধু এতটুকু বলেছেন যে, তা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে। আর এ বিষয়টাকেই জামিউর রুমুজের বক্তব্যে এভাবে বলা হয়েছে, "তাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান)

এর শাসন চলে"। অর্থাৎ তার আইন কার্যকর হয়। ঐ আইন শরীয়তসম্মত কি'না তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। যেহেতু ঐ যামানায় কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে থাকা সত্বেও তার অধিবাসীরা তাতে ইসলামী আহকাম জারি করবে না তা কল্পনা করাও মুশকিল ছিল , ফলে ঐ যামনায় সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়নি, মুসলমানদের অধিনস্থ কোন রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি না থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে কি'না। বরং শুধু এতটুকু বলার উপর ক্ষ্যান্ত করা হয়েছে, "'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে এবং তাতে তাদেরই হুকুম চলে"। কিন্তু পরবর্তী যামানায় মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যখন এমন সূরত সামনে আসলো যে, 'কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের ক্ষমতাধীন কিন্তু তাতে ইসলামী শরীয়ত পরিপূর্ণ জারি নেই' তখন পরবর্তী যামানার ফুকাহাগণ তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন {যে, এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম}। যেমন- আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

**"وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلُّها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم و بعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، و لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها".**

"এ থেকে বুঝে আসে যে, শামের 'তাইমুল্লাহ্' পাহাড় যাকে 'দারুয পাহাড়'ও বলা হয় এবং এর অন্তর্গত আরো কতক শহর সবগুলোই দারুল ইসলাম। কেননা সেগুলোর শাসক যদিও দারুয বা নাসারা এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিচারকও রয়েছে যারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে, তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে কটুক্তি করে থাকে; কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলমান শাসকদের অধীনস্থ। দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুসলমান শাসকগণ যখনই চাইবেন তাদের উপর আমাদের আহকাম জারি করে দিতে পারবেন।"('রদ্দুল মুহতার', কিতাবুল জিহাদ, 'বাবুল উশরি ওয়াল খারাজ' এর একটু আগে 'ইসতি'মানুল কাফের' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬৬০, নতুন সংস্করণ।)

এ থেকে এ বিষয়টি আরোও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য মূল গুরুত্ব হলো তাতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ কব্জা ও ক্ষমতা আছে কি'না। যদি পরিপূর্ণ ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে ঐ রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলা হবে এবং তার উপর দারুল ইসলামেরই আহকাম জারি হবে। যদিও মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে তাতে পরিপূর্ণরুপে শরীয়ত জারি হতে না পারে।] [ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩২৫-৩২৭]

পর্যালোচনাঃ ইসলামী শাসন জারি না থাকার দ্বারা কি উদ্দেশ্য? তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. যামানাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগঃ আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) পর্যন্ত। দ্বিতীয় ভাগঃ আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর পর থেকে আল্লামা শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২হি.)পর্যন্ত। তিনি বলছেন, যামানার প্রথমার্ধে ইসলামী শাসন সম্পূর্ণ কায়েম ছিল। ইসলামী বিধান জারি না থাকার কল্পনাও তখন করা যেত না। আর দ্বিতীয়ার্ধে এমন অবস্থাও সৃষ্টি হয়েছে যে, কিছু বিধান জারি ছিল, আর কিছু বিধান জারি ছিলা না। তখন এই প্রশ্ন সামনে এসেছে, এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলা হবে কি হবে না? তখন ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলে গেছেন।

কাজেই বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে যদিও ইসলামী শাসন কায়েম নেই, (বরং তার বিপরীতে কুফরী শাসন কায়েম আছে) তবুও সেগুলো আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী দারুল ইসলাম।

এখানে আমাদের প্রশ্নঃ যামানার দ্বিতীয়ার্ধে যে ইসলামী বিধান কিছু জারি ছিল, আর কিছু জারি ছিল না এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য ?

নিম্নোক্ত দু'টি বিষয়ের কোন একটা বা উভয়টা হয়তো উদ্দেশ্য হবেঃ

**(এক).** 'বিচার ব্যবস্থা ইসলামীই ছিল, কিন্তু শাসকরা জুলুম করতো। অন্যায় অবিচার করতো। বিচারকরা কখনো কখনো শরীয়ত পরিপন্থি ফায়সালা দিয়ে ফেলতো।' কিন্তু এটা উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ-

১. এই ধরণের জুলুম অবিচার আল্লামা কূহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর পরে যেমন ছিল, আগেও তেমনি ছিল। কারণ আল্লামা কূহুসতানী রহ. উসমানী খেলাফতের যামানার মানুষ। উসমানী খেলাফত কায়েম হয়েছে ৯২৩ হিজরিতে।

এর আগে খেলাফতে রাশেদা, উমাইয়া খেলাফত এবং আব্বাসী খেলাফত অতিবাহিত হয়েছে। আর এ কথাতো সকলের নিকটই স্পষ্ট যে, খেলাফতে রাশেদার পর উমাইয়া এবং আব্বাসী উভয় যুগেই অনেক জুলুম অত্যাচার এবং অন্যায় অবিচার হয়েছে। বরং এসব যুগে যে জুলুম অত্যাচার হবে তা অনেক হাদিস থেকেও বুঝে আসে। হাজ্জাজের কথা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। কাজেই কূহুসতানীর যামানা পর্যন্ত জুলুম অত্যাচার এবং অন্যায় অবিচার ছিল না এ কথা সহীহ হতে পারে না।

২. এ ধরণের জুলুম অত্যাচার এবং অন্যায় অবিচার কূহুসতানীর যামানা পর্যন্ত নাও যদি থাকতো তবুও তা তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর দাবির পক্ষে দলীল হতো না। কারণ, তখন তো কেবল এতটুকু বুঝে আসতো- ইসলামী শাসন কায়েম থাকলে শুধু জুলুম অত্যাচার এবং অন্যায় অবিচারের কারণে রাষ্ট্র দারুল কুফর হয়ে যায় না। বরং দারুল ইসলামই থেকে যায়। কিন্তু উনার দাবি তো এটা না। উনার দাবি তো হচ্ছে-শাসন ব্যবস্থা যদি ইসলামী না হয়ে কুফরী হয় তবুও তা দারুল ইসলাম।

অতএব, এ ধরণের জুলুম অত্যাচার এবং অন্যায় অবিচার উদ্দেশ্য হতে পারে না। এবার তাহলে দ্বিতীয় বিষয়টা উদ্দেশ্য হবে। আর তা হচ্ছে-

**(দুই).** 'শাসন ব্যবস্থাই ইসলামী ছিল না। বরং বর্তমান যামানার মতো কুফরী শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল। শাসকরা আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত কুফরী সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতো।' যদি এটাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা দাবির পক্ষে দলীল হবে। কিন্তু এটাও উদ্দেশ্য হওয়া অসম্ভব। কেননা কূহুসতানী রহ. এর পর আল্লামা শামী রহ. পর্যন্ত মুসলমানদের অধীনস্থ কোন রাষ্ট্রে কখনো কুফরী শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল না। সর্বত্র ইসলামী শাসনই ছিল। তবে হ্যাঁ জুলুম অত্যাচার হয়েছে যা অস্বীকার করার মতো নয়।

তবে কূহুসতানী রহ(মৃত্যুঃ ৯৫০হি.) এর পূর্বে তাতারীদের যামানায় তাদের দখলকৃত রাষ্ট্রগুলোতে 'ইয়াসিক' নামক কুফরী সংবিধানের কুফরী শাসন ছিল। আর এ কারণে আইম্মায়ে কেরাম তাদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়েছেন। যা আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি।

অতএব, এ দ্বিতীয়টিও উদ্দেশ্য হওয়া অসম্ভব। যখন এ দু'টির একটিও উদ্দেশ্য হতে পারলো না, তখন তাঁর বক্তব্য- [যেহেতু ঐ যামানায় 'কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে থাকা সত্বেও তার অধিবাসীরা তাতে ইসলামী আহকাম জারি করবে না' তা কল্পনা করাও মুশকিল ছিল, ফলে ঐ যামনায় সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়নি যে, মুসলমানদের অধিনস্থ কোন রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি না থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে কি'না। বরং শুধু এতটুকু বলার উপর ক্ষ্যান্ত করা হয়েছে, "'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে এবং তাতে তাদেরই হুকুম চলে"। কিন্তু পরবর্তী যামানায় মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যখন এমন সূরত সামনে আসলো যে, 'কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের ক্ষমতাধীন কিন্তু তাতে ইসলামী শরীয়ত পরিপূর্ণ জারি নেই' তখন পরবর্তী যামানার ফুকাহাগণ তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন।] দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা আমাদের নিকট স্পষ্ট নয়।

***

এবার বাকি রয়ে গেল আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্য। আসুন আমরা যাছাই করে দেখি তাতে তাকি উসমানী সাহেবের পক্ষে কোন সমর্থন পাওয়া যায় কি'না। আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যের পর্যালোচনাঃ আল্লামা শামী রহ. এর এ বক্তব্যটি 'আদ-দুররুল মুখতার' এর একটি ইবারতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এসেছে।

'আদ-দুররুল মুখতার' এ বলা হয়েছে-

**(لا تصير دار الاسلام دار حرب إلا) بأمور ثلاثة: (بإجراء أحكام أهل الشرك، وباتصالها بدار الحرب، وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالامان الاول (على نفسه**

[তিন শর্ত পাওয়া যাওয়া ব্যতীত দারুল ইসলাম দারুল হরব হবে নাঃ কাফেরদের বিধান জারি করে দেয়া, দারুল হরবের সাথে মিলিত হওয়া, কোন মুসলমান বা কোন যিম্মি তার প্রথম আমানের দ্বারা নিজের ব্যাপারে নিরাপদ না থাকা।] [আদ-দুররুল মুখতারঃ ৩৩৮]

এখানে দারুল ইসলাম কখন দারুল হরব হয় সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। দারুল ইসলাম কখন দারুল হরব হয় এ ব্যাপারে আবু হানিফা রহ. এবং সাহেবাইন রহ. এর মাঝে কিছুটা ইখতিলাফ আছে।

রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. তাঁর ফতোয়ায় বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, মূলত আবু হানিফা রহ. এবং সাহেবাইন রহ. এর মাঝে তেমন কোন ইখতিলাফ নেই। কাফেররা দারুল ইসলামের কোন ভূখন্ড দখলা করে নিয়ে তাতে কুফরী বিধান জারি করে দিলে এবং মুসলমানরা তা উদ্ধার করে তাতে ইসলামী বিধান জারি করতে সক্ষম না হলে সকলের মতেই তা দারুল হরব হয়ে গেছে। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই।

তবে হ্যাঁ, কাফেররা দারুল ইসলামের যে ভূখন্ড দখল করে নিয়েছে তা যদি দারুল ইসলামের সাথে মিলিত হয় এবং কাফেররা এতটুকু দুর্বল এবং মুসলমানরা এত শক্তিশালী হয় যে, দারুল ইসলাম থেকে মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে অচিরেই কাফেরদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দিতে পারবে তাহলে আবু হানিফা রহ. এর মতে কাফেররা সেখানে কুফরী বিধান জারি করে দিলেও তা দারুল হরব হবে না। আগের মত দারুল ইসলামই থেকে যাবে। কেননা, কাফেররা যেহেতু সেখানে টিকে থাকতে পারবে না বরং অতিশীঘ্রই তাদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দেয়া হবে, কাজেই সেখানে মুসলমানদের শক্তি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি এবং কাফেরদের শক্তি পরিপূর্ণ কায়েম হয়নি। ফলে এখনই তাকে দারুল হরব হয়ে গেছে বলে হুকুম দেয়া হবে না।

আর সাহেবাইন সহ জুমহুর আইম্মার মতে কাফেররা তাতে কুফরী বিধান জারি করে দিলেই তা দারুল হরব হয়ে যাবে। যদিও কাফেররা তাতে টিকে থাকার সামর্থ্য না রাখে, বরং মুসলমানরা অতিশীঘ্রই তাদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দেবে। কাফেরদেরকে সেখান থেকে হটানোর পূর্ব পর্যন্ত তাকে দারুল হরব বলে ধরা হবে এবং তাতে দারুল হরবের বিধানই জারি হবে।

এই মতভেদপূর্ণ সূরতে তারজীহ তথা প্রাধান্য দেয়া হবে কার অভিমতকে? সাহেবাইনের অভিমতকে না'কি আবু হানিফা রহ. এর অভিমতকে? হানাফী ফুকাহায়ে কেরাম এমতাবস্থায় আবু হানিফা রহ. এর অভিমতকে তারজীহ দিয়েছেন। অর্থাৎ কাফেরদেরকে সেখান থেকে হটানোর পূর্ব পর্যন্ত তাকে দারুল ইসলাম বলে ধরা হবে এবং তাতে দারুল ইসলামের বিধানই জারি হবে।

আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যের প্রেক্ষাপটঃ হুবহু এমনই একটা সূরত আল্লামা শামী রহ. এর যামানায় দেখা দেয়। উসমানী খেলাফতের অধীনস্থ শামের তাইমুল্লাহ

পাহাড় এবং তার আশপাশের কয়েকটা শহর সেখানকার যিম্মি কাফেররা তাদের যিম্মার চুক্তি ভঙ্গ করে তা দখল করে নেয় এবং তাতে তাদের কুফরী বিধান জারি করে দেয়। [উল্লেখ্য যে, আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্য থেকে দখলদার কাফেররা যিম্মি হওয়াই বুঝে আসছে। তবে সাথে মুসলমান নামধারী যিনদিকরাও ছিল বলে মনে হচ্ছে]

সাহেবাইন সহ অন্যান্য ইমামগণের অভিমত অনুযায়ী তা দারুল হরব হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলটা কোন দারুল হরবের সাথে মিলিত ছিল না। বরং চতুর্দিক থেকেই তা দারুল ইসলাম দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অর্থাৎ তা দারুল ইসলামের অভ্যন্তরস্থ একটা এলাকা ছিল যাতে নাসারা কাফেররা যিম্মি হিসেবে থাকতো। সাথে সাথে দখলদার কাফেররা এত দুর্বল আর মুসলমানরা এত শক্তিশালী ছিল যে, মুসলমান শাসকগণ চাইলে যে কোন সময় কাফেরদের দখলদারিত্ব খতম করে দিয়ে তাতে ইসলামী বিধান জারি করে দিতে পারেন। এমতাবস্থায় সাহেবাইন ও অন্যান্য ইমামগণের মতে তা দারুল হরব হয়ে গেছে। কিন্তু আবু হানিফা রহ. এর মতে এখনো তা দারুল হরব হয়নি। বরং দারুল ইসলামই রয়ে গেছে। আল্লামা শামী রহ. এখানে অন্যান্য হানাফী ফকীহগণের অনুসরণ করত আবু হানিফা রহ. এর অভিমতকে তারজীহ দিয়ে উক্ত এলাকাকে দারুল ইসলাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যটি লক্ষ্য করুন। 'আদ-দুররুল মুখতার' এর পূর্বোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

**(قوله وباتصالها بدار الحرب) بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام ... قلت: وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها .اهـ**

['আদ-দুররুল মুখতার' এর বক্তব্য: "দারুল হরবের সাথে মিলিত হওয়া" , অর্থাৎ সেটি এবং দারুল হরবের মাঝখানে দারুল ইসলামের কোন শহর প্রতিবন্ধক না থাকা। ... আমি বলি: এ থেকে বুঝে আসে, শামের 'তাইমুল্লাহ্' পাহাড় যাকে

‘দারুয পাহাড়’ও বলা হয় এবং এর অন্তর্গত আরো কতক শহর সবগুলোই দারুল ইসলাম। কেননা সেগুলোর শাসক যদিও দারুয বা নাসারা এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিচারকও রয়েছে যারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে, তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে কটুক্তি করে থাকে; কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলমান শাসকদের অধীনস্থ। দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুসলমান শাসকগণ যখনই চাইবেন তাদের উপর আমাদের আহকাম জারি করে দিতে পারবেন।] [‘রদ্দুল মুহতার’, কিতাবুল জিহাদ, ‘বাবুল উশরি ওয়াল খারাজ’ এর একটু আগে ‘ইসতি’মানুল কাফের’ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৫]

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করুনঃ উসমানী খেলাফত ইউরোপ ও এশিয়া সহ দুনিয়ার বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। উসমানী খেলাফতের ভয়ে কাফেররা সবসময় ভীত থাকত। আল্লামা শামীর যামানায় খেলাফতের শক্তি কিছুটা কমে এলেও তখনও তা পৃথিবীর অন্যতম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। খেলাফতের সীমান্তবর্তী কোন এলাকা যদি কাফেররা দখল করে নেয় তাহলে তা পুনরুদ্ধার করা হয়তো মুসলানদের জন্য কঠিন। কিন্তু দারুল ইসলামের একেবারে ভিতরের কোন এলাকাতেই যদি সেখানকারই যিম্মি কাফেররা সাময়িক সময়ের জন্য যিম্মার চুক্তির তোয়াক্কা না করে তাদের উপর আরোপিত ইসলামী বিধি বিধান না মেনে তাদের নিজেদের ধর্মের বিধান মানতে শুরু করে এবং সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করতে শুরু করে, তাহলে মুসলমানদের জন্য কাফেরদের এই সাময়িক দখলদারী খতম করা কোনই কঠিন ব্যাপার নয়। বরং খেলাফতের শক্তির তুলনায় তো এসব কাফের হাতির সামনে পিপড়ার সমানও নয়। এ হিসেবে কাফেররা তাতে কুফরী বিধান জারি করে দিলেও মুসলমানদের শক্তি সেখানে পূর্ণই বহাল রয়েছে। কাজেই উক্ত এলাকাকে দারুল ইসলাম বলা অযাচিত কোন মত হবে না। এ কারণেই আল্লামা শামী রহ. একে দারুল ইসলাম ফতোয়া দিয়েছেন।

কিন্তু এর পরও মনে রাখতে হবে, সাহেবাইন সহ অন্যান্য ইমামগণের মতে তা দারুল হরব হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তা উদ্ধার করার মত কোন শক্তি সামর্থ্য যদি মুসলমানদের না থাকে তাহলে তা দারুল হরহ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। এ ব্যাপারে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর ফতোয়ায় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

কিন্তু আল্লামা শামী রহ. তাঁর এই বক্তব্যে এ কথা কোথায় বুঝাচ্ছেন-

[যেসব রাষ্ট্র নামধারী মুসলমান শাসকদের দখলে আছে; যারা সেগুলোতে আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট পরিচালনা করছে; মুসলমান জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে তাদের সর্বচেষ্টা ব্যয় করেও শাসকদের দিয়ে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাস্তবায়ন করাতে পারছে না; বরং যারা সহীহ ত্বরীকায় শরীয়ত কায়েম করতে চাচ্ছে জঙ্গী, সন্ত্রাসী ইত্যাদী জঘন্য উপাধীতে ভূষিত করে তাদেরকে দমন করার জন্য তাদের সর্ব শক্তি ব্যয় করছে; তারা একা তাদেরকে দমন করতে না পেরে আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তির সাথে জোট গঠন করেছে; নিজ দেশে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য যেমন তারা তাদের যাবতীয় সামর্থ্য ব্যয় করছে, বিশ্বের যে কোন প্রান্তের সম্ভাব্য যে কোন ইসলামী শক্তিকে দমন করতেও তারা তেমনই তাদের সর্বসাধ্য ব্যয় করছে; মোট কথা কুফরকে টিকিয়ে রাখতে এবং ইসলামকে মিটিয়ে দিতে যা তাদের সামর্থ্যে আছে তাই তারা ব্যয় করছে'] এমন সব রাষ্ট্র সবগুলো দারুল ইসলাম ??!!

শামীর বক্তব্যে এর কোন আলোচনা বা ইশারা ঈঙ্গিতও কি আছে ?

হ্যাঁ, যদি এমন হতো, বর্তমানে দুনিয়া জুড়ে উসমানী খেলাফতের মত বিশাল এক খেলাফত কায়েম আছে। আর খেলাফতের একেবারে অভ্যন্তরস্থ কোন এলাকা কাফেররা বা মুরতাদরা দখল করে নিয়েছে। যেখান থেকে কাফের মুরতাদদের দখলদারী খতম করা মুসলমানদের জন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তাহলে আল্লামা শামী রহ. এর ফতোয়া অনুযায়ী তাকে দারুল ইসলাম বলা যেত।

কিন্তু বর্তমান মুরতাদদের দখলকৃত কুফরী আইন দ্বারা শাসিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার কোন প্রমাণ বা আলোচনা আল্লামা শামী রহ. এর এ বক্তব্যে নেই।

কাজেই আল্লামা শামী রহ. এর এ বক্তব্য থেকে বর্তমান মুরতাদদের দখলকৃত কুফরী আইন দ্বারা শাসিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র দাবি করা যুক্তিযুক্ত নয়।

***

শেষ কথাঃ দারুল ইসলাম ও দারুল হরব সংক্রান্ত আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহ এবং সেগুলোর সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র দেখার পর বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম বলার কোন সুযোগ আছে বলে আমার কাছে মনে হয়নি। বিশেষত তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. আইম্মায়ে কেরামের যেসব বক্তব্য উল্লেখ করেছেন সেগুলো থেকে কোনভাবেই এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম প্রমাণিত হয় না।কাজেই আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর দাবিকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারছি না। আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে এমনই মনে হয়েছে। হয়তো অন্যদের মত আমার মতের সাথে নাও মিলতে পারে। হয়তো এ কারণে আমার সমালোচনাও হতে পারে। তবে সমালোচক ভাইদের প্রতি আবেদন থাকবে আপনারা দলীলের আলোকে সমালোচনা করবেন। শরীয়তের দলীল চারটিঃ কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস।কুরআন, হাদিস বা ইজমার মুখালিফ-বিরোধী হলে কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।তদ্রুপ কোন ব্যক্তির কথাও দলীল নয়।শরীয়তের চার দলীলের আলোকে যাচাই বাছাইয়ের পর যদি সঠিক বলে প্রমাণিত হয় তাহলে গ্রহণ করা হবে, নতুবা গ্রহণ করা হবে না। এ আলোকেই আপনারা কথা বলবেন।তবে দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের বিষয়টা যেহেতু বর্তমান যামানার একটা জরুরী বিষয় কাজেই এ ব্যাপারে গবেষণা-পর্যালোচনা করে অতি শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা- এই ফিতনার যামানায় তিনি যেন আমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম রাখেন। সব ধরণের ফিতনা থেকে যেন আমাদেরকে হিফাজত করেন। আমীন!

**وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين**

আপনাদের নেক দু'আয় মুজাহিদীনে কেরামকে ভুলে যাবেন না।

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫৩৭

# বাংলাদেশ কি দারুল ইসলাম নাকি দারুল হারব?

Munshi Abdur Rahman

Moderator

১০-২৮-২০১৯

দারুল ইসলামের সংজ্ঞা ও পরিচয়

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন: 'দারুল ইসলাম এমন ভূমি, যা মুসলমানদের শাসনাধীন। যেখানে ইসলামের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মুসলমানরা নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করে।'[১] সেই ভূমিরা অধিবাসীরা যদি সকলেই মুসলমান হয়, কিংবা সকলেই ইসলামের শাসনব্যবস্থা মান্যকারী অমুসলিম (জিম্মি) হয় অথবা সেখানে উভয় গোষ্ঠীরই উপস্থিতি থাকে—এসবের বিধান সমানই হবে। উপরিউক্ত শর্তগুলো পাওয়া গেলে সর্বাবস্থায় তা দারুল ইসলাম হিসেবেই পরিগণিত হবে।

ইসলাম আসার আগে তো আর দারুল ইসলাম বলতে কিছু ছিল না। সব ছিল দারুল হারব। তো এই দারুল হারব কীভাবে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়, আসুন, প্রথমে সে বিষয়টা জেনে নিই। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর আস-সিয়ারুল কাবির এবং সারাখসি রহ. প্রণীত তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোকে প্রতিভাত হয়—দারুল হারব তিনভাবে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয় :

১. দারুল হারবের কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের শহরেই অবস্থান করে, তবে তাদের ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে তা দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।[২]

তেমনি যদি মুশরিকরা সেই শহর বিজয় করে নেয়, এরপর মুসলমানরা পুনরায় তা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং মুশরিকরাও সেখান থেকে বিতাড়িত হয় আর মুসলমানরাও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে, তবে তা দারুল ইসলাম হিসেবেই পরিগণিত হবে। কারণ, যখন মুশরিকরা তা দখলে নিয়ে নিয়েছিল, তখন

[১] হাকিম শহিদ রহ. আল-কাফি গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে এই সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।

[২] শারহুস সিয়ারিল কাবির, সারাখসি : ১/২৪৯-২৫০

তা দারুল হারব হয়ে গিয়েছিল। এরপর যখন মুসলমানরা তা বিজয় করে নিল এবং সেখানে বসবাসের সংকল্প করল, তখন পুনরায় তা দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছে।[৩]

২. দারুল হারবের কোনো ভূমি বিজিত হলে এবং সেখানে ইসলামের আইনকানুন ও বিধিবিধান বাস্তবায়িত হওয়ার ঘোষণা হলেও তা দারুল ইসলাম হিসেবে বিবেচিত হয়। সারাখসি রহ. বলেন :

'মুসলমানরা যদি শত্রুদের কোনো ভূমি বিজয় করে এবং তা তাদের পূর্ণ দখলে আসে, সেখানে অবস্থিত হারবি অধিবাসীরা পলায়ন করে, তবে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে।'

আল্লামা হাসকাফি রহ. বলেন : 'এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই যে, ইসলামের কিছু আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারাই দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।'[৪] বোঝা গেল, ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত না হলে শুধু দেশ বিজয়ের দ্বারাই তা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে না। তেমনি হারবিরা পূর্ণরূপে বিতাড়িত না হলে, তাদের ক্ষমতা-প্রতাপ পুরোপুরি দূর না হলে তা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা, ইসলামি ভূমি হওয়ার জন্য প্রথমে কুফরের মূলোৎপাটন জরুরি।[৫] **[৫]**

সারাখসি রহ.-এর কথায় ফিরে যাই। এরপর তিনি বলছেন :

---

[৩] প্রাগুক্ত; আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা, মাওয়ারদি : ১৩৭

[৪] আদ-দুররুল মুনতাকা শারহুল মুলতাকা : ১/৬৩৮

[৫] শারহুস সিয়ারিল কাবির : ৩/১০০৪-১০০৬, ৪/১২৫৩, ১২৫৭; আল-মাবসুত : ১০/২৩, ১১৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ২/২৩২; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া (হিন্দিয়ার ষষ্ঠ খণ্ডের টীকায় সংযোজিত) : ৩/৩১১-৩১২

‘মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশ দারুল ইসলাম হয়ে যাবে। মুশরিকদের ওপর মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তারা ‘জিম্মি’ বলে গণ্য হবে।” (আর হারবি থাকবে না।)।[৬][৬]

বোঝা গেল, কোনো দেশ দারুল ইসলাম হতে পারে; যদিও তার সকল নাগরিক অমুসলিম হয়—যদি তাতে ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে, নাগরিকরা অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র ইসলামি শাসনক্ষমতার অধীন থাকে। তেমনই কোনো দেশ দারুল হারব হতে পারে; যদিও তার অধিকাংশ নাগরিক মুসলিম হয়—যখন তাতে কুফরের শাসন ও বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, নাগরিকরা মুসলিম হলেও রাষ্ট্র কুফরি শাসনক্ষমতার অধীনতাভুক্ত থাকবে। এ জন্যই ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন :

‘যদি মুসলমানদের কোনো সৈন্যদল দারুল হারবে প্রবেশ করে খলিফার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোনো আমিরের তত্ত্বাবধানে থাকে, এরপর তারা দারুল হারবের কোনো শহরে ঢুকে তার অধিবাসীদের সামনে ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপন করে, আর তারা ইসলাম গ্রহণ করতে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানিয়ে দেয়, ফলে মুসলিম সৈন্যদল তাদেরকে জিযয়া প্রদান করার নির্দেশ দেয়, আর তারাও তাদের এ আহ্বান মেনে নেয়... এবং তারা বলে, “তোমরা আমাদেরকে এই অঙ্গীকার দাও যে, আমরা স্থায়ীভাবে এই ভূমিতেই থাকব।” এমনকি এরপর যতক্ষণ মুসলমানরা তাদের সঙ্গে বাস করবে, হারবিদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং হারবিরাও তাদের ওপর কোনোভাবে চড়াও হওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকে, তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই যে, আমির তাদেরকে ‘জিম্মি’ বানিয়ে নেবেন এবং তাদের ওপর একজন আমির নির্ধারণ করে দেবেন, যিনি তাদের ওপর ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাদের ওপর ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দ্বারাই তারা জিম্মি হিসেবে এবং সেই দেশ দারুল ইসলাম হিসেবে সাব্যস্ত হবে। ...অবস্থা যদি এমন হয় যে, মুসলমানরা জিম্মিদের সহযোগিতা ছাড়া ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হয়, তবে আমির তাদের ‘জিম্মা’

---

[6] শারহুস সিয়ারিল কাবির : ৫/২১৬, ২১৯১, ২১৯৭; আল-মাবসুত : ১০/২৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ২/২৩২; আদ-দুররুল মুখতার : ৪/১৭৫; আদ-দুররুল মুনতাকা : ১/৬৩৪; রাওজাতুত তালিবিন : ৫/৪৩৩; তুহফাতুল মুহতাজ : ৯/২৬৯

চুক্তি গ্রহণ করবেন না। কেননা যখন জিম্মিদের সাহায্য-সন্তুষ্টি ছাড়া মুসলমানরা ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হবে, তখন আদতে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করছে জিম্মিরা (মুসলমানরা নয়)। অথচ ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগ করবে একমাত্র মুসলিমরা।'[৭]

এর আলোকে বলা যায়, যেসব দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা নেই, যদিও তাতে মুসলমানরা ওয়াজ-মাহফিল করতে পারে, ঈদের নামাজ-জামাআতের নামাজ ইত্যাদি আদায় করতে পারে, তা দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হবে না।[৮]

৩. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন : যদি জিম্মিরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং মুসলমানদের পরাজিত করে দারুল ইসলামের দখল নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়, তাহলে সেখানে তাদের শাসন চলতে পারে, যদি মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে সেখানে বসবাস করতে পারে। কেননা এ ক্ষেত্রে তা দারুল হারব হয়ে যায়নি। দেখছ না, মুসলমানরা সেখানে নিরাপদ! এটা আদতে দারুল ইসলামই, যদিও আজ তার এই অবস্থা।[৯]

আল্লামা সারাখসি রহ. বলেন : যেখানে মুসলমানরা নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করতে পারে না, তা দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত। কেননা দারুল ইসলাম সেই ভূখণ্ড, যা মুসলমানদের হাতে রয়েছে। আর এর বাহ্যিক আলামাতই হলো মুসলমানদের যথাযোগ্য নিরাপত্তা।[১০]

**হাকিম শহিদ রহ. বলেন :** 'দারুল ইসলাম তা, যাতে মুসলমানদের শাসকের ক্ষমতা চলে।'[১১]**[১১]**

---

[৭] আস-সিয়ারুল কাবির মাআ শারহিস সারাখসি : ৫/২১৯১-২১৯৩; মাজমাউল আনহুর : ১/৬৫৯; আহকামুদ দিয়ার : ১৮-২০

[৮] মাজাল্লাতুল কানুন ওয়াল ইকতিছাদ, জিলহজ সংখ্যা, ১৩৫৪ হিজরি, পৃ. ২০৩, তা'লিক : ১

[৯] কিতাবুল আসল, সিয়ার অধ্যায়, ইমাম মুহাম্মাদ : ২১৭

[১০] শারহুস সিয়ারিল কাবির : ৪/১২৫৩; আল-মাবসুত : ১০/৯৩, ১১৪

[১১] দারুল ইসলাম সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন—বাদায়িউস সানায়ি : ৯/৪৩৭৪; আদ-দুররুল মুনতাকা : ১/৬৩৪; কাশশাফ : ২/২৫৬; আল-কুল্লিয়্যাত, কাফাবি : ২/৩৪১; আল-মুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত : ২/১৫৩; উসুলুদ দীন : ২৭০; নিহায়াতুল মুহতাজ : ৮/৮২; আসনাল মাতালিব : ৪/২০৪;

দারুল হারব মানে যুদ্ধবিধ্বস্ত বা যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্র নয়। অনেকে ভাবেন, দারুল হারব শুধু এমন রাষ্ট্রকেই বলা হয়, যা কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। বাস্তবে বিষয়টা এমন নয়। কোনো ভূখণ্ডে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হয় আর কোথাও কুফরি এবং শিরকি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল হারব বলা হয়। দারুল হারবকে অন্য শব্দে 'দারুল কুফর', 'দারুশ শিরক' ইত্যাদিও বলা হয়। এসব পরিভাষার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ফকিহগণ দারুল হারবের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

**এ জন্যই সারাখসি রহ. বলেন:**'দারকে আমাদের দিকে বা তাদের দিকে নিসবত করাটা মূলত ক্ষমতা এবং প্রাধান্যতার বিচারে।'[১২]

এ বিষয়টাকেই আল্লামা কাসানি রহ. আরও বিস্তারিত করে এভাবে বলেছেন: 'কোনো রাষ্ট্রে কুফরের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হলে তা দারুল কুফর হয়ে যায়। ...রাষ্ট্র শুধু কুফরের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই দারুল কুফর বলে গণ্য হয়।'[১৩]

বোঝা গেল, কোনো রাষ্ট্র দারুল হারব (অন্য শব্দে : দারুল কুফর, দারুশ শিরক) হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য লড়াই-যুদ্ধ চলমান থাকা অপরিহার্য নয়। এ জন্যই হাম্বলি ফকিহগণ বলেন : 'হারবি শব্দটা হারবের দিকে সম্পর্কিত। হারব অর্থ : কিতাল (লড়াই)। তেমনি এর অর্থ দূরত্ব এবং বিদ্বেষও। তো দারুল হারব অর্থ হলো এমন রাষ্ট্র, যার সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্ব কিংবা মুসলমানদের প্রতি রয়েছে যার বিদ্বেষ। হারবিকে হারবি এই দ্বিতীয় অর্থ—তথা দূরত্ব এবং বিদ্বেষ—এর বিচারেই বলা হয়। কার্যত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা জরুরি নয়।[১৪]

---

আলমু'তামাদ ফি উসুলিদ দীন : ২৭৬; আহকামু আহলিজ জিম্মাহ : ১/৫; আত-তাশরিউল জিনায়ি : ১/২৭৫-২৭৬

[১২] আল-মাবসুত, সারাখসি : ১০/১১৪

[১৩] বাদায়িউস সানায়ি : ৯/৪৩৭৫; আহকামুদ দিয়ার, আবিদ সুফয়ানি : ১৫

[১৪] আলমুতলি' আলা আবওয়াবিল মুকনি', বা'লি : ২২৬

## দারুল হারবের সংজ্ঞা

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন: 'দারুল হারব এমন ভূখণ্ড, যেখানে শিরকের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত এবং যার ওপর হারবিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত।'[১৫]

এ জন্যই তিনি বলেন: 'দারুল হারবের কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে যদি মুসলমানরা এ মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, সেখানে তারা ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত করবে না, তবে তা দারুল হারবই থেকে যাবে।'

সারাখসি রহ. এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন: 'কেননা কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হয় সেখানে ইসলামের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রয়োগ করার দ্বারা। উল্লিখিত ভূখণ্ডে তো মুসলমানদের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রয়োগ করা হয়নি। তাই তা দারুল হারব থাকবে।'

তিনি বলেন : 'দারুল হারব তা-ই, যেখানে কাফিরদের আইনকানুন চলে।'[১৬]

তিনি আরও বলেন : 'যে স্থানে মুসলমানরা নিজেদের ব্যাপারে নিরাপদ নয়, তা দারুল হারব। কেননা দারুল ইসলাম তা-ই, যা মুসলমানদের শাসনাধীন। আর এর বাহ্যিক নিদর্শন হচ্ছে, সেখানে মুসলমানরা নিরাপদে বাস করে।'[১৭]

এ জন্যই অনেক হানাফি ফকিহ এভাবে বলেছেন : 'দারুল হারব তা, যেখানে কোনো কাফির রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ চলে কিংবা যেখানকার মুসলমানরা কাফিরদের ভয়ে ভীত থাকে।'[১৮]

হানাফি মাজহাবের ইমামগণই নন; অধিকাংশ ইমামই দারুল হারবের সংজ্ঞা এভাবেই দিয়েছেন। ইমাম মালিক রহ. বলছেন : 'মক্কা সে সময় দারুল হারব ছিল; কেননা সেখানে তখন জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধান কার্যকর ছিল।[১৯],

---

[১৫] আস-সিয়ারুল কাবির মা'আ শারহিস সারাখসি : ১/২৫১; ৪/২০৭০, ২১৯৭; আল-মাবসুত : ১০/১১৪; বাদায়িউস সানায়ি : ৯/৪৩৭৫; আদ-দুররুল মুনতাকা : ১/৬৩৪; মাজমাউল আনহুর : ১/৬৫৯

[১৬] শারহুস সিয়ারিল কাবির : ৫/২১৬৫; আল-মাবসুত : ১০/১১৪

[১৭] শারহুস সিয়ারিল কাবির : ৪/১২৫৩

[১৮] আদ-দুররুল মুনতাকা : ১/৬৩৪; কাশশাফুল ইসতিলাহাত : ২/২৫৬; আল-কুল্লিয়্যাত : ২/৩৪১

এ মাসআলায় মালেকি, শাফেয়ি, হাম্বলি সবার বক্তব্য প্রায় একই ধরনের।[২০]

পরবর্তী আলিমগণের মধ্যে উস্তাদ আব্দুল কাদির আওদা সুন্দর লিখেছেন, :'দারুল হারব শব্দটি প্রত্যেক এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা মুসলমানদের শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রবেশ করেনি, কিংবা যেখানে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত নয়। এ রাষ্ট্রগুলো একই সরকারের পরিচালনাধীন থাক কিংবা ভিন্ন ভিন্ন সরকারের অধীন—এ ক্ষেত্রে সবই সমান। তার স্থায়ী নাগরিকদের মধ্যে মুসলমানরা থাক বা না থাক—এসবই সমান। যতদিন তারা ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম থাকবে, ততদিন তা দারুল হারবই থেকে যাবে।'[২১] [২১]

## হারবির পরিচয়

অনেকের ধারণা, হারবি তাকেই বলে, যে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। শব্দ থেকেও অনেকটা এ সংশয় হয়। তবে ফকিহগণের পরিভাষায় হারবি তিন শ্রেণি :

১. যারা বাস্তবে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে যারা পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করার প্রয়াসে সর্বদা তৎপর।

২. যারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে রেখেছে। তাদেরকে হয়রানি করে। জান-মাল-সম্ভ্রম লুট করে। অর্থনৈতিকভাবে মুসলমানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে রাখে। কিংবা মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফেরানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত। অথবা যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত, তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে।

৩. যারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধেও লিপ্ত নয়, যারা যুদ্ধে লিপ্ত তাদেরও সহযোগী নয়; কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোনোপ্রকার চুক্তি নেই।

---

[১৯] আল-মুদাওয়ানা, রিওয়ায়াতু সুহনুন : ২/২২

[২০] দেখুন—প্রাগুক্ত; আল-মুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত : ২/১৫১; ফাতাওয়াশ শায়খ আলিশ : ১/৩৭৭; উসুলুদ দীন, বাগদাদি : ২৭০; আল-ইকনা' মাআ কাশশাফিল কিনা' : ৩/৩৮; আলমুকনি' মাআল ইনসাফ : ৪/১২১; আলমুবদি': ৩/৩১৩; আলফুরু' : ৬/১৯৭; আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনু মুফলিহ : ১/২১৩

[২১] আত-তাশরিউল জিনায়ি আল-ইসলামি : ১/২৭৭

উপরিউক্ত তিনও শ্রেণিই ফকিহগণের পরিভাষায় হারবি। হারবি হওয়ার জন্য হারবে (যুদ্ধে) লিপ্ত থাকা আবশ্যক নয়।[২২][২২] দারুল ইসলাম কীভাবে দারুল হারবে রূপান্তরিত হয় ওপরে আমরা আলোচনা করেছি, দারুল হারব কীভাবে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়। সেখানে আমরা বলে এসেছি, কোনো ভূখণ্ডে ইসলামের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারাই তা দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর এটাই উম্মাহর সর্বসম্মত মত।[২৩][২৩]

এখন আমরা আলোচনা করব, দারুল ইসলাম পুনরায় কীভাবে দারুল হারবে রূপান্তরিত হয়। তার আগে আমরা জেনে নিই, দারুল ইসলামের ওপর আপতিত অবস্থা মৌলিকভাবে তিন ধরনের :

১. হারবিরা কোনো ইসলামি ভূখণ্ড দখল করে সেখানে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২. কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকরা মুরতাদ হয়ে নিজেদের শহরের ওপর দখলারোপ করেছে এবং সেখানে কুফরি-শিরকি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩. ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মিরা তাদের জিম্মা চুক্তি ভঙ্গ করে কোনো দেশ বা শহরের ওপর নিজেদের প্রভাব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে।[২৪]

এবার আমরা উম্মাহর ফকিহগণের বক্তব্য দেখি। তারা এ ক্ষেত্রে কী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

---

[২২] বাদায়িউস সানায়ি : ৯/৪৩৭৫; আল-মিসবাহুল মুনির : ১/১২৭; আদ-দুররুন নাকি ফি শরহি আলফাযিল খিরাকি, ইবনু আবদিল হাদি : ৩/৭৪৪; আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজওয়িবাতিন নাজদিয়্যাহ : ৭/৩৯৭; আল-ইসতিআনা বি গাইরিল মুসলিমিন : ১৩২; উসুলুল আলাকাতিদ দুওয়ালিয়্যাহ : ৩১৩

[২৩] বাদায়িউস সানায়ি : ৯/৪৩৭৪; আদ-দুররুল মুনতাকা : ১৬৩৪; আল-ফাতাওয়াল বাযযাযিয়া : ৩/৩১২; আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া : ২/২৩২

[২৪] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন—কিতাবুল আসল, ইমাম মুহাম্মাদ; কিতাবুস সিয়ার : ২১৭-২২০; শারহুস সিয়ারিল কাবির : ৫/১৯১৪, ১৯৪১; আল-জামিউস সগির : ২৪৯; আল-মাবসুত : ১০/১১৩-১১৪; বাদাইয়ুস সানায়ি' : ৯/৪৩৭৬; মুখতাসারুত তহাবি : ২৯৪; আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া : ২/২৩২; ফাতাওয়া কাজিখান : ৩/৫৮৪; ফাতাওয়া শামি : ৪/১৭৪; আল-বাহরুর রায়িক: ৩/২৩০-২৩১; আল-ফুরুক, কারাবিসি : ১/৩৪০; আল-আহকামুস সুলতানিয়া, মাওয়ারদি : ১৩৮; আল-ইফসাহ, ইবনু হুবায়রা : ২/২২৯-২৩০; রহমাতুল উম্মাহ, দিমাশকি : ৩৫২

আলোচিত মাসআলায় আমরা উম্মাহর ফকিহগণের দুধরনের বক্তব্য পাই। আরও স্পষ্ট করে বললে, আলোচিত মাসআলায় ইমামগণের দুমাজহাব। প্রথম মাজহাব ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফেয়ি রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর। আর দ্বিতীয় মাজহাব শুধু ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর। প্রথমে আমরা সবিস্তারে উভয় মাজহাব উল্লেখ করছি।

প্রথম মাজহাব—কোনো ভূখণ্ড তখন দারুল হারব বলে গণ্য হয়, যখন সেখানে কুফরি আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়; চাই তা দারুল হারবের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হোক কিংবা দারুল হারবের সঙ্গে তার প্রতিবেশিত্ব ও সংলগ্নতা না থাক, তার মুসলমান অথবা জিম্মি নাগরিকরা পূর্বের নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত থাক কিংবা না থাক—সর্বাবস্থায় তা দারুল হারব হিসেবে গণ্য হবে।

ওপরে আমরা আল্লামা সারাখসি রহ. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি—'দারকে মুসলমানদের দিকে অথবা কাফিরদের দিকে নিসবত করাটা মূলত ক্ষমতা এবং প্রাধান্যতার বিচারে।' তাই প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড, যেখানে শিরকের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শক্তি ও ক্ষমতা মুশরিকদের হাতে। তাই তা দারুল হারব। আর প্রত্যেক এমন স্থান, যেখানে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শক্তি ও ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে। তাই তা দারুল ইসলাম।[২৫]

প্রথম মাজহাবের প্রমাণ

১. এই মাসআলাকে মূলত দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ার মাসআলার ওপরে কিয়াস করা হয়েছে। যেমনিভাবে ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়; যদিও সেখানে

---

[২৫] শারহুস সিয়ারিল কাবির : ৫/১৯১৪; কিতাবুল আসল; কিতাবুস সিয়ার : ২১৭; আল-মাবসুত : ১০/১১৪; জামিউল ফুসুলাইন : ১/১৩; ফাতাওয়া কাজিখান : ৩/৫৮৪; আল-ফাতাওয়াল বাযযাযিয়া : ৩/৩১১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ২/২৩২; ফাতাওয়া শামি : ৪/১৭৪-১৭৫; আদ-দুররুল মুনতাকা : ১/৬৩৪; মুলতাকাল আবহুর : ১/৬৫৯-৬৬০; জামিউর রুমুজের হাওয়ালায় কাশশাফুল ইসতিলাহাত : ২/২৫৬; ফিকহুল মুলুক : ১/৪৬২-৪৬৩

আল-মুদাওয়ানা : ২/২২; আল-মুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত : ২/১৫১; ফাতাওয়াশ শায়খ আলিশ : ১/৩৭৭; আল-মুগনি : ৬/৪০৩-৪০৪; আল-ইনসাফ : ৪/১২১; কাশশাফুল কিনা : ৩/৩৮; আল-ইফসাহ : ২/২৩০; রহমাতুল উম্মাহ : ৩৫২; আহকামুদ দিয়ার, ড. আবিদ সুফয়ানি : ৪৩

কাফিরদের অবস্থান রয়ে যায় এবং তা ইসলামি রাষ্ট্র সংলগ্ন না হয়—অর্থাৎ তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র দারুল ইসলাম না হয়ে অন্য কোনো দারুল হারব হয়, তবুও সবার মতেই তা দারুল ইসলাম হিসেবেই গণ্য হয়, তেমনিভাবে দারুল ইসলামেও যখন কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সেখানে মুসলমান থাকলেও এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হলেও তা দারুল হারব হিসেবেই গণ্য হবে। (মুজমা' আলাইহি মাসআলার ওপর কিয়াস)।[২৬]

২. আল্লামা কাসানি রহ. বলেন : 'এর কারণ হলো, আমাদের দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফর বলা—এর মানে তো হলো দারকে ইসলাম এবং কুফরের সঙ্গে সম্পর্কিত করা। আর দারকে ইসলাম এবং কুফরের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয় তাতে ইসলাম কিংবা কুফর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে। যেমন : জান্নাতকে 'দারুস সালাম' নামে নামকরণ করা হয়; যেহেতু তাতে 'সালাম' (শান্তি) রয়েছে। একইভাবে জাহান্নামকে 'দারুল বাওয়ার' নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু তাতে 'বাওয়ার' (ধ্বংস) রয়েছে। ইসলাম এবং কুফর প্রতিষ্ঠিত হয় তার আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা। যখন কোনো ভূখণ্ডে কুফরি আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা দারুল কুফর হয়ে যায়। তাই দারকে এভাবে ইসলাম কিংবা কুফরের সঙ্গে সম্পর্কিত করা সহিহ। এ জন্য ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা লাভের দ্বারাই কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হয়। এই একটি মাত্র শর্ত ছাড়া আর কোনো শর্ত নেই। এমনিভাবে কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই দারুল ইসলাম দারুল কুফরে রূপান্তরিত হয়।'[২৭]

তাতাররা যখন ইসলামি ভূখণ্ডের কিছু দেশ দখল করে নেয়, তখন একদল ফকিহ এর আলোকেই ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. এর বক্তব্য দেখুন : 'তাতারদের ব্যাপক ফিতনার পরে এই যে জায়গাগুলো, যেগুলো দখলে নিয়ে তারা সেখানে তাদের বিধিবিধান প্রয়োগ করেছে—যেমন : খুওয়ারিজম, মা-

[২৬] প্রাগুক্ত

[২৭] বাদায়িউস সানায়ি : ৯/৪৩৭৫; আল-জারিমাহ ওয়াল উকুবাহ, আবু জুহরা : ৩৪১; ফাতাওয়াল ইমাম রাশিদ রেজা : ১/৩৭৩

ওয়ারাউন নাহর, খোরাসান প্রভৃতি—'জাহিরুর রিওয়ায়াত' অনুযায়ী এসব ভূখণ্ড দারুল হারবে পরিণত হয়েছে।'[২৮]

## দ্বিতীয় মাজহাব

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. 'জাহিরুর রিওয়াহ'র অন্যতম কিতাব আয-যিয়াদাতে ইমামে আজম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত বর্ণনা করেন: 'তিনটি শর্ত সম্মিলিতভাবে পাওয়া গেলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে রূপান্তরিত হবে। শর্ত তিনটি হলো:

১. এসব দেশে প্রচার-প্রসিদ্ধির সঙ্গে কুফরি আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তা এভাবে হবে যে, শাসক কাফিরদের সংবিধান-নীতির আলোকে দেশ শাসন করবে, (ইসলামের নির্দেশনা জেনে বাস্তবায়ন করার জন্য) মুসলিম বিচারকদের কাছে ধর্ণা দেবে না। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের বিধানানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করবে না। তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া আইনকানুন হবে অনৈসলামিক আইনকানুন। মুসলমানদের ওপর আরোপিত বিধিবিধান হবে ইসলামের নির্দেশিত বিধিবিধানের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক। যেমন : ইসলাম সুদকে করেছে হারাম, চাপিয়ে দেওয়া আইন তা বৈধ করে দেবে। কুরআন মাজিদ ব্যভিচারকে করেছে হারাম, আর আরোপিত সংবিধান তার বৈধতা দিয়ে দেবে। তেমনি মদ, শূকর, জুয়া—ইসলাম এগুলোকে করেছে হারাম, আর কার্যকর আইনের আলোকে এগুলো সবই পেয়ে যাবে বৈধতার সনদ।

এর আলোকে অনুমিত হয়, দেশে যদি একই সঙ্গে ইসলামি বিধান এবং কুফরি বিধান জারি করা হয়, তবে দারুল ইসলাম দারুল হারব হিসেবে গণ্য হবে না; যেমনটা আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি রহ.-ও বলেছেন।

২. দেশটি দারুল হারব সংলগ্ন, তার সাথে লাগোয়া এবং তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র হতে হবে। তার মধ্যে এবং দারুল হারবের মধ্যে কোনো ইসলামি ভূখণ্ড অন্তরায় হতে পারবে না, যেখান থেকে মুসলমানদের সাহায্য আসতে পারে। কোনো দেশকে যদি চারিদিক থেকে ইসলামি রাষ্ট্র ঘিরে রাখে, আর তার ওপর কারও ক্ষমতা না-ও থাকে, তখনো তা অনৈসলামিক ভূখণ্ড হিসেবে গণ্য হবে না।

---

[২৮] আল-বাহরুর রায়িক : ৩/২৩০-২৩১; হাশিয়াতু তাবয়িনিল হাকায়িক : ৩/২৮৫

আল্লামা ইবনু আবিদিন শামি রহ. বলেন : 'এর আলোকে তো প্রতিভাত হয় যে, সমুদ্র কোনো অন্তরায় নয়। এরপর তিনি দুদল ফকিহের অভিমত নকল করেন। প্রথম দল বলছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের হুকুম দারুল হারবের হুকুমে। অপর দল বলছেন, সমুদ্র কোনো গোষ্ঠীরই নয়; যেহেতু তার ওপর কারও ক্ষমতাই কার্যকর নয়।'

শামি রহ. আরও বলেন : 'এর মাধ্যমে প্রতিভাত হয় যে, 'বিলাদুশ শামের' অধীনে যে 'জাবালু তাইমিল্লাহ', যার অপর নাম 'জাবালে দারুজু' এবং তার অনুগামী আরও কিছু শহর—এগুলো সব দারুল ইসলাম। কেননা, যদিও এসব শহরের শাসক দারুজ বা নাসারা এবং তাদের ধর্মীয় বিচারকও রয়েছে, যারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে, তাদের কেউ কেউ তো প্রকাশ্যে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে গালমন্দ-কটূক্তি করে; কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলিম শাসকদের ফায়সালার অধীনস্থ। দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাগুলোকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুসলমান শাসকগণ যখনই তাদের মধ্যে আমাদের বিধান বাস্তবয়িত করতে চাবেন, তখন তা করতে পারবেন।'

৩. সেখানে কোনো মুসলিম কিংবা কোনো জিম্মি মুসলিম শাসক-প্রদত্ত পূর্বের আমান (নিরাপত্তা)-এর মাধ্যমে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত থাকবে না। অর্থাৎ কাফিরদের আক্রমণের পূর্বে মুসলমান তার ইসলামের কারণে এবং জিম্মি তার জিম্মা চুক্তির কারণে মুসলিম সরকারের পক্ষ থেকে যে আমান (নিরাপত্তা) লাভ করেছিল, তা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। এখন তারা যদি নিরাপত্তাপ্রাপ্তও থাকে, তবে তা মুশরিকদের তরফ থেকে প্রদত্ত নিরাপত্তা; মুসলমানদের পক্ষ থেকে নয়।

আরও স্পষ্ট করে বলা হলে, মুসলমান কিংবা জিম্মিরা এখন এই ভূখণ্ডে অবস্থান করা এবং নিরাপত্তা লাভ করাটা তারা ইসলামের অনুসারী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নয়; বরং তাদের অবস্থানের বৈধতা ও নিরাপত্তা এই অঞ্চলের নতুন হারবি শাসকের সঙ্গে কৃত চুক্তির মাধ্যমে। ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়ে তারা এখন অনৈসলামিক শক্তির অধীনে।[৯৯]

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দলিল

[৯৯] প্রাগুক্ত এবং ফিকহুল মুলুক : ১/৪৬৩

১. হুকুম যখন কোনো কারণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, তো যতক্ষণ কারণের কিছু অংশও বাকি থাকে, ততক্ষণ হুকুমও বাকি থাকে। তাই যেহেতু কোনো ভূখণ্ড ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হয়, তো যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের কিছু বিধান এবং কিছু নির্দেশনা জারি থাকবে, সেই পর্যন্ত তা দারুল ইসলাম হিসেবেই গণ্য হবে।[৩০]

২. আল্লামা কাসানি রহ. বলেন : 'ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বক্তব্যের কারণ হলো, দার (ভূখণ্ড)-কে ইসলাম এবং কুফরের সঙ্গে সম্পর্কিত করার দ্বারা আসলে তো ইসলাম কিংবা কুফরের হাকিকত উদ্দেশ্য নয়। (ভূখণ্ড তো আর মুসলমান বা কাফির হয় না)। উদ্দেশ্য হলো আমান (নিরাপত্তা) এবং খাওফ (ভীতি)। এর অর্থ হলো, যদি সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য আমান (নিরাপত্তা) থাকে, আর কাফিরদের জন্য স্বাভাবিকভাবে খাওফ (ভীতি) থাকে (পূর্ণ নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য আলাদা চুক্তি করতে হয়), তাহলে তা দারুল ইসলাম। আর যদি সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য খাওফ (ভীতি) থাকে আর কাফিরদের জন্য স্বাভাবিকভাবে থাকে আমান (নিরাপত্তা), তাহলে তা দারুল কুফর। হুকুমের ভিত্তি হলো আমান এবং খাওফ (নিরাপত্তা এবং ভীতি)-এর ওপর; বাস্তবিক ইসলাম এবং কুফরের ওপরের নয়। তাই আমান এবং খাওফকেই বিবেচনায় নেওয়াটা উত্তম। তো যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণভাবে আমান রয়েছে ধরা হবে। তাই তা দারুল কুফরে পরিণত হবে না।

তেমনিভাবে সাধারণ নিরাপত্তা তখনই বিনষ্ট হওয়া সম্ভব, যখন সে অঞ্চলটা দারুল হারব সংলগ্ন হবে। তাহলে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য দুটো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল : আমান (নিরাপত্তা) নষ্ট হওয়া এবং দারুল হারবের সংলগ্ন অঞ্চল হওয়া।

'দার'কে ইসলামের দিকে নিসবত করার হেতু (Cause) সেটাও হতে পারে, যা সাহিবাইন বলেছেন, আর তা-ও হতে পারে যা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর পক্ষে আমরা বলছি। অর্থাৎ সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত থাকা।

[৩০] জামিউল ফুসুলাইন : ১/১৩

কাফিরদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আলাদা 'জিম্মা চুক্তি' কিংবা 'ইসতিমান (ভিসা) চুক্তি' প্রয়োজন।

দারকে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত করার হেতু যদি তা হয়, যা সাহিবাইন বলেছেন, তাহলে কোনো অঞ্চল দারুল কুফর হিসেবে গণ্য হবে সে কারণেই, যা তারা উল্লেখ করেছেন। আর যদি এই সম্পর্কিতকরণের হেতু তা হয়, যা আমরা বলেছি, তাহলে দেশ তখনই দারুল হারব হিসেবে গণ্য হবে, যখন আমাদের বর্ণিত শর্তগুলো পাওয়া যাবে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত দারুল ইসলাম শুধু সন্দেহ-সম্ভাবনার কারণে দারুল কুফরে পরিণত হবে না। কারণ, এ মূলনীতি স্বীকৃত যে, "যা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, তা সন্দেহ-সম্ভাবনার কারণে বিদূরীত হয় না।"[৩১]

তবে দারুল কুফরের বিষয়টা ভিন্ন। সেখানে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে। কেননা সেখানে ইসলামের প্রাধান্য। (যদিও বাহ্যত মনে হয়, সেখানে সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয়ের মাধ্যমে সুনিশ্চিত বিষয়কে রহিত করা হয়েছে, কিন্তু) হাদিসের কারণে সেখানে সন্দেহ-সম্ভাবনা গণ্য হবে না। (আর সুনিশ্চিত বিষয়ের মাধ্যমে আরেকটা সুনিশ্চিত বিষয় দূর হতে পারে।) হাদিসটি হলো :

**الإسلام يعلو ولا يعلى عليه**

ইসলাম উন্নীত থাকে। তার ওপর অন্য কিছু উন্নীত হয় না।[৩২] [৩২]

এরপর আল্লামা কাসানি রহ. বলেন : 'নিসবত যদি ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিবেচনায়ও হয় (যেমনটা সাহিবাইনের অভিমত), তবুও কুফরি বিধান

---

[৩১] ফিকহের এই মূলনীতিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন—আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, ইবনু নুজাইম : ৫৭; আল-আশবাহ, সুয়ুতি : ৫৩; আল-মানসুর ফিল কাওয়ায়িদ, জারকাশি : ২/২৫৫; শারহুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যা, জারকা : ৩৫-৪১; দুরারুল হুককাম : ১/২০

[৩২] হাদিসটি ইবনু আব্বাস রা. থেকে মাওকুফ এবং সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন—সহিহ বুখারি, জানাযা অধ্যায়, তা'লিক : ৩/২১৮। ইমাম তহাবি রহ. হাদিসটিকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন—৩/২৫৮। আবু ইয়ালা খলিলি আল-ফাওয়ায়িদে এবং রুওয়ানি আল-মুসনাদে হাসান সূত্রে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আরও দেখুন—সুনানুদ দারাকুতনি : ৩/২৫২; সুনানুল বায়হাকি : ৬/২০৫; দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ : ৬/৩৬; আদ-দালায়িল, আবু নুয়াইম : ৩২১। আরও দেখুন—নাসবুর রায়াহ : ৩/২১৩; ফাতহুল বারি : ৩/২২০; আত-তালখিসুল হাবির : ৪/১২৬; তাগলিকুত তালিক : ২/৪৯০; ফায়জুল কাদির : ৩/১৭৯; ইরওয়াউল গালিল : ৫/১০৬-১০৯

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উপরিউক্ত দুটো শর্ত প্রয়োজন—অর্থাৎ দারুল হারবের সংলগ্ন হওয়া এবং পূর্বের আমান (নিরাপত্তা) নষ্ট হয়ে যাওয়া। কেননা কুফরি বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে কেবল প্রতিরক্ষাবাহিনীর মাধ্যমে। আর প্রতিরক্ষাশক্তি সেই দুশর্তের মাধ্যমেই অস্তিত্ব লাভ করে।[৩৩]

দুই মাজহাবের মধ্যে পার্থক্য কী?

উপরিউক্ত আলোচনা স্পষ্টভাবে বুঝলে এ বিষয়টাকে আলাদা করে আর বলার প্রয়োজন পড়ে না। তারপরও বিষয়টাকে আরও স্পষ্ট করার জন্য আমরা এ শিরোনামে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারি।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং অন্য সকল ইমামই কোনো ভূখণ্ডের ওপর বিধানারোপ করার ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে শক্তি এবং প্রাধান্যতাকে বিবেচনায় নিয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে যে বিষয়ে এসে মতভিন্নতা হয়ে গেছে, আল্লামা সারাখসি রহ. এর ভাষায় তা হলো :

'কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. বিবেচনায় নিয়েছেন বল এবং শক্তির পূর্ণতা। কেননা এই শহর ইতিপূর্বে মুসলমানদের রক্ষণকারী হিসেবে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন সেই ইহরাজ (রক্ষণশক্তি) মুশরিকদের পূর্ণ প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমেই বিদূরিত হওয়া সম্ভব। আর তা এই তিন শর্ত সম্মিলিতভাবে পাওয়া গেলেই সম্ভব। কেননা যখন তা দারুশ শিরক সংলগ্ন না হবে, তখন চারিদিক থেকে মুসলমানদের বেষ্টনীর মধ্যে থেকে তার অধিবাসীরা পরাভূত থাকবে। তেমনি সেখানে মুসলমান এবং জিম্মি যদি (পূর্বের নিরাপত্তার অধীনেই) নিরাপদ থাকে, তবে তা মুশরিকদের পূর্ণ প্রতাপ না থাকার প্রমাণ। এর দৃষ্টান্ত হলো সেই মাসআলা—হারবিরা যদি দারুল ইসলামে অবস্থানরত কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, তবে তাদের নিজেদের দেশে সংরক্ষণ করার পূর্ব পর্যন্ত তারা সেই সম্পদের মালিক হয় না; যেহেতু পূর্ণ প্রতাপ নেই।

এরপর যতক্ষণ মূলের নিদর্শনসমূহের কোনো একটাও বাকি থাকে, তখন হুকুম তার ওপরই হয়, আপতিত বিষয়ের ওপর নয়। যেমন কোনো মহল্লা, যতক্ষণ তার

[৩৩] বাদায়িউস সানায়ি : ৯/৪৩৭৫-৪৩৭৬

মধ্যে একজন বাড়িওয়ালাও থাকবে, ততক্ষণ হুকুম তার ওপরই হবে। সে পর্যন্ত সেখানে নতুন আবাসগ্রহণকারী এবং ক্রেতাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এই ভূখণ্ড তো মূলত দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তো যতক্ষণ তাতে কোনো মুসলিম কিংবা জিম্মি (পূর্বের নিরাপত্তার অধীনে নিরাপদ) থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মূলের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে একটি নিদর্শন তো বাকি থাকবে। সুতরাং সেই হুকুম (অর্থাৎ দারুল ইসলাম থাকা এবং দারুল হারবে পরিণত না হওয়া) বাকি থাকবে। এটা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর একটি উসুল।

তেমনই প্রত্যেক জায়গার হুকুমের ক্ষেত্রে তার আশপাশের জায়গার অবস্থা বিবেচ্য। সুতরাং যখন এই ভূখণ্ডের চারিদিকে দারুল ইসলাম, তখন এই ভূখণ্ডের ওপর দারুল হারবের বিধান আরোপিত হবে না। যেমনিভাবে সেখানে শিরকি বিধান প্রতিষ্ঠিত না হলে তা আরোপ করা হতো না। মুরতাদরা এর ওপর দিনের কিছু সময়ের জন্য দখল নিয়েছে মাত্র।' (ফুঁ দিলেই আবার উড়ে যাবে।)[৩৪]

তাতাররা যখন ইসলামি ভূখণ্ডের ওপর তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করে, তখন ফকিহগণের ফতোয়া দুরকমই ছিল। ওপরে আমরা আল্লামা ইবনু নুজায়ম রহ. এর ফতোয়া উদ্ধৃত করেছি। তিনি সাহিবাইনের অভিমতের আলোকে তখন তাতারদের পদানত রাষ্ট্রগুলোকে দারুল হারব বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। এবার আমরা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমতের আলোকে প্রদত্ত ফতোয়ার নমুনা দেখব।

ইমাম ইবনুল বাযযায কারদারি ইমাম আবু শুজা রহ.-এর ফতোয়া উল্লেখ করেন : 'আজ (হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে) যেসব ভূখণ্ড কাফিরদের হাতে, সন্দেহ নেই যে, এ জায়গাগুলো দারুল ইসলাম। যেহেতু তা দারুল হারবের সঙ্গে সংযুক্ত নয় এবং তাতে কুফরি বিধানও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং বিচারকরা মুসলমান। এবং শাসকরা—জরুরতের কারণে যাদের তারা আনুগত্য করে, তারা মুসলমান আর জরুরত ছাড়া যাদের আনুগত্য করে, তাদের আনুগত্য 'মুওয়াদাআ'। যেসব অঞ্চলের ওপর তাদের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত মুসলমান গভর্নর রয়েছে, সেখানে জুমআ-ঈদ কায়িম করা, খারাজ উশুল করা এবং বিচারকদের তাকলিদ করা বৈধ। ...তার কাফিরদের আনুগত্য করাটা 'মুওয়াদাআ' বা 'মুখাদাআ'। ...আর এ উসুল তো

[৩৪] আল-মাবসুত : ১০/১১৪

স্থির হয়েছে যে, কারণের কিছু অংশ বাকি থাকার দ্বারাও হুকুম বাকি থেকে যায়। আর আমরা সবাই তো কোনো ইখতিলাফ ছাড়াই হুকুম আরোপ করেছি যে, তাতারদের দখলদারিত্বের পূর্বে এই অঞ্চলগুলো দারুল ইসলামের অন্তর্গত ছিল। আর তাদের দখলদারিত্বের পর আজান দেওয়া, জুমআ-জামাআত আদায় তাদের শাসকদের তরফ থেকে কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়াই চলছে। তাই এসব অঞ্চলের ওপর দারুল হারবের বিধান আরোপ করার কোনো কারণ নেই।'[৩৫]

এরপর তিনি হানাফিদের শায়খ শামসুল আয়িম্মাহ আব্দুল আজিজ আল হালওয়ানি রহ.-এর ফতোয়া উল্লেখ করেন :

'কোনো ভূখণ্ড দারুল হারব হয়, যখন সেখানে কুফরের বিধান জারি করা হয়, সেখানে কোনো ফায়সালা ইসলামের বিধানের আলোকে করা না হয় এবং তা দারুল হারব সংলগ্ন হয়। আর সেখানে কোনো মুসলিম কিংবা কোনো জিম্মি পূর্বের নিরাপত্তার অধীনে নিরাপদ না থাকে। যখন এই সবগুলো শর্ত পাওয়া যায়, তখন কোনো দেশ দারুল হারব হয়। যখন দলিল এবং শর্তের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন দেশ যা ছিল, তা-ই থাকবে। অথবা সতর্কতার দাবি হিসেবে ইসলামের দিকটাই প্রাধান্য পাবে। তুমি দেখছ না যে, শুধু ইসলামের বিধান জারি করার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়।'[৩৬]

প্রসঙ্গ : দারুল আমান

আমরা ওপরে সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি, যে ভূখণ্ডে ইসলামের বিধান-সংবিধান প্রতিষ্ঠিত, তা-ই দারুল ইসলাম। এর ব্যাপকতার মধ্যে যা যা অন্তর্ভুক্ত হয় :

১. দারুল হারবের কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের শহরেই অবস্থান করে, তবে তাদের ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে তা দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

---

[৩৫] ফাতাওয়া বাযযাযিয়া : ৩/৩১১-৩১২

[৩৬] প্রাগুক্ত; আল্লামা তুমুরতাশি রহ.-ও এমন ফতোয়া উল্লেখ করেছেন দুই মহান ইমামের থেকে—ইমাম ইসবিজানি এবং ইমাম ইমাদি রহ.। দেখুন—আদ-দুররুল মুনতাকা : ১/৬৩৪; জামিউর রুমুজের উদ্ধৃতিতে কাশশাফুল ইসতিলাহাত : ২/২৫৬

২. দারুল হারবের কোনো ভূমি বিজয় এবং তার ওপর ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়নের ঘোষণার মাধ্যমেও দেশ দারুল ইসলাম হয়। সারাখসি রহ. বলেন : 'মুসলমানরা যদি শত্রুদের কোনো ভূমি বিজয় করে এবং তাদের পূর্ণ দখলে আসে, হারবি অধিবাসীরা পলায়ন করে, তবে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে।'[৩৭]

৩. দারুল হারবের কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে 'জিম্মা চুক্তি' করে এবং মুসলমানরা তাদের অঞ্চলে ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত করে, তবে তা-ও দারুল ইসলাম।

৪. সন্ধির মাধ্যমে কোনো দেশ বিজিত হলে তার ভূমি থাকবে মুসলমানদের মালিকানায় এবং হারবি অধিবাসীরা খারাজ প্রদান করে সেখানে অবস্থান করতে পারবে—এটাও দারুল ইসলাম হিসেবেই গণ্য হবে।

এই চার প্রকারের বাইরে যা কিছু আছে, সবই দারুল হারব, অন্য শব্দে—দারুল কুফর, দারুশ শিরক। ওপরে আমরা পূর্ববর্তী ইমাম ও ফকিহগণের বক্তব্য উল্লেখের পাশাপাশি উস্তাদ আব্দুল কাদির আওদার ভাষায় দারুল হারবের সুন্দর সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছি। তিনি বলেন :

'দারুল হারব শব্দটি প্রত্যেক এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা মুসলমানদের শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রবেশ করেনি, কিংবা যেখানে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত নয়। এ রাষ্ট্রগুলো একই সরকারের পরিচালনাধীন থাক কিংবা ভিন্ন ভিন্ন সরকারের—বিধানের ক্ষেত্রে সবই সমান। তার স্থায়ী নাগরিকদের মধ্যে মুসলমানরা থাক বা না থাক—এগুলোও সমান। যতদিন তারা ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম থাকবে, ততদিন তা দারুল হারবই থাকবে।'[৩৮]

আমরা আরও আলোচনা করে এসেছি, দারুল হারব মানে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বা যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্র নয়। অনেকে ভাবেন, দারুল হারব শুধু এমন রাষ্ট্রকেই বলা হয়, যা কোনো মুসলিম ভূখণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। বাস্তবতা এমন নয়। কোনো ভূখণ্ডে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হয়। আর কোথাও কুফরি

[৩৭] শারহুস সিয়ারিল কাবির : ৩/১০০৪-১০০৬, ৪/১২৫৩, ১২৫৭; আল-মাবসুত : ১০/২৩, ১১৪
[৩৮] [৩৮] আত-তাশরিউল জিনায়ি আল-ইসলামি : ১/২৭৭

এবং শিরকি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল হারব বলা হয়। দারুল হারবকে অন্য শব্দে—দারুল কুফর, দারুশ শিরক ইত্যাদিও বলা হয়। এসব পরিভাষার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ফকিহগণ দারুল হারবের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। এ জন্যই সারাখসি রহ. বলেন :

'দারকে আমাদের দিকে বা তাদের দিকে নিসবত করাটা মূলত ক্ষমতা এবং প্রাধান্যতার বিচারে।'[৩৯]

এ বিষয়টাকেই আল্লামা কাসানি রহ. আরও বিস্তারিত করে এভাবে বলেছেন : 'কোনো রাষ্ট্রে কুফরের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হলে তা দারুল কুফর হয়ে যায়। ...রাষ্ট্র শুধু কুফরের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই দারুল কুফর হিসেবে গণ্য হয়।'[৪০]

বোঝা গেল, কোনো রাষ্ট্র দারুল হারব (অন্য শব্দে—দারুল কুফর, দারুশ শিরক) হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য লড়াই-যুদ্ধ চলমান থাকা অপরিহার্য নয়। এ জন্যই হাম্বলি ফকিহগণ বলেন :

'হারবি শব্দটা হারবের দিকে সম্পর্কিত। হারব অর্থ: কিতাল (লড়াই)। তেমনি এর অর্থ দূরত্ব এবং বিদ্বেষও। তো দারুল হারব অর্থ হলো এমন রাষ্ট্র, যার সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্ব কিংবা মুসলমানদের প্রতি রয়েছে যার বিদ্বেষ। হারবিকে হারবি এই দ্বিতীয় অর্থ—তথা দূরত্ব এবং বিদ্বেষ-এর বিচারেই বলা হয়। কার্যত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা জরুরি নয়।[৪১]

উম্মাহর ফকিহগণের আলোচনা থেকে তো স্পষ্ট অনুমিত হয়, দারুল ইসলাম এবং দারুল হারবের বাইরে আর কোনো বিভক্তি তাদের দৃষ্টিতে ছিল না। দু-চারজন এ ব্যাপারে ফতোয়া দেওয়ার চেষ্টা করলেও উম্মাহর কাছে সেগুলো বিচ্ছিন্ন ফতোয়া হিসেবেই অভিহিত হয়েছে। বাস্তবতা হলো সমগ্র পৃথিবী দুভাগে বিভক্ত; একভাগের নাম দারুল ইসলাম, আরেক ভাগের নামের দারুল হারব। তৃতীয় আর

---

[৩৯] আল-মাবসুত, সারাখসি : ১০/১১৪

[৪০] বাদায়িউস সানায়ি : ৯/৪৩৭৫; আরও দেখুন—আহকামুদ দিয়ার, আবিদ সুফয়ানি : ১৫

[৪১] আলমুতলি' আলা আবওয়াবিল মুকনি', বা'লি : ২২৬

কিছু নেই। এ ব্যাপারে উম্মাহর বিদগ্ধ ফকিহণের ঐকমত্য রয়েছে। এখানে আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজনের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

কাজি আবু ইয়ালা রহ. বলেন : 'প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড, যেখানে বিজয় কুফরের নয়, বরং ইসলামের বিধান-সংবিধানের, তা দারুল ইসলাম। আর প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড, যেখানে বিজয় ইসলামের নয়, কুফরের বিধান-সংবিধানের, তা দারুল কুফর। ব্যতিক্রম হলো গোমরাহ কাদারিয়্যাদের বক্তব্য। তারা বলে, যে ভূখণ্ডে পাপিষ্ঠদের প্রাধান্য, কাফির বা মুসলিমদের নয়, তা দারুল কুফর নয়, দারুল ইসলামও নয়; তা হলো দারুল ফিস্ক। এ বক্তব্যের ভিত্তি হলো, তাদের সেই মূলনীতি—'মানযিলাতুন বাইনাল মানযিলাতাইন' (ইসলাম এবং কুফরের মাঝামাঝি আরেকটি স্তর)। আমাদের দলিল ইমানের অধ্যায়ে বিগত হয়েছে। শরিয়তের মুকাল্লাফ যারা, তাদের তো দুটো অবস্থাই হতে পারে :

১. কাফির

২. মুমিন—পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী বা ত্রুটিপূর্ণ ইমানের অধিকারী।

তো সকল মানুষ হয়তো মুমিন, কিংবা কাফির। এমন তো হতে পারে না যে, কোনো শরিয়তের মুকাল্লাফ ব্যক্তি মুমিনও নয়, আবার কাফিরও নয়। (উল্লেখ্য, মুনাফিক আলাদা কিছু নয়। তারা হলো কাফিরদের সর্বনিম্ন শ্রেণি। চিরস্থায়ী জাহান্নামী। জাহান্নামের সবচে নিম্নস্তরে হবে তাদের বসবাস।) তেমনিভাবে 'দার'ও দুই অবস্থা থেকে মুক্ত হবে না। হয়তো তা দারুল কুফর হবে, কিংবা তা দারুল ইসলাম হবে।[৪২]

আল্লামা ইবনু মুফলিহ রহ. বলতেন : 'প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড, যেখানে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত, তা দারুল ইসলাম। আর যদি কোনো ভূখণ্ডে কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তা দারুল কুফর। এ দুয়ের বাইরে আর কোনো দার নেই।'[৪৩]

[৪২] আলমু'তামাদ ফি উসুলিদ দীন, আবু ইয়ালা : ২৭৬

[৪৩] [৪৩] আরও দেখুন—আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ইবনুল কায়্যিম : ১/৪৭৫-৪৭৬

হ্যাঁ, তৃতীয় আরেকটি দারের অস্তিত্বের বর্ণনা আমরা পাই ইউরোপীয় ও প্রাচ্যবিদ গবেষকদের কাছে। তারা এটাকে 'দারুল আহ্‌দ' নামে, কেউ 'দারুল আমান' নামে, কেউ 'দারুল মুওয়াদায়াহ' নামে উল্লেখ করেন।[৪৪]

সর্বপ্রথম আমরা এই বন্টন দেখতে পাই 'দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া'র (Islamic Encyclopedia) লেখকদের কাছে। এরপর বিদগ্ধ গবেষকদের মধ্যে এই আলোচনার সূত্রপাত করেন ড. নজিব।[৪৫] তারপর একে আরও শক্তিশালী করেন শায়খ আবু জুহরা।[৪৬] একই চিন্তা লালন করেন ড. ওয়াহবা জুহায়লি, ড. মুহাম্মাদ দাসুকি, ড. আব্দুল হামিদ আলহাজ, ড. মাজিদ, উস্তাদ আল্লাল আল-ফাসি আল-মাগরিবি।[৪৭]

আমাদের ইমামগণের মতে দারুল হারব দুই প্রকার :

১. এমন দারুল হারব, যার সঙ্গে মুসলমানদের কোনো চুক্তি নেই। এটা হলো দারুল খাওফ। অর্থাৎ ভয়ের শহর; যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ নয়।

২. এমন দারুল হারব, যার অধিবাসীরা মুসলমানদের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি করেছে। এটাকে আমরা দারুল আমান, দারুল আহদ বা দারুল মুওয়াদাআহ বলতে পারি। এই রাষ্ট্র যদিও ইসলামি রাষ্ট্র নয়, কিন্তু সেখানে চুক্তির কারণে মুসলমানরা নিরাপদ। যেমন ছিল রাসুলের যুগে নাজাশির রাষ্ট্র হাবাশাহ (ইথিওপিয়া)।

দ্বিতীয় প্রকারটিকেও আমাদের মহান ইমামগণ দারুল হারবের মধ্যেই গণ্য করেছেন। তারা এটাকে স্বতন্ত্র কোনো 'দার' নয়; বরং দারুল হারব গণ্য করেই এর ভিত্তিতে অনেক মাসআলা এবং ফতোয়া প্রদান করেছেন।

---

[৪৪] দেখুন—ইকতিশাফুল মুসলিমিন লি উরুব্বা, বার্নাড লুইস : ৬৯; আত-তাকসিমুল ইসলামি লিল মা'মুরাহ, ড. মুহিউদ্দিন কাসিম : ৪৯; মানহাজুল ইসলাম ফিল হারব ওয়াস সালাম, ড. উসমান জুমআহ জামিরিয়্যাহ : ৫৮

[৪৫] আশশারুদ দুওয়ালি ফিল ইসলাম : ৫০

[৪৬] আল-আলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যাহ : ৫৫; নাজরিয়্যাতুল হারব : ১৪

[৪৭] দেখুন—আসারুল হারব : ১৭৫-১৭৬; আল-আলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যাহ : ১০৭-১০৮; আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ওয়া আসারুহু ফিল ফিকহ : ৩৩০; আন-নুযুমুদ দুওয়ালিয়্যাহ : ১৮২-১৮৩; আল-কানুনুদ দুওয়ালি আল-ইসলামি : ২২-২৩; মাকাসিদুশ শারিয়াহ ওয়া মাকারিমুহা : ২২৯

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন : 'দারুল হারবের দেশসমূহের মধ্য থেকে কোনো দেশের অধিবাসীরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা প্রতি বছর মুসলমানদের খারাজ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য কোনো কর প্রদান করবে এই শর্তে যে, মুসলমানরা তাদের ওপর ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগ করবে না, এবং তারা জিম্মিও হয়ে যাবে না— এরপর তাদের কেউ এই চুক্তির ভিত্তিতে অনেক ধনসম্পদ নিয়ে দারুল ইসলামের উদ্দেশে বের হয়, তাহলে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত।'

ইমাম সারাখসি রহ. এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : 'যে লোকটি দারুল ইসলামের উদ্দেশে বেরিয়েছে, সে তার অবস্থানুযায়ী হারবি ও জিম্মি নয়; তবে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। কেননা চুক্তিবদ্ধ নাগরিকদের ওপর ইসলামের বিধান প্রয়োগ হয় না।... এই চুক্তির দ্বারা তাদের দেশ দারুল ইসলাম হয়ে যায়নি, যেহেতু সেখানে ইসলামের বিধিবিধান কার্যকর করা হয়নি। তা দারুল হারবই থেকে যাবে।[৪৮]'

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. আরও বলেন : 'চুক্তিকারীদের কোনো নাগরিক তাদের দেশে (দারুল মুওয়াদাআহ'তে) অপর কোনো নাগরিককে হত্যা করলে তার ওপর কিসাস কার্যকর হবে না। আর যদি আমাদের রাষ্ট্রে (দারুল ইসলামে) কোনো মুসতামিন (ভিসাধারী) অপর কোনো মুসতামিনকে হত্যা করে, তবে তার ওপর কিসাস অপরিহার্য হবে।'

ইমাম সারাখসি রহ. এর কারণ বর্ণনা করেন : 'কেননা চুক্তিকারীরা ইসলামের বিধিবিধান নিজেদের ওপর অপরিহার্য করে নেয়নি। কেননা তারা চুক্তিই করেছে এই মর্মে যে, তাদের ওপর ইসলামের বিধিবিধান কার্যকর করা হবে না। তাই তাদের রাষ্ট্র পূর্বের মতো দারুল হারবই থাকবে।'[৪৯]

তিনি আরও বলেন : 'কেননা যখন তারা ইসলামের বিধানের সামনে নতি স্বীকার করেনি, তখন চুক্তি করার দ্বারা চুক্তিকারী হলেও তারা 'হারবি'র কাতার থেকে বেরিয়ে যায়নি। তুমি দেখছ না, কৃত চুক্তির মেয়াদ গত হলেই তো পুনরায় তারা (কাট্টা) হারবিই হয়ে যাবে।'[৫০]

---

[৪৮] আস-সিয়ারুল কাবির মাআ শারহিস সারাখসি : ৫/২১৫৭, ২১৬৫

[৪৯] আস-সিয়ারুল কাবির মাআ শরহিস সারাখসি : ৫/১৮৫৭, ১৮৯৩

[৫০] শারহুস সিয়ারিস সগির, আল-মাবসুতের অন্তর্ভুক্ত : ১০/৮৮-৮৯, ৯৭

আধুনিক বিশ্লেষকদের বক্তব্যের সারকথা

এবার আমরা বর্তমান বিশ্লেষকদের বক্তব্যের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করি। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবার বক্তব্য উদ্ধৃত করা তো সম্ভব নয়। তাই সূত্রগুলো উল্লেখ করে দিয়েছি। কেউ চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে। তবে সংক্ষেপে তাদের বক্তব্যগুলোর মৌলিক কয়েকটি পয়েন্টের পর্যালোচনা উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো।

১. তৃতীয় কোনো 'দার'-এর অস্তিত্ব গণ্য করা মহান ইমাম এবং ফকিহণের ঐকমত্যের বিপরীত। সন্ধিকারীরা ইসলামের বিধিবিধানের অনুগত হলে তাদের রাষ্ট্র ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবেই গণ্য হবে—তাতে মুসলমানের সংখ্যা যত কমই হোক কিংবা মোটেও তাদের অস্তিত্ব না থাক। আর যদি তারা ইসলামের বিধান-সংবিধান এবং ইসলামি শাসনক্ষমতার সাথে একমত না হয়, তাহলে তা দারুল হারব। এর বাইরে আর কোনো অবস্থা নেই।

২. কেউ কেউ ইমাম শাফেয়ি এবং তার শাগরিদদের বক্তব্য দ্বারা এই তৃতীয় 'দার'-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চান। ইমাম শাফেয়ি তো এ ক্ষেত্রে বড়ই মাজলুম। একশ্রেণির অথর্ব তো ইমাম শাফেয়ির বক্তব্য বিকৃত করে পুরো দুনিয়াকে এক 'দার' হিসেবে অভিহিত করতে চায়। তারা দারুল ইসলাম এবং দারুল হারবের বিভক্তিকেই স্বীকার করে না। এই আরেক শ্রেণি তার বক্তব্যকে অপাত্রে প্রয়োগ করে, পুরো দুনিয়াকে তিন 'দার' বানাতে চায়। তবে মজার বিষয়, তারা তার বক্তব্যকে হুবহু উদ্ধৃত করে না। এই অভিমতকে শুধু তার দিকে সম্পৃক্ত করেই ক্ষান্ত হয়। আল্লাহ জানেন, সামনে কে এসে কীভাবে আরও বিকৃত করে।

৩. কেউ কেউ তো ইমাম মুহাম্মাদ এবং কাজি আবু ইয়ালা রহ.-এর দিকেও এই সারহীন অভিমতকে নিসবত করে। ওপরে তো আমরা তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেই এসেছি। কাজি আবু ইয়ালা রহ. তো পরিষ্কার ভাষায় তৃতীয় 'দার'-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন।

৪. কেউ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর একটি ফতোয়াকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। কিন্তু খোদ তা-ই ছিল বিচ্ছিন্ন ফতোয়া। আর স্পষ্ট যে, কারও বিচ্ছিন্ন মত গ্রহণ করা অনুমোদিত নয়।

৫. কেউ মাওয়ারদি রহ.-এর একটি বক্তব্যকে ভুল বুঝে বা অপাত্রে প্রয়োগ করেও এই উদ্দেশ্য অর্জন করার চেষ্টা করেছেন। তবে এই তৃতীয় 'দার'-এর অস্তিত্বের প্রথম ঘোষক প্রাচ্যবিদ মহোদয়গণ এতোটা বে-ইনসাফ হননি। তারা পর্যন্ত মাওয়ারদি রহ. এর বক্তব্য দ্বারা যে তৃতীয় কোনো 'দার'-এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না— স্বীকার করেছেন।

৬. হাবাশাকে তৃতীয় 'দার'-এর পক্ষে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা ইলমি অগভীরতার প্রমাণ বহন করে। কেননা হাবাশায় ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তাই তা দারুল হারব। হ্যাঁ, সেখানে মুসলমানদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। এর কারণে তা দারুল হারব থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আমরা ওপরে বলে এসেছি, দারুল হারব দুধরনের : দারুল খাওফ (যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ নয়) এবং দারুল আহদ, দারুল মুওয়াদাআহ বা দারুল আমান (যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ)।

বাংলাদেশ কেন দারুল হারব?

শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. তার ঐতিহাসিক ফতোয়ায় লেখেন : 'কোনো রাষ্ট্রকে কেবল এ হিসেবেই দারুল ইসলাম বলে দেওয়া হবে না যে, তাতে মুসলমানরা বসবাস করে কিংবা কাফিরদের অনুমতিক্রমে শাআয়িরে দ্বীন[৫১] পালন করতে পারে। কোনো (কাফির রাষ্ট্র দারুল ইসলাম গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত) রাষ্ট্রে শুধু মুসলমানদের বসবাস করতে পারা কিংবা কাফেরদের অনুমতিক্রমে শাআয়েরে দ্বীন পালন করতে পারার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

তদ্রুপ (ইসলামি শাসনাধীন) কোন রাষ্ট্রে কাফিরদের বসবাস করা কিংবা মুসলমানদের অনুমতিক্রমে বা তাদের গাফলতির সুযোগে সেখানে শাআয়েরে কুফর জাহির করার কারণে তা দারুল ইসলাম হওয়ার মধ্যে কোন বাধা সৃষ্টি করবে না।

কেননা এ উভয় ক্ষেত্রেই বিজয় ওই সব লোকের নয়। আর (দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হওয়ার) ভিত্তি তো হচ্ছে বিজয়ের ওপর। শুধু বসবাস বা (শাআয়েরে দ্বীন) জাহির করার ওপর নয়।

[৫১] 'শাআইর' আরবী শব্দ। 'শাইয়িরাতুন' এর বহুবচন। 'শায়িরাতুন' অর্থ হচ্ছে, নিদর্শন, প্রতীক।

এ কারণেই তো জিম্মি কাফিররা মুসলমানদের অনুমতিক্রমে দারুল ইসলামে বসবাস করে এবং তাদের শাআয়িরগুলো পালনও করে। কিন্তু দারুল ইসলাম তার আপন অবস্থায় দারুল ইসলামই থেকে যায়।

তদ্রুপ মুসলমানরা দারুল কুফরে যায় এবং তাদের শাআয়েরগুলো পালনও করে। কিন্তু শুধু এতটুকুর কারণে ওই রাষ্ট্র দারুল হারব হওয়া থেকে বের হয়ে যায় না।

তোমরা কি দেখো না, মক্কা বিজয়ের পূর্বে যখন মক্কা মুকাররামা দারুল হরব ছিল তখন ফখরে আলম ﷺ উমরাতুল কাজার সময় এক বিশাল বাহিনীসহ মক্কা মুয়াজ্জমায় উপস্থিত হয়েছিলেন। জামায়াত, নামাজ, উমরা ও অন্যান্য শাআয়ির ঘোষণা দিয়ে পালন করেছিলেন। তার সাথে এমন বিশাল বাহিনী ছিল যে, তিনি চাইলেই কাফিরদেরকে পরাজিত-পরাভূত করতে পারতেন। কেননা উমরাতুল কাজার পূর্বে হুদায়বিয়ার সময় ওই পরিমাণ বাহিনী নিয়ে মক্কা মুয়াজ্জামার ওপর চড়াও হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু খোঁজ-খবর নেওয়ার পর যখন হযরত উসমান রা.-এর হত্যার ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হলো তখন উক্ত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করা হয়।

মোটকথা রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে এমন বিশাল বাহিনী ছিল যে, তিনি কাফিরদের পরাজিত-পরাভূত করতে পারতেন। কিন্তু মক্কায় প্রবেশ এবং শাআয়ির আদায় যেহেতু কাফিরদের অনুমতিক্রমে হয়েছিল, এ কারণে মক্কা মুয়াজ্জমাকে উক্ত তিন দিনের জন্য দারুল ইসলাম গণ্য করা হয়নি; বরং পূর্বের মতো দারুল হারব হিসেবেই বহাল ছিল। কেননা মক্কায় প্রবেশ এবং ইসলাম জাহির করা (কাফিরদের) অনুমতির ভিত্তিতে ছিল, বিজয়ের ভিত্তিতে ছিল না।'

শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. বলেন : 'পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা একটি ইউরোপীয় পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা; যাতে অধিবাসী হিসেবে মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই অংশীদার। সেটাকে ইসলামি রাষ্ট্র বলা ভুল।'[৫২]

মাওলানা ইদরিস কান্ধলবি রহ. বলেন : 'যে রাষ্ট্র আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব এবং শরিয়তের বিধিবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতাকে গ্রহণ করে না; বরং এ কথা বলে যে,

[৫২] মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম : ২/২৪২

রাষ্ট্র হলো জনসাধারণ ও শ্রমিকদের এবং রাষ্ট্রের আইন তা-ই হবে, যা জনসাধারণ ও শ্রমিকরা মিলে তৈরি করবে, তো এ ধরনের রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে কাফির রাষ্ট্র।'[৫৩]

মুফতিয়ে আজম বাংলাদেশ মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামি (হাফিজাহুল্লাহ) বলেন:'ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচয় হলো, সে রাষ্ট্রে ইসলামি আইন-কানুন তথা কুরআন-হাদিসের বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রাষ্ট্রের শাসকবর্গ থেকে শুরু করে প্রজাবর্গ পর্যন্ত সবাই উক্ত আইনের পাবন্দি করবে। এ সবকিছুর পর সেই রাষ্ট্র ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত হবে এবং সেই রাষ্ট্রের শাসকবর্গ মুসলমানদের শাসনকর্তা এবং সেখানকার প্রজা মুসলিম প্রজা হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত হবে। যদি মুসলিম শাসকদের তরফ থেকে মুসলিম দেশে ইসলামি আইন জারি না করা হয়, বরং কুফর ও খোদাদ্রোহী আইন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একে আরও উন্নতি প্রদান করা হয়, তখন সেই দেশসমূহ ইসলামি দেশ হিসেবে কখনো গণ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়, বরং সেগুলোকে অমুসলিম দেশ হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। কারণ, ইসলামি দেশের পরিচয় ইসলামি আইন প্রয়োগের দ্বারা হয়।

উদাহরণস্বরূপ কাফিরদের দেশসমূহ দেখা যেতে পারে। যে দেশে সাম্যবাদ প্রচলিত সে দেশকে 'কমিউনিস্ট দেশ' বলা হয়। কারণ, কমিউনিজম হলো রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি। গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রচলিত থাকে। এ কারণে সেটাকে 'গণতান্ত্রিক দেশ' বলা হয়। যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিদ্যমান, সেটাকে 'ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ' বলে।

সুতরাং কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের শাসকবর্গ যদি ইসলামি আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা না করে, তবে সে দেশ আর ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করার উপযুক্ত থাকে না। এভাবে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের অধিবাসীরা যদি এমন হয় যে, তারা না ইসলামি আইন চায়, না সে আইনের প্রতি সন্তুষ্ট, বরং তারা অনৈসলামিক আইনের বাস্তবায়ন চায় এবং সে আইনের প্রতি খুশি, তাহলে এদের মুসলমান বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা নেই। বরং এমন লোক কাফির উপাধী পাওয়ার উপযুক্ত।'[৫৪]

---

[৫৩] আকায়িদুল ইসলাম : ১/১৯৫

[৫৪] মাকালাতে চাটগামী : ১৬৮

‘যেসব ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে বিধিবিধান জারি করে না অথবা এটাকে আমলযোগ্য বলে বিবেচনা করে না কিংবা এটাকে অসম্পূর্ণ গণ্য করে, এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলে, যে কারণেই হোক ইচ্ছাধীন থাকা অবস্থায় শরয়ি বিধান জারি করে না, এসব লোক কাফির; যদিও তারা মুসলিম নাম ধারণ করে। তাদের বিধান কাফিরের মতো। কাফিরের সাথে যেমন আচার-ব্যবহার করা হয়, তদ্রুপ তাদের সাথেও একই আচরণ করা হবে।’[৫৫]

এখন আমরা দেখব, বাংলাদেশে কি ইসলামি আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত, নাকি কুফরি আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশের আদালত বৃটিশ আইনে পরিচালিত হয়ে আসছে, এটা তো একটা স্পষ্ট বিষয়। ব্যভিচার, সুদ ও মদের বৈধতা থেকে শুরু করে ফতোয়াকে সেরেফ ধর্মীয় বিষয়াদির সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া, তা-ও আবার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার অধিকার প্রদানসহ মৌলিক ও শাখাগত অজস্র বিষয়ে শরিয়তের বিপরীতে সুস্পষ্ট অবস্থান আইনে বিধিবদ্ধ রয়েছে। যে সকল আইন বাহ্যত শরিয়তবিরোধী মনে হয় না, সেগুলোকেও এ জন্য গ্রহণ করা হয়নি যে, তা শরিয়তসম্মত। বরং এ জন্য করা হয়েছে যে, তা গণতন্ত্র ধর্মের বিপরীত নয়।

এ ছাড়াও সংবিধানে রয়েছে অসংখ্য সুস্পষ্ট কুফরি ধারা ও মূলনীতি।

উদাহরণস্বরূপ :

ক. আইন প্রণয়নের অধিকার মানুষের হাতে ‘ধারা : ৭. (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।[৫৬]

খ. চারটি কুফরি মতবাদ রাষ্ট্র পরিচালনার মহান আদর্শ ও মূলনীতি ‘আমরা অঙ্গীরা করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ

[৫৫] প্রাগুক্ত : ১৬৩

[৫৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১। প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র। পৃ. ৩

করিয়াছিলো—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।'[৫৭]

ধারা : ৮ (১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।[৫৮]

গ. রাষ্ট্র থেকে ধর্ম বিয়োজিত ধারা : ১২ ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।[৫৯]

ঘ. ঐক্য ও একক সত্তার ভিত্তি ইসলাম নয়; বরং ভাষা ও সংস্কৃতি

ধারা : ৯ ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙলাই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।[৬০]

---

[৫৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১। প্রস্তাবনা। পৃ. ৩

[৫৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১। দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। পৃ. ৩

[৫৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১। দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। পৃ. ৪

[৬০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১। দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। পৃ. ৪

ঙ. ইসলাম ও সকল কুফরি ধর্ম সমমর্যাদার ধারা : ২ (ক) প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।[৬১]

চ. মুরতাদ হওয়া ও কুফর প্রচার অনুমোদিত ধারা : ৪১ (১) ক. প্রত্যেক নাগরিকের যেকোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে।[৬২] আর সংবিধানের ভাষ্য অনুযায়ী উপরিউক্ত ধারা ও মূলনীতিগুলো (অর্থাৎ প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগের বিধানাবলি সর্বদা অপরিবর্তিত ও সংশোধনের অযোগ্য।[৬৩]

এই কুফরি সংবিধান সংরক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার, প্রধান বিচারপতি বা বিচারক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনার, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য—প্রত্যেকের শপথ বাক্যে আছে : '...আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব।'[৬৪]

সুতরাং ওপরে যাদের নাম উল্লেখিত হলো, তারা দলগতভাবে সকলেই মুরতাদ। আর ইসলামি শরিয়তের মূলনীতি হলো, কোনো কাফির মুসলমানদের শাসনকর্তা হতে পারে না। এসব কারণে মুসলমানদের ওপর জোর করে চেপে থাকা এ সকল তাগুতগোষ্ঠীর শাসনক্ষমতা কার্যকর নয় এবং মুসলমানদের জন্য তাদের আইনকানুন-বিধিবিধান মান্য করা মোটেও জরুরি নয়। বরং মুসলমানদের ওপর কর্তব্য হলো, এই তাগুত গোষ্ঠীকে অপসারিত করা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এখানে একটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখ্য, উপরিউক্ত ব্যক্তিরা দলগতভাবে মুরতাদ হলেও তাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি বিশেষের

---

[৬১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১। প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র। পৃ. ২

[৬২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১। তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার। পৃ. ১২

[৬৩] দেখুন— গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১। প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র। পৃ. ৩

[৬৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১। তৃতীয় তফসিল, ১৪৮ অনুচ্ছেদ, শপথ ও ঘোষণা, পৃ. ৬৫-৬৮

ব্যাপারে কুফরের ফতোয়া জারি করতে হলে প্রথমে হুজ্জাত কায়েম করে নিতে হবে এবং তাকফিরের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকার বিষয়টি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। তবে দলগতভাবে তারা যে মুরতাদ এবং তাগুত, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই।

আমাদের দেশসহ কথিত মুসলিম বিশ্ব—কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে মানবরচিত আইন গ্রহণ বা প্রণয়ন করা হয়েছে, আল্লাহর দেওয়া শরিয়তের সঙ্গে বিদ্রোহ করে তাগুতের আইনে সংবিধান তৈরি করা হয়েছে, শরয়ি বিধানমতে ফায়সালা দেওয়ার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি, আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করা আবশ্যকীয় মনে করা তো দূরের কথা; বরং তার বিপরীতে মানবরচিত আইনে ফায়সালা করাকে বিচারকরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের অন্যথা করারও সুযোগ নেই—তো ফিকহের আলোকে এসব দেশকে ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করার সুযোগ কোথায়?

শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. ভারত উপমহাদেশকে যখন দারুল হারব হিসেবে ফতোয়া দেন, তখনো এখানকার রাষ্ট্রপ্রধান নামধারী মুসলিম ছিল। এরপরও রাষ্ট্র থেকে ইসলামি আইনকানুন ও বিধিবিধান অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি একে দারুল হারব হিসেবে ফতোয়া দিয়েছিলেন এবং অন্যান্য আলিমগণও তার ফতোয়ার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। তার সেই ফতোয়ার পর পুনরায় তো আর এসব অঞ্চল দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়নি। দারুল হারব কীভাবে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়, সে আলোচনা তো আমরা ওপরে করে এসেছি। তা তো এরপর কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি।

জুমহুর ইমামগণের মাজহাবের আলোকে এসব অঞ্চলকে দারুল কুফর মানতে তো কোনোই দ্বিধা জাগার কথা নয়। ইমাম আবু হানিফা রহ. যে তিনটি শর্ত আরোপ করেছিলেন, সেগুলোর আলোকে বিবেচনা করলেও এ অঞ্চলগুলোকে নির্দ্বিধায় দারুল হারব বলতে হয়। শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. তৎকালীন ভারত উপমহাদেশকে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর তিন শর্তের আলোকেই দারুল হারব বলেছিলেন। প্রথমে আমরা দেখি, তিনি কীভাবে ভারত উপমহাদেশকে দারুল হারব হিসেবে ফতোয়া দিয়েছিলেন। এরপর দেখি, তার সঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থার সামঞ্জস্যতা কতটুকু।

তিনি তার সেই ঐতিহাসিক ফতোয়ায় লেখেন : 'যখন মূলনীতিগত দিক থেকে এই মাসআলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো, তখন হিন্দুস্তানের হালতের ব্যাপারে নিজেই ফিকির করে দেখো (কোনো দারুল ইসলাম দারুল হারব হওয়ার জন্য যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে সেগুলো কত জোরালোভাবেই না পাওয়া যাচ্ছে)।

(প্রথম শর্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে, দেখো।) এখানে খ্রিষ্টান কাফিরদের বিধান কী পরিমাণ শক্তি এবং দাপটের সঙ্গে চলছে! যদি সাধারণ কোনো কালেক্টরও হুকুম জারি করে যে, 'মসজিদে জামাত করতে পারবে না' তাহলে বিশিষ্ট-সাধারণ কারও এ সাধ্য নেই যে, তাতে জামাআত আদায় করবে।

আর জুমআ, ঈদ এবং শরিয়তের আরও কিছু বুনিয়াদি বিষয়ের ওপর আমল, যা এখানে হচ্ছে, তা কেবল তাদের এই আইনের কারণে যে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন। এ ব্যাপারে কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।'

(দ্বিতীয় শর্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে, দেখো।) মুসলিম শাসকগণ প্রদত্ত যে নিরাপত্তা এখানকার বাসিন্দাদের ছিল, এখন তার কোনো নাম-নিশানাও নেই। কোনো বিবেকবান বলতে পারবে, মোঘল বাদশাহ শাহ আলম যে আমান আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা সেই আমানের দ্বারা আজও নিরাপত্তার সঙ্গে বাস করছি? বরং বাস্তবতা হলো, কাফিরদের থেকে নতুন নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে। খ্রিষ্টানদের দেওয়া এ নিরাপত্তার মাধ্যমেই হিন্দুস্তানের সকল প্রজা এখানে বসবাস করছে।

আর (তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ 'দারুল হরবের সঙ্গে মিলিত থাকা'-এর ব্যাপারে কথা হচ্ছে,) দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত থাকা বড় বড় এলাকার জন্য শর্ত নয়। গ্রাম, শহর এবং এমন (ছোট) এলাকার জন্য শর্ত। যার উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, ওখানে (দারুল ইসলাম থেকে) সাহায্য পৌঁছা সহজ।

যদি কেউ বলে, 'রোম (অর্থাৎ তুরস্ক) বা কাবুলের (অর্থাৎ আফগানিস্তানের) শাসকের পক্ষ থেকে সাহায্য আসলে কাফিরদেরকে হিন্দুস্তান থেকে হটানো সম্ভব, তাহলে আল্লাহর পানাহ! এ ধরনের মন্তব্য কোনোক্রমেই সঠিক নয়। হিন্দুস্তান থেকে তাদেরকে হটানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অনেক বড় জিহাদ এবং বিশাল যুদ্ধ সামগ্রীর প্রয়োজন।

মোটকথা হিন্দুস্তানে কাফিরদের দখলদারিত্ব এই পরিমাণ কায়েম হয়েছে যে, কোনো সময় কোনো দারুল হারবে কাফিরদের এর চেয়ে বেশি দখলদারিত্ব হয় না।

আর ইসলামি শাআয়ির, যা এখানে মুসলমানরা পালন করছে, তা কেবল তাদের (কাফিরদের) অনুমতিক্রমে হচ্ছে। নতুবা মুসলমানদের চেয়ে অসহায় নাগরিক কেউ নেই। শাসনক্ষমতায় হিন্দুদেরও তো কিছুটা প্রভাব আছে; কিন্তু মুসলমানদের তা-ও নেই।

তবে হ্যাঁ, টুংক, রামপুর, ভূপাল এবং অন্যান্য রাজ্য, যেখানকার শাসকরা কাফিরদের দ্বারা পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের বিধিবিধান (অর্থাৎ ইসলামি বিধিবিধান) জারি রাখতে পারছে, সেগুলোকে দারুল ইসলাম বলা যেতে পারে। যেমনটা আদ-দুররুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাবের বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে।'

এবার আমরা হজরতের ফতোয়াটির আলোকে আমাদের দেশকে মূল্যায়ন করি : 'যখন মূলনীতিগত দিক থেকে এই মাসআলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো, তখন বাংলাদেশের হালতের ব্যাপারে নিজেই ফিকির করে দেখো (কোনো দারুল ইসলাম দারুল হারব হওয়ার জন্য যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে সেগুলো কত জোরালোভাবেই না পাওয়া যাচ্ছে)।

(প্রথম শর্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে, দেখো।) এখানে মুরতাদ কাফিরদের বিধান কী পরিমাণ শক্তি এবং দাপটের সঙ্গে চলছে! যদি সরকারি দলের সাধারণ কোনো নেতাও হুকুম জারি করে যে, 'মসজিদে জামাত করতে পারবে না' তাহলে বিশিষ্ট-সাধারণ কারও এ সাধ্য নেই যে, তাতে জামাআত আদায় করবে।

আর জুমআ, ঈদ এবং শরিয়তের আরও কিছু বুনিয়াদি বিষয়ের ওপর আমল, যা এখানে হচ্ছে, তা কেবল তাদের এই আইনের কারণে যে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন। এ ব্যাপারে কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।'

(দ্বিতীয় শর্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে, দেখো।) মুসলিম শাসকগণ প্রদত্ত যে নিরাপত্তা এখানকার বাসিন্দাদের ছিল, এখন তার কোনো নাম-নিশানাও নেই। কোনো বিবেকবান বলতে পারবে, উসমানি খলিফাগণ কিংবা অন্যান্য মুসলিম শাসকগণ যে আমান আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা সেই আমানের দ্বারা আজও নিরাপত্তার সঙ্গে বাস করছি? বরং বাস্তবতা হলো, মুরতাদদের থেকে নতুন

নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে। মুরতাদদের দেওয়া এ নিরাপত্তার মাধ্যমেই হিন্দুস্তানের সকল প্রজা এখানে বসবাস করছে।

আর (তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ 'দারুল হরবের সঙ্গে মিলিত থাকা'-এর ব্যাপারে কথা হচ্ছে,) দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত থাকা বড় বড় এলাকার জন্য শর্ত নয়। গ্রাম, শহর এবং এমন (ছোট) এলাকার জন্য শর্ত। যার উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, ওখানে (দারুল ইসলাম থেকে) সাহায্য পৌঁছা সহজ।

যদি কেউ বলে, 'আমিরুল মুমিনিন হিবাতুল্লাহ আখন্দজাদা এবং শাইখ আইমান জাওয়াহিরির পক্ষ থেকে সাহায্য আসলে মুরতাদদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে হটানো সম্ভব, তাহলে আল্লাহর পানাহ! এ ধরনের মন্তব্য কোনোক্রমেই সঠিক নয়। হিন্দুস্তান থেকে তাদেরকে হটানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অনেক বড় জিহাদ এবং বিশাল যুদ্ধ সামগ্রীর প্রয়োজন।

মোটকথা বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মুরতাদদের দখলদারিত্ব এই পরিমাণ কায়েম হয়েছে যে, কোনো সময় কোনো দারুল হারবে কাফিরদের এর চেয়ে বেশি দখলদারিত্ব হয় না।

আর ইসলামি শাআয়ির, যা এখানে মুসলমানরা পালন করছে, তা কেবল তাদের (মুরতাদদের) অনুমতিক্রমে হচ্ছে। নতুবা মুসলমানদের চেয়ে অসহায় নাগরিক কেউ নেই। শাসনক্ষমতায় নাস্তিক, শিয়া, ও হিন্দুদেরও তো কিছুটা প্রভাব আছে; কিন্তু মুসলমানদের তা-ও নেই।

তবে হ্যাঁ, আফগান, সোমালিয়া, ইয়ামান, শাম, ইরাক ও অন্যান্য ভূখন্ডের যেসব অংশ কাফির-মুরতাদদের থেকে উদ্ধার করে ইসলামি বিধিবিধান জারি রাখা যাচ্ছে, সেগুলোকে দারুল ইসলাম বলা যেতে পারে। যেমনটা আদ-দুররুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাবের বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে।'

আমাদের করণীয়

মুসলমানদের জন্য ইমান আনার পর জাতিগতভাবে সবচে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হলো মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা। তাই আমাদের জন্য অপরিহার্য হলো, আমরা আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ইসলামি রাষ্ট্রকে পুনরুদ্ধার করব। দখলদারদের বিতাড়িত করে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করব। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহ.

বলেন : 'প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ—যার মাধ্যমে আগ্রাসী শত্রুদের (মুসলিমদের ভূমি থেকে) বের করে দেওয়া—জিহাদের মধ্যে সবচে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিহাদ। সর্বজনস্বীকৃত যে, দ্বীন এবং নিজেদের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে একটি আবশ্যিক দায়িত্ব। ইমান আনার পর প্রথম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হলো আগ্রাসী শত্রুদের পার্থিব ও দ্বীনের ওপর আগ্রাসনকে প্রতিহত করা। এ ক্ষেত্রে কোনো ওজর-আপত্তি করার সুযোগ নেই। যেমন : সরবরাহ অথবা পরিবহন। বরং যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, তা নিয়েই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে।'

৯/১১-এর পর আমেরিকা ইসলামি রাষ্ট্র আফগানিস্তানে আক্রমণ চালায়, তখন বিখ্যাত দেওবন্দি আলিম মুফতি নিজামুদ্দিন শামজায়ি রহ. ফতোয়া জারি করেন : আমেরিকা ইমারাতে ইসলামি আফগানিস্তানের ওপর হামলা করেছে। এখন মুসলমানদের উপর নিম্নবর্ণিত শরয়ি বিধানগুলো বর্তাবে :

(১) সমস্ত মুসলমানদের ওপর জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে। কেননা আফগানিস্তানের আশপাশের মুসলমানরা আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম নয়। এবং ইহুদি ও আমেরিকার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইমারাতে ইসলামি আফগানিস্তানকে ধ্বংস করে দেওয়া। দারুল ইসলামের প্রতিরক্ষা বর্তমানে সকল মুসলমানের ওপর শরয়ি ফরজ।

(২) যেকোনো মুসলমান—সে যে দেশেরই হোক না কেন, সরকারি অথবা বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃকই থাকুক না কেন—যদি কোনোভাবে এই ক্রুসেড যুদ্ধে আফগান মুসলমানদের বিরুদ্ধে অথবা ইমারাতে ইসলামি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করে, তবে সে মুসলমান থাকবে না।

(৩) আল্লাহর বিধিবিধানের খেলাফ যদি যেকোনো মুসলিম সরকার হুকুম দেয় অথবা অধীনস্থ লোকদের ইসলামি হুকুমত ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করতে চায়, তবে অধীনস্থ মুসলমানদের এই ধরনের হুকুম মান্য করা জায়িয হবে না। বরং এই সমস্ত শাসকদের হুকুম লঙ্ঘন করা জরুরি।

(৪) ইসলামি দেশসমূহের যে সকল শাসক এই ক্রুসেড যুদ্ধে আমেরিকার সঙ্গ দিচ্ছে, নিজের ভূমি, খবরাখবর এবং বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে তাদেরকে সংগঠিত করছে, তারা মুসলমানদের ওপর শাসন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে।

সমস্ত মুসলমানের ওপর কর্তব্য হচ্ছে, এই সমস্ত শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করা; সেটা যেভাবেই হোক না কেন।

(৫) আফগানিস্তানের মুসলিম মুজাহিদদেরকে জান-মাল এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করা মুসলমানদের ওপর ফরজ। এ জন্য যাদের দ্বারা আফগানিস্তানে গিয়ে তাদের পাশাপাশি লড়াই করা সম্ভব, তারা যেন সেখানে গিয়ে অংশ নেয়। আর যারা সম্পদ দিয়ে সহায়তা করতে পারে, তারা যেন সম্পদ দ্বারা সহায়তা করে। মসিবতের এই সময় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহায্যকারী হন।

এই ফতোয়াকে বেশি থেকে বেশি প্রচার করে অপর মুসলমানের নিকট পৌঁছে দিন।

ওয়াসসালাম

মুফতি নিজামুদ্দীন শামজায়ি

(সিলমোহর)

এ কথা শুধু আফগানিস্তানের ক্ষেত্রেই নয়; বরং প্রতিটি দারুল ইসলাম, যাকে কিনা পরবর্তীতে দারুল হারবে পরিণত করে ফেলা হয়েছে কিংবা সে লক্ষ্যে কুফফার গোষ্ঠী যাতে আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে, মুসলমানদের জন্য তার প্রতিরক্ষা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ফরজ।

-সংগ্রহীত পোষ্ট

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫৩৬

# জাবিল কুরবা কারা? তাদেরকে কেন খুমুসে অংশ দেয়া হতো?

Ahkamus Siyar

Junior Member

১১-১৬-২০১৯

**উত্তর:**

জাবিল কুরবা অর্থ- নিকটাত্মীয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়রা খুমুসে একটা অংশ পেত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

**وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ**

"(হে মুসলিমগণ!) জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু গনিমত হিসেবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, (রাসূলের) নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের এবং এতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদের।" –**সূরা আনফাল: ৪১**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাতত্মীয় চার বংশ: ১. বনু হাশিম; ২. বনু মুত্তালিব; ৩. বনু নওফেল; ও ৪. বনু আব্দে শামস।

কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উর্ধ্বতন পিতৃ-পুরুষ আব্দে মানাফের চার সন্তান: হাশিম, মুত্তালিব, নওফেল ও আব্দে শামস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাশিমি বংশের। কাজেই এই চার বংশের সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়। **(মাবসূত- সারাখসী, ১০/১২)**

তবে আয়াতে উদ্দেশ্য বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব। এ দুই বংশের মুসলমানগণই শুধু খুমুসে অংশ পেতেন। বনু নওফেল ও বনু আব্দে শামস পেতো না। ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) বলেন,

**وهم صلبية بني هاشم وبني المطلب. اهـ**

"জাবিল কুরবা হলেন, হাশিম এবং মুত্তালিবের বংশধরগণ।" –**মাবসূত: ১০/১২**

## জাবিল কুরবাকে অংশ দেয়ার কারণে

জাবিল কুরবাকে অংশ দেয়া হয়েছে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুসরত করার কারণে। জাহিলি-ইসলাম উভয় যামানায় তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিল। মক্কার কুরাইশরা যখন একজোট হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ মুসলিমদের বয়কট করেছিল, তখন বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিল। তারাও শিয়াবে আবী তালেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বন্দীদশায় ছিলেন। যেহেতু বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব সর্বদা রাসূলের সাথে ছিল এবং দুর্দিনে নুসরত করেছিল, তাই আল্লাহ তাআলা এ নুসরতের প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে খুমুস অংশ দিয়েছেন; শুধু নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে নয়। বনু আব্দে শামস ও বনু নাওফেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপক্ষে কুরাইশের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অংশ দেননি। বংশীয়ভাবে নিকটাত্মীয় হওয়া সত্তেও তারা হকদার ছিল না; যেহেতু তারা নুসরত করেনি। **(রদ্দুল মুহতার ৪/১৪৯)**

যুবায়র ইবনু মুতঈম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

**لما قسم رسول الله ﷺ سهم القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان، فقلت :يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك - الذي وصفك الله عز وجل به - منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. قال: " إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما هم بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا" قال: ثم شبك بين أصابعه. [رواه النسائي في سننه (4137)، وأحمد في المسند (16741)؛ قال شعيب الأرؤوط في تحقيق المسند: إسناده حسن، محمد بن إسحاق- وإن كان مدلسا وقد عنعن- قد صرح بالتحديث عند الطبري والبيهقي، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. اهـ]**

“যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের গনিমত থেকে জাবিল কুরবার অংশ বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের মাঝে বন্টন করলেন; আমি এবং

উসমান বিন আফফান রাসূলের নিকট আসলাম এবং আরজ করলাম, ওহে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আপনার মর্যাদার যে বিবরণ দিয়েছেন, সে কারণে আপনি বনু হাশিমের মধ্য থেকে হওয়ায় বনু হশিমের মর্যাদা আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। কিন্তু আপনি আমাদের ভাই বনু মুত্তালিবকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না- অথচ আমরা এবং তারা উভয়ই আপনার একই স্তরের নিকটাত্মীয়! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, তারা জাহেলি-ইসলাম কোন যুগেই আমার থেকে পৃথক হয়নি। বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিব তো এক দেহের ন্যায়। এ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তার এক হাতের অঙ্গুলি অপর হাতের অঙ্গুলিতে প্রবেশ করালেন।” –**মুসনাদে আহমদ: ১৬৭৪১, সুনানে নাসায়ী: ৪১৩৭**

উল্লেখ্য, যুবায়র ইবনু মুতঈম রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু নওফেলের আর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু আব্দে শামসের লোক ছিলেন। এ কারণেই মূলত তাদের খটকা লেগেছিল। **(মাবসূত- সারাখসী, ১০/১২)**

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭২৩

# জিযিয়া কাকে বলে? কোন কোন কাফের থেকে জিযিয়া কবুল করা হবে আর কোন কোন কাফের থেকে কবুল করা হবে না?

Ahkamus Siyar

Junior Member

১১-২৬-২০১৯

**প্রশ্ন: জিযিয়া কাকে বলে? কোন কোন কাফের থেকে জিযিয়া কবুল করা হবে আর কোন কোন কাফের থেকে কবুল করা হবে না? দলীলসহ লিখুন।**

**উত্তর**

দারুল ইসলামে বসবাসরত যিম্মিদের থেকে মাথাপিছু হারে যে অর্থ আদায় করা হয় তাকে জিযিয়া বলে। **(বিনায়া-আইনি, ৭/২৩৮)**

দারুল ইসলামে কোন কাফেরকে জিযিয়া ব্যতীত বসবাস করতে দেয়া জায়েয নয়। **(শরহুস সিয়ারিল কাবীর ৪১০)**

হানাফি মাযহাব মতে আরবীয় মুশরিক ও মুরতাদ ব্যতীত অন্য সকল কাফের থেকে জিযিয়া নিয়ে দারুল ইসলামে যিম্মিরূপে বসবাস করতে দেয়া জায়েয। আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদ ও নাসারা, মাজূস-অগ্নিপূজক, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ- সকল থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে। পক্ষান্তরে আরবীয় মুশরিক ও মুরতাদের বিধান হল, হয় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হতে হবে, নয়তো হত্যা করে দেয়া হবে। জিযিয়া গ্রহণ করে বাঁচিয়ে রাখার সুযোগ তাদের বেলায় নেই। **(মাবসূত- সারাখসী, ১০/৭)**

ইমাম শাফিয়ি রহ. এর মতে অবশ্য অনারবী মুশরিক থেকেও জিযিয়া নেয়া জায়েয নয়। অতএব, তাদের মতানুযায়ী হিন্দু বা অন্য কোন অনারবী মুশরিক থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে না। হয়তো মুসলমান হবে, নয়তো হত্যা করে দেয়া হবে বা গোলাম বানানো হবে।

**আহলে কিতাব থেকে জিযিয়া গ্রহণের দলীল আল্লাহ তাআলার এ বাণী,**

**قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ**

"তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না- যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।"- **তাওবা ২৯**

**মাজূসীদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,**

**«سنوا بهم سنة أهل الكتاب»**

"তোমরা তাদের সাথে আহলে কিতাবের ন্যায় মুআমালা করো।" **-মুয়াত্তা মালেক ৪২**

অর্থাৎ আহলে কিতাবের মতো তাদের থেকেও জিযিয়া নেয়া যাবে।

তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম মাজূসীদের থেকে জিযিয়া নিয়েছেন বলে প্রমাণিত আছে। **(সহীহ বুখারি ২৯৮৭)**

আবু হানিফা রহ. **অনারবী মুশরিক**দেরকে মাজূসীদের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ মাজূসীরা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও যেমন তাদের থেকে জিযিয়া নেয়া যায়, অনারবী মুশরিকদের থেকেও তেমনি জিযিয়া নেয়া যাবে। **(মাবসূত- সারাখসী, ১০/১১৯)**

**আরবীয় মুশরিক ও মুরতাদ থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে না। তারা হয় মুসলমান হবে, নয় হত্যা করে দেয়া হবে। আরবীয় মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ,**

**فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ**

"যেখানেই পাবে মুশরিকদের হত্যা করে দেবে।"- **তাওবা ৫**

**تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ**

“মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাবে।”- **ফাতহ ১৬**

এর বিপরীতে তাদের থেকে জিযিয়া নেয়ার কোন দলীল নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেননি।

**মুরতাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ,**

**«من بدل دينه فاقتلوه.»**

“যে ব্যক্তি নিজ ধর্ম (ইসলাম) পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা করে দেবে।” -**সহিহ বুখারী ৬৯২২**

তাছাড়া আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে আরবের যে সকল লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হয়নি। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আ’লাম।

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৮১৩

# কোনো বাহিনি পাঠাতে হলে আমীর নির্ধারণ করে দেয়া কি আবশ্যক? এর দলীল ও হিকমত কি?

Ahkamus Siyar

Junior Member

১১-২৯-২০১৯

**উত্তর:**

বাহিনি পাঠাতে হলে আমীর নির্ধারণ করে দেয়া আবশ্যক। আমীর বিহীন কোন বাহিনি পাঠানো উচিৎ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময়ই কোন সেনাদল পাঠানোর পূর্বে আমীর ঠিক করে দিতেন। আমীর ব্যতীত কখনও কোন বাহিনি পাঠাতেন না।

**ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.) বলেন,**

**ينبغي للإمام إذا بعث سرية قلت أو كثرت أن لا يبعثهم حتى يؤمر عليهم بعضهم. اهـ**

“ইমামুল মুসলিমিন ছোট বা বড় যেকোন বাহিনি রওয়ানা করতে চাইলে আবশ্যক হল, তাদের নিজেদের একজনকে তাদের আমীর বানানো ব্যতীত না পাঠানো।”- **শরহুস সিয়ারিল কাবির ১/৭৪**

**আরো বলেন,**

**لا يجوز ترك المسلمين سدى ليس عليهم من يدبر أمورهم في دار الإسلام ولا في دار الحرب. اهـ**

“দারুল ইসলাম হোক দারুল হরব হোক- সকল বিষয়ের দেখাশুনা করবেন মতো কোন পরিচালক ব্যতীত বিশৃঙ্খল অবস্থায় মুসলমানদের ছেড়ে রাখা জায়েয নেই।”- **শরহুস সিয়ারুল কাবীর ২/৪২৮**

**ফাতাওয়া তাতারখানিয়াতে বলা হয়েছে,**

**وفي تجنيس خواهرزاده: وإذا بعث سرية أمر عليهم واحدا منهم، ولا يصلح أن يخرج قوم بلا أمير. اهـ**

"কোন বাহিনি পাঠালে একজনকে আমীর বানিয়ে দেবেন। আমীর ছাড়া কোন বাহিনি রওয়ানা হওয়া জায়েয নয়।"- **তাতারখানিয়া ৭/৫২**

**ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) বলেন,**

**وإنما يجب هذا اقتداء برسول الله عليه السلام فإنه داوم على بعث السرايا وأمر عليهم في كل مرة ولو جاز تركه لفعله مرة تعليماً للجواز. اهـ**

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকরত এটি আবশ্যক। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরাবর বাহিনি পাঠাতেই থাকতেন আর প্রত্যেক বেলায় একজনকে আমীর বানিয়ে দিতেন। যদি আমীর না বানিয়ে পাঠানো জায়েয হতো, তাহলে বৈধতা বুঝানোর জন্য অন্তত একবার হলেও তিনি আমীর না বানিয়ে পাঠাতেন।"- **শরহুস সিয়ারিল কাবির ১/৭৪**

তাছাড়া কয়েকজন মিলে সফরে বের হওয়ার ক্ষেত্রেও একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়ার আদেশ এসেছে। যেমন- এক হাদিসে **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,**

**إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم**

'তিন ব্যক্তি সফরে থাকলে তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়।'- **আবু দাউদ, হাদিস নং ২৬০৮**

**অন্য হাদিসে এসেছে,**

**لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة الا أمروا عليهم أحدهم (رواه أحمد-6647، تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره إلا حديث الإمارة فحسن)**

'যে কোন তিন ব্যক্তির জন্য কোন মরু ময়দানে অবস্থান করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেয়।'- **মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৬৬৪৭**

**যখন সাধারণ সফরের বেলায়ই আমীর বানানো জরুরী, তখন জিহাদের মতো ভীতিজনক কাজে তো এর আগেই জরুরী।**

**শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,**

**فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. اهـ**

"সফরের হালতে সৃষ্টি হওয়া ছোট্ট একটি জামাআতের বেলায়ও একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়ার আদেশ দিয়েছেন একথা বুঝানোর জন্য যে, সব ধরণের জামাআতের ক্ষেত্রেই আমীর বানিয়ে নেয়া আবশ্যক।"- **মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৯০**

**ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) বলেন,**

**وقد بينا أن المسافرين يستحب لهم أن يؤمروا عليهم أميراً فما ظنك في المحاربين. اهـ**

"পূর্বে বলে এসেছি যে, মুসাফিরদের জন্য একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া মুস্তাহাব। তাহলে যারা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, তাদের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?"- **শরহুস সিয়ারিল কাবির ১/১৮৫**

অর্থাৎ এখানে তো আরো আগেই আমীর নির্ধারণ করতে হবে।

## আমীর নির্ধারণের হিকমত

জামাতের ঐক্য বজায় রাখা, নিজেদের প্রয়োজনাদি সুশৃঙ্খলতার সাথে পূর্ণ করা এবং অটল অবিচলতার সাথে একদেহ একপ্রাণ হয়ে সকল বিপদাপদ মোকাবেলা করা।

**ইমাম খাত্তাবি রহ. (৩৮৮ হি.) বলেন,**

**إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف فيعنتوا. اهـ**

“আমীর নির্ধারণের আদেশ দেয়া হয়েছে যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে। একেক জনের একেক মত না হয় এবং পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত না হয়। এমনটা হলে তারা কষ্টে পড়ে যাবে।”- **মাআলিমুস সুনান ২/২৬০**

**ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) বলেন,**

**ولأنهم يحتاجون إلى اجتماع الرأي والكلمة وإنما يحصل ذلك إذا أمر عليهم بعضهم حتى إذا أمرهم بشيء أطاعوه في ذلك فالطاعة في الحرب أنفع من بعض القتال. اهـ**

“তাছাড়া বাহিনির প্রয়োজন পরস্পরে এক ও ঐক্যবদ্ধ থাকা। আর তা তখনই সম্ভব হবে, যখন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে দেবেন; যাতে আমীর তাদের কোন আদেশ দিলে তারা তার আনুগত্য করে। জিহাদে অনেক সময় যুদ্ধের চেয়ে আনুগত্যে উপকার হয় বেশি।”- **শরহুস সিয়ারিল কাবির ১/৩৪**

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৮৪৫

# হরবিরা যদি মুসলমানদের মাল লুণ্টন করে নিয়ে যায়, তাহলে কি মালিক হয়ে যায়? এর দলীল কি?

Ahkamus Siyar

Junior Member

১২-০২-২০১৯

**উত্তর:**

হ্যাঁ! মুসলমানরা যেমন হরবিদের মাল জব্দ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসলে মালিক হয়ে যায়, হরবিরাও যদি মুসলিমদের মাল দখল করে দারুল হরবে নিয়ে যায় বা দারুল হরবে বসবাসরত মুসলিমদের হত্যা করে বা বের করে দিয়ে তাদের সম্পদ দখল করে নেয় তাহলে তারাও তার মালিক হয়ে যায়।

**ফাই এর হকদারদের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,**

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

"(তাছাড়া এ সম্পদ) সে সব ফকির মুহাজিরদের প্রাপ্য, যাদেরকে (একান্ত আল্লাহর পথে টিকে থাকার অপরাধেই) নিজেদের ভিটে মাটি ও সহায় সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।" –সূরা হাশর: ৮

মক্কা থেকে হিজরত করে আসা মুহাজির সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলা ফকির আখ্যা দিয়েছেন। মক্কায় তাদের অনেকের যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ ছিল। এতদসত্ত্বেও ফকির আখ্যা দিয়েছেন, কারণ হিজরতের পর কাফেররা সেগুলো দখলে নিয়ে নিয়েছিল। যদি কাফেররা দখলকৃত সম্পদের মালিক না হতো, তাহলে মুহাজির সাহাবাদের ফকির আখ্যা দিতেন না। ফকির বলা হয় যার কিছুই নেই অথবা আছে; তবে সামান্য। পক্ষান্তরে যার সম্পদ আছে, তবে দূর দেশে থাকার কারণে ভোগ করতে পারছে না, তাকে ফকির বলে না; ইবনু সাবিল বলে। (শরহু মুখতাসারিততহাবি- জাসসাস, ৭/১৪৪; রদ্দুল মুহতার ৪/১৬০)

**হাদিসে এসেছে- ফাতহে মক্কার দিন উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন,**

**يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ قال النبي ﷺ: «وهل ترك لنا عقيل من منزل. «**

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগামীকাল কোথায় অবতরণ করবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আকিল কি আমাদের জন্য কোন ভিটে মাটি রেখেছে'?" –সহীহ বুখারী: ৪২৮২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাই আকিল রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনও মুসলমান হননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ি-ঘর দখল করে নেন এবং বিক্রি করে দেন। এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ অবতরণ করার মতো কোন জায়গা আকিল অবশিষ্ট রাখেনি, সব বিক্রি করে দিয়েছে। যদি আকিল রাদিয়াল্লাহু আনহু মালিক না হতেন, তাহলে বিক্রি সহীহ হতো না।

**ইবনে বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.) বলেন,**

**وكان عقيل استولى على دور النبى -ﷺ- وباعها فلولا أن عقيلا ملكها بالغلبة وباعها لأبطل النبى -ﷺ- بيعها ولم يجز تصرفه اهـ.**

"আকিল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর-বাড়ি দখল করে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। যদি তিনি দখলের দ্বারা মালিক না হতেন এবং (মালিক না হয়েই) বিক্রি করে দিতেন, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্রি বাতিল করে দিতেন এবং তাঁর হস্তক্ষেপের বৈধতা দিতেন না।" –শরহে ইবনে বাত্তাল: ৫/২২৮

**অন্য হাদিসে মুরসাল সনদে এসেছে,** এক ব্যক্তির একটি উটনী কাফেররা হাতিয়ে নেয়। অন্য একজন কাফেরদের থেকে তা কিনে আনে। মূল মালিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নালিশ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা দেন,

**«إن شئت فخذها بما اشتراها وإن شئت فدع»**

"নিতে চাইলে সে যে মূল্য দিয়ে কিনেছে তা পরিশোধ করে নিয়ে যাও। আর না নিতে চাইলে ছেড়ে দাও।"- মারাসিলু আবি দাউদ ৩৩৯

**অন্য একটি মুরসাল সনদে হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন,**

**ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم، فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به، وإن كان قسم فلا شيء له .**

"মুশরিকরা মুসলিমদের যে সম্পদ নিজেদের দখলে নিয়ে গেছে, মুসলিমরা লড়াই করে বিজয় অর্জন করলে, মালিক যদি বন্টনের পূর্বেই তার উক্ত মাল পেয়ে যায়, তাহলে সে-ই এর হকদার। আর বণ্টন হয়ে গেলে কিছুই পাবে না।" –মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা: ৩৪০৩৩

**অন্য বর্ণনায় আছে,**

**وإن جرت عليه سهام المسلمين، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة**

"বণ্টনের পর মূল পরিশোধ ব্যতিত নিতে পারবে না।"- মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক: ৯৩৫৯

বুঝা গেল, দখলের দ্বারা কাফেররা মালিক হয়ে যায়। অন্যথায় বণ্টনের পরও মূল মালিক বিনা মূল্যে নিয়ে নিতে পারতো। (মাবসূতে সারাখসী ১০/৫৪)

**আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত আছে যে, মুসলিমদের যে সম্পদ মুশরিকরা দখল করে নিয়ে যায়, তার ব্যাপারে তিনি বলতেন,**

**إنه بمنزلة أموالهم**

"এ সম্পদ কাফেরদের নিজস্ব সম্পদেরই মতো।" –মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা: ৩৪০৩৫

শেষোক্ত হাদিস ও আছারগুলো মুরসাল। তবে মুরসাল হাদিস আমাদের আইম্মায়ে কেরামসহ আরো অধিকাংশ আহলে ইলমের মতে গ্রহণযোগ্য। (ফাতহুল কাদির ৬/৪) অধিকন্তু কুরআনে কারীমের উল্লিখিত আয়াত ও সহীহ বুখারির হাদিস এর সমর্থক। (ফাতহুল কাদির ৬/৫) সব মিলিয়ে বিষয়টি প্রমাণিত।

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৮৬৭

# ইরাক ভূমিকে সাওয়াদ কেন বলা হয়? ইরাক কার হাতে কিভাবে বিজয় হয়েছে?

Ahkamus Siyar

Junior Member

১২-০৮-২০১৯

**উত্তর**

জাযিরাতুল আরব থেকে বের হয়ে পূর্ব দিকে রওয়ানা হলে গাছ-গাছালি ও ফল-ফসলে আকীর্ণ সবুজ-শ্যামল যে ভূমি সামনে পড়ে সেটিই ইরাক। জাযিরাতুল আরব মূলত পাহাড়-পর্বত আর বালুকাময় বিজন ভূমির দেশ। গাছ-গাছালি, ফল-ফসল ও সবুজ-শ্যামলতা নেই বললেই চলে। আরবরা জাযিরাতুল আরব থেকে যখন বের হতো, এই সবুজ-শ্যামল ইরাক ভূমি নজরে আসতো। এজন্য তারা একে সাওয়াদ নাম দেন। সাওয়াদ অর্থ: সবুজ-শ্যামল। **(মু'জামুল বুলদান- ইয়াকূত হামাবি, ৩/২৭২)** [১]

ইরাক পারস্য সম্রাটের অধীনে ছিল। হযরত উমার রাদিআল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পারস্য বাহিনিকে পরাজিত করে যুদ্ধের মাধ্যমে ইরাক বিজয় হয়। ইরাক বিজয়ে কাদিসিয়্যার যুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস হয়তো আমরা সকলেই জানি। বিস্তারিত ইতিহাস তারিখে ইবনে জারির ত্বাবারি, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া- ইবনে কাসীর, তারিখে বাগদাদ- খতিব বাগদাদি ইত্যাদি কিতাবে দেখা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, সহজে বুঝার জন্য আমরা ইরাক ভূমিকে সাওয়াদ বলেছি। তবে ইরাক ও সাওয়াদের সীমানায় কিছুটা ব্যবধান আছে। সাওয়াদ সম্পূর্ণটাই ইরাকের অন্তর্ভুক্ত। তবে সাওয়াদের বাহিরেও ইরাকের কিছু অংশ আছে। অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্ন মতও আছে। আমরা সে দিকে যাচ্ছি না। [২]

***

**[১]**

**قال ياقوت الحموي المتوفى سنة 626هـ في معجم البلدان (3\272 (في ذكر**

السواد: يراد به رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطّاب، ﷺ، سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار لأنّه حيث تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر كانوا إذا خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار فيسمونه سوادا. اهـ

[٢]

قال ابن عابدين في رد المحتار (4\177):(قال في تقويم البلدان: والسائر من تكريت، وهي على النهاية الشمالية للعراق إلى عبدان: وهي على النهاية الجنوبية له على تقويس الحد الشرقي مسافة شهر، وكذلك من تكريت إلى عبدان إذا سار على تقويس الحد الغربي أعني من تكريت إلى الأنبار إلى واسط إلى البصرة إلى عبادان يكون دور العراق مسافة شهرين وطوله على الاستقامة من تكريت إلى عبدان نحو عشرين مرحلة وعرض العراق من القادسية إلى حلوان نحو إحدى عشرة مرحلة اهـ تأمل.

وهذا تحديد العراق بتمامه وأما تحديد سواده، ففي البحر عن البناية عن شرح الوجيز: طول سواد العراق مائة وستون فرسخا وعرضه ثمانون فرسخا ومساحته ستة وثلاثون ألف ألف جريب. اهـ

قال ياقوت الحموي المتوفى سنة 626هـ في معجم البلدان (4\94): قال بعضهم : العراق هو السواد الذي حدّدناه في بابه، وهو ظاهر الاشتقاق المذكور آنفا لا معنى له غير ذلك وهو الصحيح عندي، وذهب آخرون ...الخ

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৯২১

## প্রশ্ন: মুসলিমদের হারানো ভূমিগুলো উদ্ধার করা কি ফরয?

Ahkamus Siyar

Junior Member

১২-২১-২০১৯

**উত্তর**

হ্যাঁ। মুসলিমদের হারানো ভূমিগুলো উদ্ধার করা ফরয। আন্দালুস, ভারত, তুর্কিস্তান, কাশ্মির ইত্যাদি ভূমি যেগুলো যুগের পর যুগ ধরে কাফেরদের দখলে আছে, সবগুলো উদ্ধার করা ফরয। পূর্ববর্তী মুসলিম খলিফা ও সুলতানরা যারা এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন কিন্তু উদ্ধার করতে পারেননি, তারা দায়িত্বমুক্ত হয়ে মারা গেছেন ইনশাআল্লাহ। আর যারা এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেননি, তারা গুনাহগার হয়ে মারা গেছেন। তবে সর্বাবস্থায় পরবর্তী উম্মাহর উপর এ দায়িত্ব ঋণ হয়ে আছে। ঋণ আদায়ে সক্ষম না হলে যেমন ঋণ মাফ হয় না, বরং চেষ্টা করতে হয়, মুসলিম ভূমিগুলোর ব্যাপারেও একই কথা। শক্তি না থাকার কারণে ফরয মাফ হবে না, যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। যতদিন মুসলিমদের সকল ভূমি কাফেরদের থেকে উদ্ধার না হবে, ততদিন উম্মাহর উপর এ ফরয ঋণ হিসেবে থেকে যাবে।

**মাগরিবের ইমাম আল্লামা তুসুলি (১২৫৮হি.) রহ. এ ব্যাপারে সুন্দর আলোচনা করেছেন। এখানে তার কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। তিনি বলেন,**

(لا يبرأ المسلمون من عهدة المدافعة، ونصرة من عجز، إلاّ إذا استفرغوا الوسع في إزاحة الكفّار من المدائن التي أخذوها للمسلمين، (فلو نازلوها فلم تفتح، وجب عليهم معاودتها كلما أمكنهم ذلك، حتى يفتحها الله عليهم، ولا فرق في ذلك بين المدائن المأخوذة للمسلمين) حديثاً أو قديماً.)

لأن الوجوب والتعيين متعلّق بالمسلمين، لا بقيد زمان، ولا مكان، إلاّ أنه :يتعيّن على الحاضر زماناً ومكاناً،- على ما مرّ ترتيبه- فان لم يفعل لعذر، أو لغير عذر، وجب على غيره ممّن يليه.

كما قاله "ابن عرفة"، عن "المازري": (وترك من تقدم من أئمة المسلمين مدائن الإسلام في أيدي الكفّار، هم بذلك في محل العصيان، لا في محل الاقتداء والاستنان، وقديماً قيل: "اسلك سبيل الهدى، ولا يضرّك قلّة السالكين، و اترك طريق الردى، ولا يضرّك كثرة الهالكين") اهـ كلامه.

قلت: وهذا منه- رحمه الله- تصريح بأن الجهاد فرض عين، على كل من الأئمة، والحال: أنهم قد أخذوا له، أو لغيره ممّن قبله، بعض أقطار البلدان، لأن عدوّ الدين قد نزل به، أو بمن قبله، وقد أخذ له، أو لمن قبله ثغوراً، فيجب عليه: أن يستنقذ ذلك منهم، وإن ترك ذلك الاستنقاذ من قبله، وهو صحيح لا خلاف فيه. ولهذا أفتى- سيدي- "شقرون بن هبة - "أحد حفّاظ المتأخرين-: بأن الجهاد في هذا الزمان فرض عين، ونحوه في كتاب "فلك السعادة" قائلاً: (الجهاد اليوم فرض عين، لأنّهم قالوا: "إذ نزل العدوّ ساحة الإسلام، فالجهاد فرض عين "ولا مخالف لهذا القول، واليوم قد نزلوا بساحات، وهتكوا أستاراً وحرمات، وأخذوا معاقل وحصوناً، وسبوا قبائل وبطوناً.)

أي: وهم إذا سبوا ذلك، تعيّن على إمام الوقت ورعيّته أن يستنقذوا ذلك، ويجب على من يليه من الأئمة: أن يعينه على ذلك إن هو عجز، أو ترك وعصى- كما تقدّم في نص "المازري"- كما أنه يجب ذلك على من بعده من الأئمة إن هو مات- .أجوبة التسولي (المتوفى: 1258هـ) عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص: 279-281، الناشر: دار الغرب الإسلامي

“(শাইখুল ইসলাম) ফাসি (১০৫২হি.) রহ. বলেন, ‘মুসলমানরা প্রতিরোধ জিহাদ ও অক্ষমদের সাহায্যের দায়িত্ব হতে মুক্তি পাবে না, যতক্ষণ না তারা

কাফেরদের দখলকৃত ভূমিসমূহ হতে ওদের উৎখাত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করে। যদি মুসলমানরা (কাফেরদের দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করার জন্য) আক্রমণ করে, কিন্তু বিজয় করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের উপর ফরয হবে যখনই সম্ভব পুনরায় হামলা করা, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করেন। এক্ষেত্রে বর্তমানে দখলকৃত ও বহুপূর্বে দখলকৃত ভূমির মাঝে কোন পার্থক্য নেই'।

কেননা কাফেরদের দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করা সর্বযুগের সব স্থানের মুসলমানের উপর ফরয, নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল বা সময়ের মুসলমানদের সাথে এ বিধান সম্পৃক্ত নয়। তবে আক্রান্ত এলাকার মুসলিমদের উপর এ মূহুর্তে ফরযে আইন। যদি তারা কোন উযরবশত বা উযরব্যতীতই এ ফরয দ্বায়িত্ব পালন না করে তবে তাদের নিকটবর্তী অঞ্চলের ও তাদের পরবর্তী যামানার মুসলিমদের উপর এই দ্বায়িত্ব বর্তাবে।

যেমনটা ইবনে আরাফা (৮০৩হি.) রহ. ইমাম মাযারি (৫৩৬হি.) রহ. এর সূত্রে বলেন, 'পূর্ববর্তী যেসব শাসক মুসলিমভূমি কাফেরদের হাতে ছেড়ে রেখেছে তারা এর দ্বারা গুনাহের কাজ করেছে। অতএব এক্ষেত্রে তারা অনুসরণীয় নয়। বহুপূর্বেই বলা হয়েছে, তুমি হেদায়েতের পথে চলো, এ পথে চলাব্যক্তিদের সংখ্যাস্বল্পতা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। ধ্বংসের পথ পরিহার করো। ধ্বংস হয়ে যাওয়া লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তোমার কোন ক্ষতি হবে না'।

ইবনে আরাফা রহ. এর উক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, বর্তমান যমানার সব শাসকের উপর জিহাদ ফরযে আইন। কারণ, প্রত্যেক শাসকের কিংবা তার পূর্ববর্তীদের শাসনাধীন কিছু ভূমি কাফেররা দখল করে নিয়েছে। দ্বীনের দুশমনরা তার এলাকা কিংবা তার পূর্ববর্তী শাসকদের এলাকায় আগ্রাসন চালিয়েছে। ওরা তার কিংবা তার পূর্ববর্তীদের আয়ত্বাধীন অনেক সীমান্ত দখলে নিয়ে নিয়েছে। সুতরাং ওদের হাত থেকে সেসব ভূমি পুনরুদ্ধার করা প্রত্যেক শাসকের উপর ফরয; যদিও তার পূর্ববর্তী শাসকরা পুনরুদ্ধার করে না থাকে। এ মাসয়ালাটি সহিহ। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই।

এ জন্যই সায়্যিদ শাকরুন বিন হিবাহ (৯৮৩হি.) রহ.- যিনি মুতাআখখিরিনদের মধ্যে একজন হাফেয ছিলেন- ফতোয়া দেন, বর্তমান যমানায় জিহাদ ফরযে আইন। ... তিনি বলেন, 'বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন। কেননা উলামায়ে কেরাম

বলেছেন, শত্রু যখন মুসলিমভূমিতে আগ্রাসন চালায় তখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আলেমদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। আর বর্তমানে শত্রুরা বিভিন্ন মুসলিমভূমিতে আগ্রাসন চালিয়েছে। মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মান ভূলুণ্ঠিত করেছে। বহু দূর্গ ও কেল্লা দখল করেছে। অনেক গোত্র ও গোষ্ঠীর লোকদের বন্দী করেছে'।

অর্থাৎ যখন কাফেররা বিভিন্ন গোত্রের মুসলমানদের বন্দী করে তখন উক্ত অঞ্চলের শাসক ও প্রজাদের উপর তাদের উদ্ধার করা ফরয। যদি সে উদ্ধার করতে অক্ষম হয় কিংবা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে উদ্ধার না করে, তবে নিকটবর্তী অঞ্চলের শাসকদের উপর সেই শাসককে সাহায্য করা এবং বন্দীদের উদ্ধার করা ফরয। যেমনটা ইতিপূর্বে মাযারি রহ. এর বক্তব্যে গত হয়েছে। তেমনিভাবে যদি সেই অঞ্চলের শাসক মারা যায় তাহলে পরবর্তী যামানার শাসকদের উপর এ ফরয বর্তাবে।" -আজবিবাতুত তুসুলি আন মাসায়িলিল ইমাম আব্দিল কাদির ফিল জিহাদ, পৃ: ২৭৯-২৮১

**সামনে গিয়ে বলেন,**

**وبالجملة: فلا يخرج إمام ولا رعيته من عهدة الوجوب، في إزاحة الكفار من مدائن المسلمين ، أو إعانة من عجز عن إخراجهم منها، أو مدافعتهم عنها، إلاّ باستفراغ الوسع، وبذل الطاقة والجهد بالعدّة والاستعداد، ومباشرة الدفع، ومعاودة القتال بحسب الإمكان، أو يموت وهو مدين على ذلك الفعل، فينتقل الوجوب إلى من تولّى بعده، وأما كونه يقتدي بمن عصى من الأئمة، وترك مدائن المسلمين بأيدي الكفار، أو ترك إغاثة من عجز عن الدفع، فذلك غير مخلص.**

**وبهذا نعلم: أن محل كون الجهاد فرض كفاية: إذا لم يكن العدوّ أخذ شيئاً من بلاد المسلمين، وإلاّ كان فرض عين- على ما مرّ تفصيله قريباً- إذ هو: نازل بهم دائماً ما دام آخذاً لثغورهم وبلادهم، فيجب على أئمة وقته، وعلى من يليهم إن عجزوا، على من بعدهم إن ماتوا أو عصوا وتركوا أن يخرجوهم ممّا استولوا عليه، ولا يحلّ لهم تركهم، إلاّ بقدر ما يتجهّزون، ويعاودون ذلك المرة بعد المرّة،**

**حتى يفتحها الله عليهم. -أجوبة التسولي (المتوفى1258 :هـ) عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص: 284-285، الناشر: دار الغرب الإسلامي**

"সারকথা: কোন মুসলিম শাসক বা তার প্রজাগণ মুসলিমভূমি হতে কাফেরদের বিতাড়ন এবং যারা তাদেরকে তাড়াতে বা প্রতিহত করতে অক্ষম তাদের সাহায্যের ফরয দ্বায়িত্ব হতে মুক্তি পাবে না, যতক্ষণ না তারা এজন্য নিজেদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং বিজয় লাভ করা পর্যন্ত যখন সম্ভব যতবার সম্ভব কাফেরদের উপর (বার বার) আক্রমণ চালাতে থাকবে। যদি শাসক মৃত্যুবরণ করে তবে তা তার যিম্মায় ঋণ হিসেবে বাকী থাকবে এবং এ দ্বায়িত্ব স্থানান্তর হয়ে পরবর্তী শাসকদের উপর বর্তাবে। পূর্ববর্তী শাসক যারা নাফরমানি করে কাফেরদের হাতে মুসলিম ভূমি ছেড়ে রেখেছে কিংবা কাফেরদের প্রতিহত করতে অক্ষম মুসলিমদের সাহায্য করা পরিত্যাগ করেছে- বর্তমান শাসক এ ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাওয়ার কোন সূরত নেই।

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা বুঝতে পারলাম, জিহাদ ফরযে কেফায়া হওয়ার বিধান ঐ সময়ে প্রযোজ্য যখন মুসলমানদের কোন একটি ভূমিও কাফেরদের দখলে না থাকে। অন্যথায় জিহাদ ফরযে আইন। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম ভূমি ও তাদের সীমান্তগুলো কাফেরদের দখলে থাকবে ততক্ষণ তো কাফেররা মুসলিম ভূমিতে আগ্রাসনরত। তাই সমকালীন শাসকদের উপর, আর তারা অক্ষম হলে কিংবা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে না করলে, পরবর্তী শাসকবর্গের উপর ফরয হবে কাফেরদেরকে দখলকৃত ভূমি হতে বিতাড়িত করা। কাফেরদের শুধু ততটুকু সময়ই ছেড়ে রাখা বৈধ হবে, যতটুকু পরিমাণ প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন পড়ে। এরপর তারা একের পর এক আক্রমণ করতে থাকবে, যতদিন না আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করেন।" -আজবিবাতুত তুসুলি আন মাসায়িলিল ইমাম আব্দিল কাদির ফিল জিহাদ, পৃ: ২৮৪-২৮৫

তুসলি রহ. এর বক্তব্য থেকে আশাকরি পরিষ্কার যে, শত শত বৎসর ধরে কাফেরদের হাতে পড়ে থাকা মুসলিম ভূমিগুলো উদ্ধার করা বর্তমান যামানার এবং পরবর্তীতে আগত সকল মুসলমানের উপর ফরয। যতদিন কোন মুসলিম ভূমি কাফেরদের হাতে থাকবে, ততদিন জিহাদ ফরযে আইন। ই'দাদ ও প্রস্তুতি না নিয়ে অন্য যত নেক আমলই করি না কেনো, ফরযে আইন তরকের গুনাহ থেকে মুক্তি

পাবো না। মুসলিমদের সকল ভূমি উদ্ধার হয়ে গেলে তখন জিহাদ ফরযে কিফায়া হবে। এর আগ পর্যন্ত ফরযে আইন। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫০৬১

# যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যায় (পর্ব- ৩ শরিয়তের বিধান পরিবর্তন)

আদনানমারুফ

Senior Member

১২-২৯-২০১৯

পর্ব -৩ বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ

গত দুই পর্বে আমরা নামায তরককারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধের বিধান বর্ণণা করেছি, এই পর্বে ইনশাআল্লাহ মুসলিম নামধারী যে শাসকরা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান নিয়ে আলোচনা করবো, এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে বিধান পরিবর্তন শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ও উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে দলিল-প্রমাণ পেশ করা, বাকী এ কাজটা কুফর কি না? আলেমগণ এমন শাসককে কাফের বলেছেন কি না? এ ব্যাপারে আমরা এ প্রবন্ধে কোন আলোচনা করবো না।

ফতোয়া: যে শাসক কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী দেশ শাসন করে না। বরং কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করে -তাকে কাফের-মুরতাদ বলা হোক না হোক সর্বাবস্থায়- তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ফরয।

ফতোয়ার দলিল:-

এক. কুরআন থেকে বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ ফরয হওয়ার দলিল-

প্রথম দলিল :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (سورة البقرة: 278)**

হে ইমানদারগণ, তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং (লোকদের নিকট এখনোও) তোমাদের যে সুদ পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও। -সুরা বাকারা, ২৬৮

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন,

**هذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام؛ لكن امتنعوا من ترك الربا. فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا. والربا هو آخر ما حرمه الله وهو مال يؤخذ برضا صاحبه. فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم فكيف بمن يترك كثيرا من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار.**

**وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة، والزكاة، أو صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش، أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا، أو الميسر، أو عن الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب، ونحو ذلك من شرائع الإسلام، فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله) ... مجموع الفتاوى 545 – 544 : 28 :ط. مجمع فهد لطباعة المصحف الشريف1416 :هـ.(**

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তায়েফবাসীর ব্যাপারে, যখন তারা ইসলামগ্রহণ করে এবং নামায-রোযাও পালন করতে শুরু করে। কিন্তু তারা সুদভিত্তিক লেনদেন ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দেন যে, যদি তারা সুদী মুয়ামালা পরিত্যাগ না করে তাহলে তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। অথচ সুদকে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষে নিষিদ্ধ করেছেন এবং সুদ অন্যের সন্তুষ্টক্রমেই নেওয়া হয়। সুতরাং যদি সুদগ্রহণকারীরাই আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ ওয়াজিব হয়ে যায়, তাহলে তাতারদের

মত যারা শরিয়তের অনেক বা অধিকাংশ বিধান পালনে অস্বীকৃতি জানায় তাদের কথা তো বলাইবাহুল্য।

উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন সংঘবদ্ধ দল ইসলামের প্রকাশ্য ও স্বতস্বিদ্ধ কোন বিধান ত্যাগ করে, তবে সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যক। এমনকি যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্যও দেয় কিন্তু নামায, রোযা, হজ, যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকে কিংবা নিজেদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রয়োগে অস্বীকৃতি জানায়, মদ, জুয়া, সুদ, যিনা, মাহরামকে বিবাহ করা, অন্যায়ভাবে কারো জান-মাল নষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়কে নিষিদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়, কিংবা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ওদের উপর জিযিয়া আরোপ করা থেকে বিরত থাকে তবে এই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যতক্ষণ না শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। -মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫৪৪-৫৪৫

দ্বিতীয় দলিল:

**قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. (سورة التوبة : 29)**

তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবদের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে না, এবং সত্যদিনের অনুসরণ করে না, যতক্ষণ না তারা লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়ে নিজ হাতে জিযয়া প্রদান করে। -সুরা তাওবা, আয়াত, ২৯

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ. বলেন,

**اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب إذا كانوا موصوفين بصفات أربعة ، وجبت مقاتلتهم إلى أن يسلموا، أو إلى أن يعطوا الجزية.**
**فالصفة الأولى : أنهم لا يؤمنون بالله.....**
**والصفة الثانية : من صفاتهم أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر.....**

**الصفة الثالثة : من صفاتهم قوله تعالى : {وَلاَ يُحَرِمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ} وفيه وجهان : الأول : أنهم لا يحرمون ما حرم في القرآن وسنة الرسول . والثاني : قال أبو روق : لا يعملون بما في التوراة والإنجيل، بل حرفوهما و أتوا بأحكام كثيرة من قبل أنفسهم.**

**الصفة الرابعة : قوله : {وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحق مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب } )تفسير الرازي: 16 : 25 ط. دار إحياء التراث العربي: 1420 هـ.(**

আল্লাহ তায়ালা আয়াতে বলছেন, আহলে কিতাবরা চারটা অপরাধে অপরাধী হওয়ার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে গেছে, এক. তারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখে না .... দুই. শেষ দিবসকে বিশ্বাস করে না ..... তিন. "আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে না"। এর দুটি ব্যাখা হতে পারে, ক. তারা কুরআন-সুন্নাহয় নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে না। খ. তারা তাওরাত-ইনজীলের বিধান অনুযায়ী আমল করে না। বরং তারা সেগুলোকে বিকৃত করেছে এবং নিজেরা মনগড়া অনেক বিধান প্রণয়ন করেছে। চার. তারা সত্যদিনের অনুসরণ করে না। .....

দেখুন, আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধের একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করছেন যে, তারা আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে না এবং নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন আইন তৈরী করে। তাহলে যদি আল্লাহ তায়ালার বিধান না মেনে নিজেদের মনগড়া কিছু বিধানের অনুসরণের কারণে কাফের-মুশরিকদের সাথেই যুদ্ধ করা আবশ্যক হয় তাহলে যে মুসলিম শাসকবর্গ আল্লাহ তায়ালার বিধানকে সম্পূর্ণরুপে বাদ দিয়ে কাফের-মুশরিকদের তৈরী বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি ওয়াজিব হবে না?

সাইয়েদ কুতুব রহ. এই বাস্তবতাটি অতি সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন, তিনি বলেন,

هذه الآية – والآيات التالية لها في السياق – كانت تمهيداً لغزوة تبوك؛ ومواجهة الروم وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب . . وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة؛ وأنها إثبات حالة و اقعة بصفاتها القائمة . وهذا ما يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع . . فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أنها شروط لقتال أهل الكتاب؛ إنما ذكرت على أنها أمور و اقعة في عقيدة هؤلاء الأقوام وو اقعهم؛ وأنها مبررات ودو افع للأمر بقتالهم .ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته وو اقعه كعقيدتهم وو اقعهم. .

وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة:

أولاً : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .ثانياً : أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله .ثالثاً : أنهم لا يدينون دين الحق .ثم بين في الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق(في ظلال القرآن: تفسير سورة التوبة، 3 : 1631 ط. : دار الشروق: 1412 هـ.(

এই আয়াত ও এর পরবর্তী আয়াতসমূহ তাবুক যুদ্ধ এবং রোম ও তাদের দোসর আরব খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধের ভূমিকাস্বরুপ অবতীর্ণ হয়েছে। এ থেকে বুঝে আসে, যাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে আয়াতে উল্লিখিত অবস্থাগুলো ওদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ... বিষয়গুলো এজন্য উল্লেখ করা হয়নি যে, এগুলো ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত। বরং এগুলো হলো তাদের বাস্তব আকিদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির বিবরণ এবং তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেওয়ার কারণ বা অনুঘটক। সুতরাং যাদের আকিদা-বিশ্বাস ও কর্মনীতি এরুপ হবে তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।-ফি যিলালিল কুরআন, ৩/১৬৩১

অন্যত্র তিনি বলেন,

إنها مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض، وتحقيق منهجه في حياة الناس؛ ومطاردة الشياطين ومناهج الشياطين؛ وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس، والناس عبيد الله وحده لا يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه.....

إنها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض، بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك... .

ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من المسلمين، فلم يُسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول:خرجنا ندافع عن وطننا المهدد! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة!

لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر، وحذيفة بن محصن، والمغيرة بن شعبة جميعاً لرستم – قائد جيش الفرس في القادسية -، وهو يسألهم واحداً بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية قبل المعركة:ما الذي جاء بكم؟ فيكون الجواب:الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه، فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه. ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر . (في ظلال القرآن: تفسير سورة الأنفال، 3 : 1440 ؛ وراجع لهذه الحكاية: تاريخ الطبري: 517 - 524 ط. دار التراث: 1387 هـ ؛ البداية والنهاية: 7 : 46 ط. دار إحياء التراث العربي: 1408، هـ ؛ وحياة الصحابة للشيخ العلام يوسف الكاندهلوي: 1 : 257 - 259 ط. مؤسسة الرسالة الأولى، 1420 هـ)

এবিষয়গুলো হলো পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান বাস্তবায়ন, শয়তানের অনুসারী ও তাদের রচিত জীবনবিধান দূরীকরণ এবং যারা

মানুষকে গোলাম বানায় তাদের ক্ষমতা ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার কারণ ও প্রেরণা। কেননা মানুষ শুধু আল্লাহর গোলাম, সুতরাং কেউ মানুষকে নিজের মনগড়া বিধিবিধান দ্বারা শাসন করতে পারবে না।

এ বিষয়গুলো হলো মানুষকে মানুষের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দাসত্বের দিকে নিয়ে আসার মাধ্যমে তাকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেওয়ার যৌক্তিকতা ও কারণ। এ যৌক্তিকতা ও প্রেরণা মুসলিম যোদ্ধাদের মনে গেথে গিয়েছিল, তাই তাদের কাউকে যখন প্রশ্ন করা হতো, তোমরা কেন যুদ্ধ করতো এসেছো? তখন তাদের কেউ এ উত্তর দিতো না যে, আমরা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য জিহাদে বের হয়েছি, কিংবা আমাদের উপর রোম-পারস্যের আগ্রাসন রোধ করার জন্য ময়দানে নেমেছি, অথবা রাজ্যবিস্তার ও গণীমত লাভ করার জন্য যুদ্ধে এসেছি।

বরং তাদের সবাই একবাক্যে সেই উত্তরই দিতো যা রিবয়ী বিন আমের, হুযাইফা বিন মিহসন এবং মুগীরা বিন শোবা রাযি. পারস্যের সেনাপতি রুস্তমকে দিয়েছিলেন, সে লাগাতার তিনদিন পর্যন্ত একজন একজন করে এই তিন মুসলিম দূতকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কেন এসেছো? জবাবে তারা সকলেই বলে, আমরা আল্লাহর আদেশে বের হয়েছি- মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে বের করে আনার জন্য এবং সকল ধর্মের যুলুম-অত্যাচারমূলক বিধান থেকে মুক্ত করে ইসলামের আদল ও ইনসাফভিত্তিক বিধি-বিধানের ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য। আল্লাহ তার দ্বীন দিয়ে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা এ দ্বীনগ্রহণ করবে আমরা তাদের ভূমি তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবো, আর যারা (ইসলামগ্রহণ বা জিযিয়া দিয়ে ইসলামের বশ্যতা) গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো, যতক্ষণ না আমরা বিজয় লাভ করি কিংবা শাহাদাত লাভ করতে জান্নাতে পৌঁছতে পারি।– ফি যিলালিল কুরআন, ৩/১৪০ রিবয়ী বিন আমের ও তার সঙ্গী সাহাবীদের ঘটনাটি জানার জন্য দেখুন, তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক, ইমাম তবারী, ৫১৭-৫২৪ আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, ইবনে কাসীর, ৭/৪৬ হায়াতুস সাহাবা, ইউসুফ কান্ধলবী, ১/২৫৭

সুন্নাহ থেকে দলিল: প্রথম দলিল:

عن يحيى بن حصين، عن جدته أم الحصين، قال :سمعتها تقول: ... قال رسول الله ﷺ قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: «إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت - أسود، يقودكم بكتاب الله تعالى، فاسمعوا له وأطيعوا». رواه مسلم: (1298 (

وفي رواية : إن أمر عليكم عبد مجدع - قال: أراها قالت - أسود يُقِيْمَ فيكم كتابَ الله فاسمعوا وأطيعوا. أخرجه أبو عوانه في صحيحه (3553، 7100 (

وفي رواية : «يأخذكم بكتاب الله». أخرجه أبو عوانه في صحيحه أيضا (7097(

وفي رواية : يا أيها الناس، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. أخرجه أحمد في مسنده: (16649 (والترمذي في جامعه (1706)، وقال الترمذي: (هذا حديثٌ حسن صحيح). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: (إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن يحيى بن حصين وأمه- يعني جدته أم الحصين- لم يخرج لهما سوى مسلم (

وفي رواية : «ما أقام لكم دين الله». أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: (2391) وقال محققه: (إسناده صحيح رجاله ثقات كلهم.(

قال الشيخ عبد الحق الدهلوي(يقودكم بكتاب الله) أي: يأمركم بدين الله ويحكم به. (لمعات التنقيح: 449/6 ط. دار النوادر، 1435 هـ

وقال الشيخ المباركفوري: قوله : (ما أقام لكم كتاب الله) أي حكمه المشتمل على حكم الرسول. (تحفة الأحوذي5 : 297 ط. دار الكتب العلمية.(

ইয়াহইয়া বিন হাসীন বলেন, আমি আমার দাদী থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় হজ্জে বলতে শুনেছি, যদি কোনো নাক-ঠোঁট কাটা হাবশী গোলামকেও তোমাদের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়, যে তোমাদেরকে কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী পরিচালনা করে, তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করবে। -সহিহ মুসলিম, ১২৯৮

মুসনাদে আহমদ ও জামে' তিরমিযির বর্ণণায় এভাবে এসেছে, "তোমরা তার আনুগত্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর বিধান কায়েম করবে।" -জামে তিরমিযি, ১৭০৬ ; মুসনাদে আহমদ, ১৬৬৪৯

মুসনাদে ইসহাকের বর্ণণায় এভাবে এসেছে, "তোমরা তার আনুগত্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে"। -মুসনাদে ইসহাক, ২৩৯১

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৫৪৪ হি.) উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

**قوله: "عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله" أى بالإسلام وحكم كتاب الله، وإن جار. (إكمال المعلم: 6 : 265 ط. دار الوفاء: 1419 .(**

"তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, অর্থাৎ ইসলাম ও কোরআন-সুন্নাহর বিধান দ্বারা পরিচালনা করে, যদিও সে যুলুম করে" (তথাপি তোমরা তার আনুগত্য করো)। -ইকমালুল মু'লিম, ৬/২৬৫

দ্বিতীয় দলিল:

**عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر، لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله، فقال أبو بكر ﷺ :لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه قال عمر، ﷺ: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق». صحيح البخاري: (2443) صحيح مسلم: (20(**

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর যখন আবু বকর খলীফা নিয়োজিত হন এবং আরবরা ব্যাপকভাবে মুরতাদ হয়ে যায় তখন উমর রাযি. বলেন, আপনি কিভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন অথচ (তারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেও কালেমা তো পড়েছে আর) রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা কালেমা পড়ে, সুতরাং যে কালেমা পড়বে সে তার জানমাল আমার থেকে নিরাপদ করে নিল, তবে সে ইসলামের কোন হক বিনষ্ট করলে ভিন্ন কথা। আর তার হিসাব তো আল্লাহ তায়ালাই নিবেন। তখন আবু বকর রাযি. বললেন, যারা নামায-রোযার মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবোই, কেননা যাকাত হলো সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ যদি তারা আমাকে একটি রশিও না দেয় যা তারা রাসুলের নিকট যাকাত হিসেবে প্রেরণ করতো তবুও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। উমর রাযি. বলেন, (আবু বকরের কথা শুনে) আমি বুঝতে পারি আল্লাহ তায়ালা আবু বকরের অন্তরকে যুদ্ধের জন্য খুলে দিয়েছেন, সুতরাং তাঁর মতই সঠিক। -সহিহ বুখারী, ২৪৪৩ সহিহ মুসলিম, ২০

ইমাম নববী রহ. বলেন,

**وفيه وجوب قتال ما نعى الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الاسلام قليلا كان أوكثيرا لقوله ﷺ: «لو منعونى عقالا أو عناقا». (شرح النووي على مسلم: 1 : 212 ط. دار إحياء التراث العربي: 1392 هـ).**

এ হাদিস প্রমাণ করে, যারা নামায পড়তে বা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব, তেমনিভাবে যারা ইসলামের আবশ্যকীয় বিধানগুলো পালনে অস্বীকৃতি জানাবে তাদেরও একই হুকুম। চাই তা কম হোক বা বেশি, কেননা আবু বকর রাযি. বলেছেন, যদি তারা আমাকে একটা রশি বা একটা বকরীর বাচ্চাও (যাকাত হিসেবে) দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদের সাথে আমি যুদ্ধ করবো। -শরহু মুসলিম, ১/২১২

ইমাম বুখারী এই হাদিসের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

**باب قتل من أبى قبول الفرائض**

যারা ফারায়েয কবুল করতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের হত্যা করার বিধান। -সহিহ বুখারী, ১২/২৭৫ দারুল মা'রেফা।

এর ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাযার বলেন,

**أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أخذت منه قهرا ولا يقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع، قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده، قال ابن بطال: مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك. (فتح الباري: 27612 - 275 : ط. دار الفكر.(**

অর্থাৎ যারা ইসলামের আবশ্যকীয় বিধানাবলী পালনে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের হত্যার বৈধতা। মুহাল্লাব বলেন, যদি কেউ ইসলামের কোন ফরয বিধান, যেমন যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে যদি সে যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টিকে স্বীকার করে তাহলে তার থেকে জোরপূর্বক যাকাত উসুল করা হবে, তবে তাকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু যদি যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানানোর পাশাপাশি যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায় তবে তার সাথে যুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। ইমাম মালেক মুয়াত্তাগ্রন্থে বলেন, "যদি কেউ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং মুসলমানরা তার থেকে যাকাত নিতে অক্ষম হয়ে যায়, তবে তাদের উপর ওয়াজিব হবে তার সাথে যুদ্ধ করা", ইবনে বাত্তাল রহ বলেন, ইমাম মালেকের উদ্দেশ্য হলো, যদি যাকাত ফরয হওয়াকে স্বীকার করে যাকাত দিতে অস্বীকার জানায় তাহলে যুদ্ধ করতে হবে, আর এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। - ফাতহুল বারী, ১২/২৭৫-২৭৬

তৃতীয় দলিল:

**عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «قَالَ سَلْمَانُ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا اقْتَتَلَ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ؟ قَالَ: إِذًا أَكُونُ مَعَ الْقُرْآنِ، قَالَ :نِعْمَ الزُّوَيْدُ: إِذًا أَنْتَ». أخرجه ابن أبي شيبة: (30926(**

তারেক বিন শিহাব বলেন, সালমান রাযিআল্লাহু আনহু যায়েদ বিন সুহানকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন (আহলে) কুরআন ও শাসকের মধ্যে যুদ্ধ হবে তখন তুমি কি করবে, যায়েদ বললেন, আমি (আহলে) কুরআনের পক্ষ অবলম্বন করবো,

সালমান রাযিআল্লাহু আনহু (খুশি হয়ে) বললেন, তাহলে তুমি কতই না উত্তম যায়েদ হবে। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৩০৯২৬

**عَن كَعْبٍ، قَالَ: «يَقْتَتِلُ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ قَالَ: فَيَطَأُ السُّلْطَانُ عَلَى صِمَاخِ الْقُرْآنِ فَلَأْيًا بِلَأْيٍ، وَلَأْيًا بِلَأْيٍ، مَا تَنْفَلِتُنَّ مِنْهُ .«أخرجه ابن أبي شيبة: (30927) و أبو عبيد في فضائل القرآن: (132(**

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার টিকায় শায়েখ আওয়ামা বলেন,

**والمعنى - والله أعلم سيكون اقتتال بين أهل القرآن والسلطان، وتكون الغلبة لأهل القرآن، وتكون شدَّةً بشدةٍ، قلَّ ما تنفلتن وتنجون منها. (تعليق الشيخ عوامه على المصنف : 562/15 ط. دار القبلة(**

উল্লিখিত আছরটির অর্থ হলো, অচিরেই কুরআনের অনুসারী ও বাদশার অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ হবে, এবং কুরআনের অনুসারীদেরই বিজয় হবে। তবে হবে যুদ্ধ ঘোরতর, তোমাদের কম লোকই তার ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবে। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ১৫/৫৬২

তিন. বিধান পরিবর্তনকারী শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য:-

১. হানাফী মাযহাবের শীর্ষাস্থনীয় ফকিহ ইমাম তহাবী রহ. বলেন,

**سمعت محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخزاعي أبا عبد الله يذكر: أن العمري العابد، وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، جاء إلى مالك، فقال له: يا أبا عبد الله، قد نرى هذه الأحكام التي قد بُدِّلَت، أفيسعنا مع ذلك التخلف عن مجاهدة من بَدَّلها، فقال له مالك: إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف عن ذلك، وإن لم يكن معك هذا العدد من أمثالك فأنت في سعة من التخلف عن ذلك، وكان هذا الجواب من مالك أحسن جواب، و إنما أخذه عندنا، والله أعلم من قول النبي ﷺ في حديث ابن**

عباس الذي رويناه: "ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة "، وبالله التوفيق. (شرح مشكل الآثار: 51/2)

আমি মুহাম্মদ বিন ঈসাকে বলতে শুনেছি, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আলউমরী ইমাম মালেকের কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, এই যে আমরা শরীয়তের বিধি-বিধান পরিবর্তন হতে দেখছি, এখন কি আমাদের জন্য বিধান পরিবর্তনকারীদের সাথে জিহাদ না করে বসে থাকা বৈধ হবে? ইমাম মালেক বললেন, যদি তোমার সাথে তোমার মত বারোহাজার লোক থাকে তাহলে তোমার জন্য যুদ্ধ হতে বিরত থাকা বৈধ হবে না। আর যদি না থাকে তাহলে তোমার জন্য জিহাদ না করার অবকাশ রয়েছে। (ইমাম তহাবী বলেন) ইমাম মালেক যে উত্তর দিয়েছে তা অত্যন্ত সুন্দর, আমাদের ধারণা অনুযায়ী ইমাম মালেক রহ. এই উত্তর দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, "বারোহাজারের বাহিনী সংখ্যাসল্পতার কারণে কখনো পরাজয় বরণ করবে না" এর ভিত্তিতে।

বর্তমান যুগের জিহাদবিরোধী আলেমদের নিকট এসে কেউ উক্ত প্রশ্ন করলে সে নির্দ্বিধায় বলে দিবে, "বিধান পরিবর্তনের কারণে শাসক কাফের হয়ে যায় না। আর কুফর ব্যতীত শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়। তাছাড়া জিহাদের জন্য ইমাম প্রয়োজন। আমাদের তো ইমাম নেই।" অথচ ইমাম মালেক এসব কিছুই বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, "তোমার সাথে তোমার মতো বারোহাজার লোকের বাহিনী থাকলে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।" এ থেকে সুস্পষ্টরুপে বুঝে আসে, শক্তি ও সক্ষমতা থাকলে বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। হাঁ, ইমাম মালেক এটাও বলেছেন, বারোহাজার লোক না থাকলে তখন (শক্তি না থাকার কারণে) যুদ্ধ ওয়াজিব হবে না। তবে বিধান পরিবর্তন কারী শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ করা বৈধ নয়, যারা করবে তারা খারেজী, এমন কিছুই ইমাম মালেক বলেননি।

পাঠক আরো লক্ষ্য করুন, এখানে ইমাম তহাবী বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে ইমাম মালেকের ফতোয়াকে সমর্থণ করেছেন, তার ফতোয়ার প্রশংসা করছেন, অথচ ইমাম তহাবী যালেম শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধকে বৈধ মনে করেন না, তিনি তার রচিত আকীদার কিতাবে সুস্পষ্টরুপে বলেছেন,

**ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. وإن جاروا) .العقيدة الطحاوية: ص: 24 ط. دار ابن حزم: 1416 (**

‘আমরা শাসক ও গভর্ণরদের বিপক্ষে বিদ্রোহকে বৈধ মনে করে না। যদিও তারা যুলুম করে। -আলআকীদাতুত তহাবীয়্যাহ, পৃ: ২৪

এ থেকে সুস্পষ্টরুপে প্রতীয়মান হয় যে, যালেম শাসকের হুকুম আর বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের হুকুম এক নয়, যালেম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করতে যে সব হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে তা বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়।

পাঠক যদি এর সাথে ইমামুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর এই কর্মনীতি যুক্ত করেন যে, “তিনি কোন মাসয়ালায় ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য না পেলে ইমাম আবু ইউসুফের মত গ্রহণ করতেন, আবু ইউসুফের মত না পেলে ইমাম মুহাম্মদের মত, তাও না পেলে ইমাম তহাবীর মত তালাশ করতেন। যদি তিনি ইমাম তহাবীর মত পেয়ে যেতেন তাহলে সেটাই গ্রহণ করতেন” তাহলে আশা করি বিধান পরিবর্তনকারী শাসকের সাথে যুদ্ধই যে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত তা বুঝতে আপনার খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ আমরা দেখবো যে, ইমাম আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী ও মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর মতও এমনই এবং ইমাম আবু হানিফার মতও এমন হওয়াই যুক্তিযুক্ত (কাশ্মিরী রহিমাহুল্লাহুর মূলনীতিটি জানার জন্য দেখুন- তারাজিমু সিত্তাতিম মিনাল ফুকাহা, শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, পৃ: ৩৯ প্রকাশনা: মাকতাবুল মাতবুয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.

২. কাযী ইয়ায রহ বলেন,

**لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه، وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذلك عند جمهورهم البدعة. وذهب بعض البصريين إلى أنها تنعقد لها وتستديم على التأويل، فإذا طرأ مثل هذا على وال من كفر أو تغيير شرع أو تأويل بدعة، خرج عن حكم الولاية**

**وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك. (إكمال المعلم 6/246 :ط. دار الوفاء: 1419 هـ(.**

উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ'আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ'আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা'বিলকারী। অতএব শাসক যদি এজাতীয় কাজগুলোর কোন একটি, যেমন, কুফর, শরীয়া পরিবর্তন অথবা বিদ'আতে লিপ্ত হয়, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা, যদি এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। -ইকমালুল মু'লিম, ৬/২৪৬

৩. ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহও (মৃ: ৬৭৬ হি.) কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহুর উপরোল্লিখিত বক্তব্য সমর্থণ করেছেন। তিনি বলেন,

**قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة. قال :وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له، لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. (شرح مسلم للنووي: 229/12 ط. دار إحياء التراث العربي: 1392(**

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে

অপসারিত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জুমহুরের মতে শাসক যদি বিদ'আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ'আতির ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং সেটা স্থায়ী হবে, কেননা সে তা'বিলকারী। কাযী ইয়ায বলেন, শাসকের উপর যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়া পরিবর্তন করে অথবা বিদ'আত করে, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ফরজ হবে, সম্ভব হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নিযুক্ত করা। -শরহু মুসলিম, ১২/২২৯

ইমাম নববী অন্যত্র বলেন,

**لا يجوز الخروجُ على الخُلفاءِ بمجرَّدِ الظلمِ أو الفسق ما لم يُغَيِّرُوْا شيئا من قَواعد الإسلام.(شرح مسلم للنووي: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، 12 : 244 ط. دار إحياء التراث العربي:1392(**

শুধুমাত্র জুলুম ও ফিসকের কারণে খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়, **যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোনো মৌলিক বিধানকে পরিবর্তন করে।** শরহে মুসলিম, ১২/২৬৬

এ পর্বে এখানেই শেষ করছি, আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ আরো কয়েকজন আলেমের বক্তব্য, পাশাপাশি এ মাসয়ালায় আল্লামা তাকী উসমানীর বক্তব্যের পর্যালোচনাও পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পর্বের লিংক –

https://dawahilallah.com/showthread....%২৬%২৩২৫৩৫%৩B)

দ্বিতীয় পর্বের লিংক

https://dawahilallah.com/showthread....%২৬%২৩২৫৩৬%৩B)

**পোস্ট লিংক:** https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫১৩২

# ইমারাহ ও খিলাফাহ : পরিচিতি, বিধান ও পার্থক্য

Munshi Abdur Rahman

Moderator

১০-২০-২০১৯

## ইমারাহর প্রকারভেদ

ইমাম ইবনু জামাআহ রহ. তাহরিরুল আহকাম গ্রন্থে লেখেন :

**الإمارة قسمان: عامة وخاصة. أما الإمارة العامة: فهي الخلافة.**

ইমারাহ দুই প্রকার : সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণ ইমারাহ হলো খিলাফাহ। তাহরিরুল আহকাম : ৭৯

সুতরাং বোঝা গেল, ইমারাহ শব্দটি খিলাফাহ শব্দের তুলনায় ব্যাপক। ইমারাহ শব্দের একটি ব্যবহার হলো খিলাফাহর সমার্থক। তবে ইমারাহ শব্দটি খিলাফাহ ছাড়া অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বোঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন এর দ্বারা সাধারণ ইমারাহ নয়; বরং বিশেষ ইমারাহ উদ্দেশ্য হয়।

## ইমারাহর বিধান

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ**

হে ইমানদাররা, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসুলের ও তোমাদের মধ্যে যারা ইমারাহর অধিকারী তাদের। সুরা নিসা: ৫৯

**وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ**

তাদের কাছে যখন কোনো সংবাদ আসে—তা শান্তির হোক বা ভীতির—তারা তা (যাচাই না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি তা রাসুল বা যারা ইমারাহর অধিকারী, তাদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার তার তথ্য অনুসন্ধানী তারা তার বাস্তবতা জেনে নিত। সুরা নিসা: ৮৩

উপরিউক্ত আয়াত দুটো দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে ইমারাহর অধিকারী ব্যক্তিবর্গ থাকবে। আল্লাহ তাআলা মুসলিম জনসাধারণের ওপর যাদের আনুগত্য করার এবং সংশয়পূর্ণ বিষয় যাদের দিকে ন্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর স্বীকৃত মূলনীতি হলো, কুরআনে যখন আদেশবাচক ক্রিয়া ব্যবহার হয়, তখন সাধারণভাবে তা অপরিহার্যতা বোঝায়। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে হবে, যে তাদের আমির হবে। আর জনসাধারণের ওপর অপরিহার্য হবে তার আনুগত্য করা। তবে আমিরের আনুগত্য নিঃশর্ত হবে না; বরং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের অধীন হবে। যার কারণে আল্লাহ ও রাসুল শব্দদ্বয়ের গুরুত্ব স্বতন্ত্রভাবে 'আনুগত্য করো' ক্রিয়াটি ব্যবহার করা হলেও 'তোমাদের মধ্যে যারা ইমারাহর অধিকারী তাদের' আনুগত্য নির্দেশ করার জন্য 'আনুগত্য' শব্দটির পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, মূলত আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। আমির যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতিনিধিত্ব করে, তখন তার আনুগত্য মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই আনুগত্য হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

**إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ**

তিনজন ব্যক্তি সফরে বের হলে তারা যেন তাদের একজনকে আমির বানিয়ে নেয়।
সুনানু আবি দাউদ: ২৬০৮, ২৬০৯; সহিহ ইবনু খুজায়মা: ২৫৪১

আল্লামা শাওকানি রহ. বলেন :

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَإِذَا شُرِّعَ هَذَا لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ يُسَافِرُونَ فَشَرْعِيَّتُهُ لِعَدَدٍ أَكْثَرَ يَسْكُنُونَ الْقُرَى وَالْأَمْصَارَ وَيَحْتَاجُونَ لِدَفْعِ التَّظَالُمِ وَفَصْلِ التَّخَاصُمِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ. وَقَدْ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ إلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ وَاجِبَةٌ.**

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তিনজন ব্যক্তি যদি পৃথিবীর কোনো প্রান্তরে থাকে তাহলে

তাদের জন্য একজনকে আমির বানানো ছাড়া বসবাস বৈধই হবে না।' ইমাম আহমদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মাত্র তিনজন ব্যক্তি কোনো প্রান্তরে থাকলে বা সফরে বের হলে তাদের জন্যই যখন আমির নির্ধারণ করার বিধান শরিয়াহয় বিধিবদ্ধ হলো তখন বিপুল সংখ্যক মানুষ যদি মফস্বলে বা নগরে বসবাস করতে থাকে এবং তারা পারস্পরিক অত্যাচার প্রতিরোধ ও বিবাদ-বিসংবাদ সমাধানের দিকে মুখাপেক্ষী থাকে—তাদের জন্য এই শরিয়াহসিদ্ধি তো আরও অধিক উপযুক্ত ও সমীচীন। এই হাদিসে সেসব ইমামের বক্তব্যের দলিল রয়েছে, যারা বলেন, মুসলমানদের ওপর শাসক, প্রশাসক ও বিচারক নিযুক্ত করা ওয়াজিব। আর অধিকাংশ আলিমই এই মত পোষণ করেছেন যে, শাসনকার্য ওয়াজিব। নাইলুল আওতার: ৮/২৯৪

ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন :

**يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ؛ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إِلَّا بِهَا.**

জেনে রাখা অপরিহার্য, মানুষের বিষয়আশয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবসমূহের মধ্যে অন্যতম। বরং দ্বীন ও দুনিয়া কোনোটাই এ ছাড়া চলতে পারে না। মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৯০

সুতরাং ব্যাপক অর্থে ইমারাহর অপরিহার্যতা কুরআন ও সহিহ হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত।

## আমিরুল মুমিনিন

আমিরুল মুমিনিন ও খলিফাতুল মুসলিমিন শব্দ দুটো সমার্থক। আমিরুল মুমিনিন উপাধিটি সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছিলেন দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তার পর থেকে এ দুটো শব্দ সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সুতরাং সাধারণ আমির শব্দের তুলনায় আমিরুল মুমিনিন শব্দটি ব্যাপক। একটি খিলাফাহভিত্তিক রাষ্ট্রের অধীনে অনেক ইমারাহ থাকতে পারে। যেমন, উমর রা.-এর যুগে ইয়েমেন, শাম এবং মিশরে ইমারাহ ছিল। তবে তা স্বতন্ত্র ছিল না; বরং কেন্দ্রীয় ইমারাহর নেতৃত্বেই তা পরিচালিত হতো। আমিরুল মুমিনিনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক ইমারাহয় তার প্রতিনিধি নিযুক্ত থাকত; যাদেরকে 'আমির' বা 'ওয়ালি' ইত্যাদি নামে

নামকরণ করা হতো। এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, আমিরুল মুমিনিন একজনই হন। তবে তার অধীনে আরও অনেক আমির থাকতে পারে, যারা হবে তার প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত।

## খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার বিধান

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের সর্বসম্মত মত হলো, মুসলমানদের জন্য খলিফা থাকা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ইমাম কুরতুবি, মাওয়ারদি, নববি এবং ইবনু হাজম রহ. প্রমুখ বিদগ্ধ আলিমগণ উম্মাহর ইজমা বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য—আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবি: ১/২৬৪; আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ারদি: ৫; শরহু সহিহ মুসলিম, নববি: ১২/২০৫; আল-ফাসল, ইবনু হাজম: ৪/৮৭। প্রয়োজনে আরও দেখুন—শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহ. রচিত ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা, আল্লামা তাফতাজানি রহ. রচিত শারহুল আকায়িদ এবং মাওলানা ইদরিস কান্ধলবি রহ. রচিত আকায়েদুল ইসলাম।

প্রতিটি ইজমার ভিত্তি হয় কুরআন ও সুন্নাহ। খিলাফার প্রতিষ্ঠা উম্মাহর ওপর অপরিহার্য—এই মাসআলার ওপর গোটা উম্মাহ যে ঐকমত্য পোষণ করেছে, এর পেছনে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর দলিল থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে পূর্বে উল্লেখিত দলিলগুলোর পাশাপাশি এই হাদিসটিও এক সুদৃঢ় ভিত্তি :

**مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً**

যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার গলায় কোনো বাইয়াত নেই, সে জাহিলি মৃত্যু বরণ করল। সহিহ মুসলিম: ১৮৫১

হাদিসে উল্লেখিত 'বাইয়াত' দ্বারা খলিফার উদ্দেশে প্রদত্ত বাইয়াত উদ্দেশ্য। এই সহিহ হাদিসের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মুসলমানদের কোনো একজন খলিফা থাকতে হবে। যেই যুগে মুসলমানদের কোনো খলিফা থাকবে না, তা হবে জাহিলি যুগ। তবে আমাদের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এখানে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, যে যুগে মুসলমানদের কোনো খলিফা থাকে না, সে যুগে যারা মারা যাবে, তারা সবাই কি জাহিলি মৃত্যু বরণ করবে? আমরা উত্তরে বলব, না, যদি খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের যথাযথ প্রচেষ্টা থাকে, তাহলে তাদের মৃত্যু জাহিলি মৃত্যু হবে না ইনশাআল্লাহ। খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা বাস্তবায়িত হবে—যারা দ্বীনের বিজয় ও শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের প্রাণ, সম্পদ ও

সর্বস্ব উৎসর্গ করে আল্লাহর পথে তাগুতের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে বাইয়াত প্রদান করার মাধ্যমে। তবে আমরা এই বাইয়াতকে ওয়াজিব বলি না। আমরা বলি, আশা করা যায়, এই বাইয়াত আল্লাহর কাছে ওজর হিসেবে বিবেচিত হবে। বান্দা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, 'হে আমার প্রতিপালক, যারা পৃথিবীতে খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে সংগ্রামরত ছিল, তাদেরকে বাইয়াত দেওয়ার মাধ্যমে আমি আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছি। সুতরাং তুমি আমার অপারগতা ক্ষমা করো, আমার ত্রুটি মার্জনা করো।' হাদিসে যে জাহিলি মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে—এটা ওই ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, যে খলিফা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরিয়াহর দৃষ্টিতে বিবেচ্য কোনো অপারগতা ছাড়া তাকে বাইয়াত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। আর এখানে বাইয়াত দেওয়া দ্বারা খলিফার বাইয়াত সংঘটিত হওয়া এবং বৈধ সব বিষয়ে তার আনুগত্য অপরিহার্য হওয়ার বিশ্বাস লালন করা উদ্দেশ্য। কারণ, দারুল ইসলামে খলিফা হওয়ার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের বাইয়াত গ্রহণ করা শর্ত নয়, এমনকি বর্তমানকালে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তা সম্ভবও নয়।

## খলিফার শর্তাবলি

### খলিফার শর্তাবলি নিম্নরূপ :

**মুসলিম হওয়া।** সুরা নিসা: ৪১; সুরা নিসা: ৫৯; আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ইবনুল কায়্যিম: ২/৭৮৭; শরহু সহিহ মুসলিম, নববি: ১২/২২৯

**প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।** সুরা নিসা: ৫; আল-ফাসল, ইবনু হাজম: ৪/৮৯

**সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়া।** মারাতিবুল ইজমা, ইবনু হাজম: ১৫৪

**স্বাধীন হওয়া।** ফাতহুল বারি: ২০/১৬০

**পুরুষ হওয়া।**আল-ফাসল, ইবনু হাজম: ৪/৮৯

**ন্যায়পরায়ণ হওয়া।** আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবি: ১/২৭০

**কুরাইশ বংশের হওয়া।**সহিহ বুখারি: ৭১৩৯, ৭১৪০; মুসনাদু আহমাদ: ২০/২৪৯; শরহু সহিহ মুসলিম: ১২/২০০, তবে একান্ত কুরাইশ বংশের যোগ্য কাউকে না পাওয়া গেলে অন্য কেউও খলিফা হতে পারবে। মুসনাদুল বাযযার: ৬১৮১; তারিখে তাবারি: ২/৫৮০; ফাতহুল বারি: ১৩/১১৯; আত-তাহরির আলাল মুখতার: ১/৬৮

লোভী, প্রার্থী বা ক্ষমতালিপ্সু না হওয়া। সহিহ বুখারি: ৬৭৩০; সহিহ মুসলিম: ১৭৩৩

উপরিউক্ত শর্তগুলো সর্বসম্মত। সুতরাং এর কোনোটি অবিদ্যমান থাকলে ব্যক্তি খলিফা হওয়ার যোগ্য থাকে না। আর দুটো শর্ত রয়েছে মতবিরোধপূর্ণ :

ইজতিহাদের যোগ্য হওয়া। ইমাম শাতেবি আল-ইতিসাম: ২/১২৬, ইমাম রামালি নিহায়াতুল মুহতাজ: ৭/৪০৯ রহ. প্রমুখ ফকিহগণের মতে খলিফা হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত। তবে ইমাম শাহরাসতানি আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল: ১/১৫৩, ইমাম গাজালি ফাজায়িহুল বাতিনিয়্যাহ: ১৯১ রহ. প্রমুখ বিদগ্ধগণের মতে এটা শর্ত নয়। তবে তাদের মতানুসারে খলিফা নিজে যদি মুজতাহিদ না হন তাহলে কমপক্ষে তার এতটুকু ইলম থাকা বাঞ্ছনীয়, যতটুকু একজন শাসকের ইসলামি তরিকায় শাসনকার্য চালানোর জন্য জরুরি আর এক্ষেত্রে তার সঙ্গে আলিম ও ফকিহ উপদেষ্টা থাকা অপরিহার্য, শরয়ি বিষয়াদিতে যার পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা অনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন। দোষ-ত্রুটিমুক্ত হওয়া। অর্থাৎ তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও আত্মা সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া; যাতে তিনি শাসন ও বিচারকার্য, রাজনীতি ও সমর সবকিছুই সুচারুরূপে পরিচালনা করতে সক্ষম হন। ইমাম মাওয়ারদি আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ারদি: ১/৫, ও ইমাম আবু ইয়ালা আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আবু ইয়ালা: ২০, রহ. এ শর্তটির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এটা কোনো সর্বসম্মত শর্ত নয়। সুতরাং এটাকে চূড়ান্ত অপরিহার্য বলাও সমীচীন নয়।

## খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি

খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য আমরা প্রথমে ফিরে যাই খিলাফাতে রাশিদার যুগে। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তার আদর্শ ও তার মহান খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। চার খলিফার নির্বাচন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল এই :

**ক.** আবু বকর রা. নির্বাচিত হয়েছিলেন সাহাবিদের স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচনের দ্বারা। প্রথমে সাকিফায় আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ এর ব্যাখ্যা পরে আসছে। সাহাবিরা তাকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। এরপর মসজিদে সাধারণ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

**খ.** আবু বকর রা. মৃত্যুর পূর্বে উমর রা.-কে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। পরবর্তীতে তার তিরোধানের পর উমর রা. স্থলাভিষিক্ততার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেন। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ সাহাবিরাও তাকে মেনে নেন। পরবর্তীতে মসজিদে মুসলিম জনসাধারণের কাছ থেকে সাধারণ বাইয়াত নেওয়া হয়।

**গ.** উমর রা. তার শাহাদাতের পূর্বে ছয় সদস্যবিবিশিষ্ট একটি শুরা পরিষদ গঠন করে দিয়ে যান। পরবর্তীতে তারা উসমান রা.-এর ব্যাপারে একমত হয়ে তাকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন আর মুসলিম জনসাধারণ তাকে বাইয়াত দেয়।

**ঘ.** উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর অনেক প্রবীণ সাহাবির পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আলি রা. মসজিদে মুসলিম জনসাধারণের থেকে সাধারণ বাইয়াত গ্রহণ করেন। সে সময় তালহা ও জুবায়ের রা.-এর মতো আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ সাহাবিরাও তাকে বাইয়াত প্রদান করেন। ফলে তিনি খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। তার নির্বাচনপদ্ধতি আবু বকর রা.-এর নির্বাচনপদ্ধতির মতোই ছিল।

সুতরাং সাহাবিদের জীবনী থেকে আমরা খলিফা নির্বাচনের তিন ধরনের পদ্ধতির কথা জানতে পারি। ইমাম নববি রহ. বলেন :

**وَأَجْمَعُوا عَلَى انْعِقَادِ الْخِلَافَةِ بِالِاسْتِخْلَافِ وَعَلَى انْعِقَادِهَا بِعَقْدِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِإِنْسَانٍ إِذَا لَمْ يَسْتَخْلِفِ الْخَلِيفَةُ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ جَعْلِ الْخَلِيفَةِ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمَاعَةٍ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِالسِّتَّةِ**

এ ব্যাপারে আলিমগণের ইজমা রয়েছে যে, স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার দ্বারা খিলাফাহ সম্পন্ন হয়। আর খলিফা যদি কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে না যান, তাহলে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনের দ্বারাও তা সম্পন্ন হয়। এবং তারা আরও ইজমা করেছেন যে, পূর্ববর্তী খলিফার জন্য পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব কোনো জামাআতের মধ্যে পরামর্শের বিষয় হিসেবে রেখে যাওয়াও জায়িয; যেভাবে উমর রা. ছয় সদস্যের পরামর্শ পরিষদ গঠন করে রেখে গিয়েছিলেন। শরহু সহিহ মুসলিম, নববি: ১২/২০৫

## খলিফার বাইয়াত শুদ্ধ হওয়ার জন্য কি মুসলমানদের ঐকমত্য ও আন্তরিক সন্তুষ্টি শর্ত?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, খলিফার বাইয়াত শুদ্ধ হওয়ার জন্য সকলের ঐকমত্য শর্ত নয়। আলি রা.-কে তার সময়ে সকল মুসলমান বাইয়াত দেয়নি। এমনকি অনেক প্রবীণ সাহাবিও তাকে বাইয়াত দেননি। এতদ্*সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চতুর্থ খলিফা ছিলেন। ইমাম জুওয়াইনি রহ. আল-গিয়াসি গ্রন্থে লেখেন :

**مما نقطع به أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع.**

যে কথাটা আমরা অকাট্যতার সঙ্গে বলব তা হলো, সর্বসম্মতিক্রমে খিলাফাহ সম্পন্ন হওয়ার জন্য সকলের ঐকমত্য শর্ত নয়। আল-গিয়াসি: ৫২

তবে এটা ঠিক যে, খলিফার বাইয়াত শুদ্ধ হওয়ার জন্য অধিকাংশ মুসলিমের ঐকমত্য থাকা শর্ত; যাতে করে সকলের দ্বারা মুসলিম উম্মাহর সুদৃঢ় প্রতাপ ও সুসংহত প্রতিরক্ষা-শক্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

ইমাম জুওয়াইনি রহ. লেখেন :

**الشوكة لا بد من رعايتها، ومما يؤكد ذلك اتفاق العلماء قاطبة على أن رجلا من أهل الحل والعقد لو استخلى بمن يصلح للإمامة وعقد له البيعة لم تثبت الإمامة.**

শক্তির প্রতি লক্ষ করার কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়টিকে আরও সুদৃঢ় করে সকল আলিমের ঐকমত্য। কারণ, তারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তি যদি খিলাফাহর যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে একান্তে নিয়ে তাকে বাইয়াত প্রদান করে, তাহলে তার জন্য খিলাফাহ সাব্যস্ত হবে না। আল-গিয়াসি: ৫৬

খিলাফাহ সম্পন্ন হওয়ার জন্য মুসলমানদের আন্তরিক সন্তুষ্টি থাকা শর্ত। কারণ, খলিফাকে নির্বাচন করেছে মুসলমানরাই। সুতরাং এটা মূলত তার মাঝে ও মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক চুক্তি। আর পারস্পরিক চুক্তি সম্পন্ন হয় আন্তরিক সন্তুষ্টির সঙ্গে; বাধ্যতা ও জোরের সঙ্গে নয়।

**قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي فُلاَنٍ؟ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ العَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ... مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ**

আবদুর রহমান ফিরে এসে বললেন, যদি আপনি ওই লোকটিকে দেখতেন, যে লোকটি আজ আমিরুল মুমিনিনের কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, হে আমিরুল মুমিনিন, অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কিছু করার আছে কি, যে লোকটি বলে থাকে যে, যদি উমার মারা যান তাহলে অবশ্যই অমুকের হাতে বাইয়াত করব। আল্লাহর কসম, আবু বকরের বাইয়াত আকস্মিক ব্যাপার-ই ছিল। ফলে তা হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি ভীষণভাবে রাগান্বিত হলেন। তারপর বললেন, ইনশাআল্লাহ সন্ধ্যায় আমি অবশ্যই লোকদের মধ্যে দাঁড়াব আর তাদেরকে ওইসব লোক থেকে সতর্ক করে দেবো, যারা তাদের বিষয়াদি আত্মসাৎ করতে চায়।... যে-কেউ মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া কোনো লোকের হাতে বাইআত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং ওই লোকেরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই হত্যার শিকার হবার আশংকা রয়েছে। সহিহ বুখারি: ৬৮৩০

উমর রা. বলেন :

**مَنْ بَايَعَ أَمِيرَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ**

যে ব্যক্তি কোনো পরামর্শ ছাড়া মুসলমানদের সার্বিক দায়-দায়িত্বের বাইয়াত প্রদান করবে, তার বাইয়াত হবে না। আল-মুসান্নাফ, ইবনু আবি শায়বা: ৩২৮৬৮; মুসনাদু আহমাদ: ৩৯১

হাফিজ ইবনু হাজার রহ. বলেন, 'ঘটনাটির প্রেক্ষাপট থেকে প্রতিভাত হয় যে, উমর রা.-এর আপত্তি ওই ব্যক্তির ওপর ছিল, যে মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে বাইয়াত দিতে চেয়েছে।' ফাতহুল বারি: ১২/১৫৪

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হলো যে, খলিফা যদি নির্বাচিত হয় তাহলে তার নির্বাচন হতে হবে মুসলমানদের ঐকমত্য ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। কিন্তু ওপরে আমরা দেখেছি,

খলিফা নির্বাচনের একমাত্র পদ্ধতি এটা নয়; বরং তিনি পূর্ববর্তী খলিফার মনোনয়নের দ্বারাও নির্ধারিত হতে পারেন। আল-আকহামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ারদি: ১০ যেমন, সহিহ হাদিসে এসেছে :

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ أَلاَ تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: «إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ: «رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، لاَ لِي وَلاَ عَلَيَّ، لاَ أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا»**

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার রা.-কে বলা হলো, আপনি কি (আপনার পরবর্তী) খলিফা মনোনীত করে যাবেন না? তিনি বললেন, যদি আমি খলিফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন—অর্থাৎ আবু বকর—তিনি খলিফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন । আর যদি মনোনীত না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন—অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তিনি খলিফা মনোনীত করে যাননি। এতে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল। তারপর তিনি বললেন, কেউ এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী আর কেউ ভীত। আর আমি পছন্দ করি, আমি যেন এ থেকে মুক্তি পাই সমানে সমান—না পুরস্কার না শাস্তি। আমি জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এর দায়িত্ব বহন করতে পারব না। সহিহ বুখারি: ৭২১৮

খলিফা যদি পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রেও মুসলমানদের ঐকমত্য ও সন্তুষ্টি থাকা শর্ত। ইমাম আবু ইয়ালা রহ. লেখেন :

**الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، و إنما تنعقد بعهد المسلمين.**

কেবল দায়িত্ব প্রদানের দ্বারাই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য খিলাফাহ সম্পন্ন হবে না; বরং তা সম্পন্ন হবে মুসলমানদের শপথের দ্বারা। আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ারদি: ২৫

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. লেখেন :

**وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه. ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما.**

আবু বকর রা. যখন উমর রা.-এর উদ্দেশে দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন, এরপর তিনি তখনই খলিফা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছেন যখন মুসলমানরা তাকে বাইয়াত দিয়েছে এবং তার আনুগত্য মেনে নিয়েছে। যদি এমন হতো যে, মুসলমানরা আবু বকর রা.-এর মনোনয়ন কার্যকর না করতেন এবং তাকে বাইয়াত না দিতেন, তাহলে তিনি খলিফা হতে পারতেন না। মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনু তাইমিয়া: ১/১৪২

তিনি আরও লেখেন :

**عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له.**

কিছু মানুষের নির্বাচনের দ্বারাই উসমান রা. খলিফা হয়ে যাননি; বরং তিনি মুসলিম জনসাধারণের বাইয়াতের দ্বারা খলিফা হয়েছেন। মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনু তাইমিয়া: ১/৫৩২

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তি যখন মুসলমানদের ওপর জোর খাটিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়, ফিতনা এড়ানোর স্বার্থে তাকেও খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। সহিহ বুখারি: ৬৯৩; রাওজাতুত তালিবিন, নববি: ১০/৪৬, তবে এটা খলিফা নির্ধারণের কোনো আদর্শ পদ্ধতি নয় এবং তা নববি ধারার খিলাফাহও নয়। এখানে আমাদের আলোচনা নববি ধারার খিলাফাহ তথা খিলাফাতে রাশেদা সম্পর্কে; জোরপূর্বক দখলকৃত স্বেচ্ছাচারপূর্ণ খিলাফাহ সম্পর্কে নয়।

## আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কারা?

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হচ্ছে আলিম-উলামা, মর্যাদাবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানগণ, সমাজের নেতাগণ এবং বড় ব্যবসায়ীগণ। মুগনিল মুহতাজ, নববি: ৪/১৩০; কাশশাফুল কিনা, বাহুতি: ৬/১৫৯, নারী, চুক্তিবদ্ধ কাফির ও দাসরা যতই মহৎ গুণের অধিকারী হোক না কেন, তারা কখনো আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানিতা স্ত্রীগণ, আয়িশা রা.-এর মতো বিদগ্ধ ফকিহ ও ফাতিমা রা.-এর মতো জান্নাতের সর্দার নারীর সঙ্গে সাহাবিগণ খলিফা নির্বাচণ বিষয়ে পরামর্শ করেননি। তাদেরকে শুরা বা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। অথচ তাদের মর্যাদ, বিশেষত আয়িশা ও ফাতিমা রা.-এর পূর্ণাঙ্গতা হাদিস দ্বারা স্বীকৃত।

**আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ যারা হবেন, তাদের ক্ষেত্রে বিবেচ্য শর্ত হলো :**

একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার জন্য তার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকা অপরিহার্য—যেমন, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি—আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের প্রতিটি সদস্যের মধ্যেই তা থাকা অপরিহার্য। এই পরিমাণ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য, যার দ্বারা খিলাফাহর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারণ করতে পারেন। যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা ও পর্যাপ্ত হিকমাত তথা প্রজ্ঞা, সচেতনতা ও বিচক্ষণতা থাকাও অপরিহার্য।

আস্থাবান ও নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরি, যাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পুরো জাতি সহজেই ঐকমত্য প্রদর্শন করে এবং যাদের নির্বাচন সকলে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নেয়। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। প্রয়োজন ও বাস্তবতা অনুসারে তার সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ যেহেতু সমাজের সব শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, তাই তাদেরও রুচিশীল, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সব গোত্র ও গোষ্ঠী থেকে নির্ধারণ করা হয়; যাতে করে তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে জাতির কোনো দ্বিধা না থাকে। বাইয়াতের বাক্যমালা ছিল সাধারণত এরকম :

**بايعناك راضين على إِقَامَة الْعدْل وَالْقِيَام بفروض الْإِمَامَة على كتاب الله وَسنة رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]**

আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আপনার হাতে বাইয়াত করছি এর ওপর যে, আপনি কুরআন ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ মোতাবেক খিলাফাহর দায়িত্বসমূহ পালন করবেন এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। তাহরিরুল আহকাম ফি তাদবিরি আহলিল ইসলাম, ইবনু জামাআহ: ১/৫৭

## বিশিষ্ট ইমারাহ

বিশেষ ইমারাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বীনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি জামাআতসমূহের ইমারাহ। দ্বীনের সাহায্য, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের ব্যাপারে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

**وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**

তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে কেউ কাউকে সহযোগিতা করো না। সুরা মায়িদা: ২

তিনি আরও বলেন :

**وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**

তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং বিক্ষিপ্ত হয়ো না। সুরা আলে ইমরান: ১০৩

**أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ**

তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং এক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ো না। সুরা শুরা: ১৩ সুতরাং দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি দ্বারা। তবে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পন্থা কী হবে? শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন :

**وَلَنْ يَقُومَ الدِّينُ إلَّا بِالْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ وَالْحَدِيدِ .كِتَابٌ يَهْدِي بِهِ وَحَدِيدٌ يَنْصُرُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} فَالْكِتَابُ بِهِ يَقُومُ الْعِلْمُ وَالدِّينُ. وَالْمِيزَانُ بِهِ تَقُومُ الْحُقُوقُ فِي الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ والقبوض. وَالْحَدِيدُ بِهِ تَقُومُ الْحُدُودُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ.**

দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে শুধু কিতাব, তুলাদণ্ড এবং লোহার দ্বারা। পথপ্রদর্শনকারী কিতাব এবং সাহায্যকারী লোহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বস্তুত আমি আমার রাসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যাতে মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং অবতীর্ণ করেছি লোহা, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।' সুরা হাদিদ: ২৫ কিতাবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে জ্ঞান ও দ্বীন। তুলাদণ্ডের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে আর্থিক লেনদেন ও করায়ত্তকরণের হকসমূহ। আর লোহার দ্বারা কাফির ও মুনাফিকদের ওপর দণ্ড প্রয়োগ হবে। মাজমুউল ফাতাওয়া: ৩৫/৩৬

আয়াতে তুলাদণ্ড বলে বোঝানো হয়েছে এমন বস্তুকে, যা দ্বারা কোনো জিনিস মাপা হয়। তা অবতীর্ণ করার অর্থ, আল্লাহ তাআলা তা সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা দ্বারা ন্যায়ানুগ পরিমাপ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিগণ ও তাঁর কিতাবের সাথে তুলাদণ্ডের উল্লেখ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, মানুষের উচিত তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও পরিমিতি রক্ষা করা। সেই ভারসাম্য ও পরিমিতির শিক্ষাই নবি-রাসুলগণের কাছে ও আসমানি কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

আর আয়াতে বিশেষভাবে লোহার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। লোহা এমনই এক ধাতু, সব শিল্পেই যার দরকার পড়ে। কাজেই এর সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার একটি বড় নেয়ামত। নবিগণ, আসমানি কিতাব ও তুলাদণ্ডের পর লোহার উল্লেখ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, মানবসমাজের সংস্কার-সংশোধনের প্রকৃত উপায় নবিগণের জীবনাদর্শ ও তাদের আনীত কিতাব। এর যথাযথ অনুসরণ দ্বারাই দুনিয়ায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু জগতে অপশক্তিও কম নেই, যা এসব শিক্ষা দ্বারা সমাজ-সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে এবং সর্বত্র অন্যায়-অনাচার ও দুষ্কর্মের বিস্তার ঘটিয়ে সমাজদেহকে কলুষিত করে। সেই সব অপশক্তির শিরোচ্ছেদের জন্য আল্লাহ তাআলা লোহা সৃষ্টি করেছেন। তা দ্বারা বিভিন্ন রকমের সমরাস্ত্র তৈরি হয় এবং পরিশেষে তা জিহাদে ব্যবহার করা যায়।

যেহেতু শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা ও ইসলামি খিলাফাহ পুনরুদ্ধার করা মুসলিম উম্মাহর ওপর অপরিহার্য, আর মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছাড়া বাহ্যত তা সম্ভব নয়, এ জন্য এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে উম্মাহর জামাআতবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর এ কথা স্পষ্ট যে, ইমারাহ ছাড়া কোনো জামাআত হয় না। কারণ, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকলে কোনোভাবেই ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না। জামাআতের মধ্যেই শরিয়াহ বাস্তবায়ন করা যায় না। আমিরুল মুমিনিন উমর রা. বলেন :

**إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ ، كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهٍ ، كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ**

জামাআত ছাড়া কোনো ইসলাম হয় না। ইমারাহ ছাড়া কোনো জামাআত হয় না। আর আনুগত্য ছাড়া কোনো ইমারাহ হয় না। সম্প্রদায় যাকে ফিকহের ভিত্তিতে নেতা বানায়, সে তার নিজের জন্য ও সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য প্রাণের সঞ্জীবনী হয়। আর যাকে তার সম্প্রদায় ফিকহ ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে নেতা বানায়, সে তার নিজের জন্য ও তাদের সবার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়। সুনানুদ দারিমি: ২৫৩

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন :

**وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِقُوَّةِ وَإِمَارَةٍ .وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَ إقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ .وَ إقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ: وَلِهَذَا رُوِيَ: {أَنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ .}وَيُقَالُ {سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ} . وَالتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ.**

যেহেতু আল্লাহ তাআলা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ অপরিহার্য করে দিয়েছেন, আর (রাষ্ট্রীয়) শক্তি ও ইমারাহ ছাড়া তা পরিপূর্ণ হয় না। একইভাবে আল্লাহ আরও যেসব বিষয় অপরিহার্য করেছেন—যেমন : জিহাদ, ন্যায়পরায়ণতা, হজ জুমআ ও ঈদ কায়েম করা, মাজলুমের সাহায্য করা এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা—এর কোনোটিই প্রতাপ ও ইমারাহ ছাড়া পূর্ণতা পায় না। এ জন্যই বর্ণিত হয়েছে, শাসক পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়াস্বরূপ। কথিত আছে, শাসক ছাড়া যাপিত এক রাত অপেক্ষা জালিম শাসকের সঙ্গে ৬০ বছর যাপন করা অধিক উপযুক্ত। অভিজ্ঞতা এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করে তোলে। মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৯০

তিনি আরও বলেন :

**وَأَمَّا " رَأْسُ الْحِزْبِ " فَإِنَّهُ رَأْسُ الطَّائِفَةِ الَّتِي تَتَحَزَّبُ أَيْ تَصِيرُ حِزْبًا فَإِنْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ فَهُمْ مُؤْمِنُونَ لَهُمْ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ. وَإِنْ كَانُوا قَدْ زَادُوا فِي ذَلِكَ وَنَقَصُوا مِثْلَ التَّعَصُّبِ لِمَنْ دَخَلَ فِي حِزْبِهِمْ بِالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي حِزْبِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَهَذَا مِنْ التَّفَرُّقِ الَّذِي ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ**

**وَرَسُولَهُ أَمَرَا بِالْجَمَاعَةِ والائتلاف وَنَهَيَا عَنْ التَّفْرِقَةِ وَالِاخْتِلَافِ وَأَمَرَا بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوَى وَنَهَيَا عَنْ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.**

মুমিনরা যে দলে আবদ্ধ হবে, সেই দলের একজন প্রধান থাকবেন। যদি তারা কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা কিছুর আদেশ করেছেন তার ভিত্তিতে দলবদ্ধ হয়, তাহলে তারা মুমিন। মুমিনদের জন্য যা কিছু প্রযোজ্য, তাদের জন্য তার সবকিছু প্রযোজ্য। মুমিনদের ওপর যা কিছু অবধারিত, তাদের ওপরও তার সবকিছু অবধারিত। তবে যদি তারা হ্রাস-বৃদ্ধি করে—যেমন, তাদের দলে যারা অন্তর্ভুক্ত হবে, হক ও বাতিল সব ব্যাপারে তাদের প্রতি সাম্প্রদায়িকতা লালন করে আর যারা তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবে না, তারা হকের ওপর থাক বা বাতিলের ওপর, তাদেরকে উপেক্ষা করে—তাহলে এটা সেই বিভক্তি বলে বিবেচিত হবে, যার নিন্দা করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ জামাআত ও সম্প্রীতির আদেশ করেছেন। বিভক্তি ও মতবিরোধ থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে কেউ কারও সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন। মাজমুউল ফাতাওয়া: ১১/৯২

যখন পৃথিবীতে ইসলামি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তখন ইসলামের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি জামাআতসমূহের আমির তো সাধারণভাবে খলিফাই নির্ধারণ করে দেবেন। কিন্তু যখন ইসলামি খিলাফাহ থাকবে না কিংবা কোনো অপারগতার কারণে খলিফার সঙ্গে পরামর্শ করে তার সিদ্ধান্ত জানা সম্ভব হবে না, তখন মুসলমানদের ওপর কর্তব্য হবে পারস্পরিক পরামর্শ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো একজনকে আমির হিসেবে মেনে নেওয়া।

খলিফার অনুপস্থিতিতে যে জিহাদ ও অন্যান্য দ্বীনি জামাআত পরিচালনা করার জন্য মুমিনরা নিজেদের পক্ষ থেকেই আমির নির্ধারণ করে নিতে পারবে, এর সবচে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মুতা যুদ্ধের ঘটনা।

**عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَ ابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّ ايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ**

**جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ» وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ: «حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ«**

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট (মুতার) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর এসে পৌঁছার পূর্বেই তিনি উপস্থিত মুসলমানদেরকে যায়দ, জাফর ও ইবনু রাওয়াহা রা.-এর শাহাদতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়দ রা. পতাকা হাতে অগ্রসর হলে তাঁকে শহিদ করা হয়। তখন জাফর রা. পতাকা হাতে অগ্রসর হলো, তাকেও শহিদ করে ফেলা হয়। তারপর ইবনু রাওয়াহা রা. পতাকা হাতে নিল। এবার তাকেও শহিদ করে দেওয়া হল। এ সময়ে তার দু-চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। (তারপর তিনি বললেন,) অবশেষে সাইফুল্লাহদের মধ্যে এক সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) হাতে পতাকা ধারণ করেছে। ফলত আল্লাহ তাদের ওপর (আমাদের) বিজয় দান করেছেন। সহিহ বুখারি: ৪২৬২

আল্লাহ তাআলা সেই যুদ্ধে মুসলমানদেরকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধিপ্রাপ্ত মহান সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-এর হাতে মুসলমানদের বিজয় দান করেছিলেন। কিন্তু তাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমির হিসেবে মনোনীত করে পাঠাননি। তিনি সর্বমোট তিনজনকে আমির বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাদের সবার শাহাদাতের পর মুসলমানরা সাবিত ইবনু আকরাম রা.-এর আহ্বানে নিজেরা পরামর্শক্রমে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে নিজেদের আমির হিসেবে মনোনীত করে নেন।

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. ﷺ . قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.**

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুতার যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ ﷺ যায়দ ইবনু হারিসা রা.-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে বলেছিলেন, যদি যায়দ রা. শহিদ হয়ে যায় তাহলে জাফর ইবনু আবু তালিব রা. সেনাপতি হবে। যদি জাফর রা.-ও শহিদ হয়ে যায় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা. সেনাপতি হবে।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন, ওই যুদ্ধে তাদের সাথে আমিও ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জাফর ইবনু আবু তালিব রা.-কে তালাশ করলে তাকে শহিদগণের মধ্যে পেলাম। তখন আমরা তার দেহে তরবারি ও বর্শার ৯০টিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। সহিহ বুখারি: ৪২৬১, উপরিউক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনু হাজার রহ. ফাতহুল বারি গ্রন্থে লেখেন :

**قال الطحاوي: هذا الأصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلاً إذا غاب الإمام يقوم مقامة إلى أن يحضر.وكذا قال الخطابي وعنه البغوي.**

ইমাম তহাবি রহ. বলেন, এই মূলনীতি থেকে উদ্ঘাটিত হয় যে, ইমাম যখন অনুপস্থিত থাকবেন, তখন মুসলমানদের ওপর অন্য কোনো ব্যক্তিকে অগ্রসর করা অপরিহার্য হবে, যে ইমামের স্থলাভিষিক্ত হবে—যতক্ষণ না ইমাম উপস্থিত হয়। ইমাম খাত্তাবি রহ.-ও অনুরূপ বলেছেন এবং তার সূত্রে বাগাবি রহ. এই কথা বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরও লেখেন :

**قَوْلُهُ بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ أَيْ جَازَ ذَلِكَ... قَالَ ابن الْمُنِيرِ يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ مَنْ تعين لِوِلَايَةٍ وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْإِمَامِ أَنَّ الْوِلَايَةَ تَثْبُتُ لِذَلِكَ الْمُعَيَّنِ شَرْعًا وَتَجِبُ طَاعَتُهُ حُكْمًا كَذَا قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إِذَا اتَّفَقَ الْحَاضِرُونَ عَلَيْهِ**

ইমাম বুখারি রহ. অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন : 'শত্রুর আশঙ্কার কারণে যুদ্ধে যে ব্যক্তি খলিফার পক্ষ থেকে ইমারাহর দায়িত্ব ব্যতিরেকেই আমির হয়।' অর্থাৎ এটা বৈধ।... ইবনু মুনির রহ. বলেন, অধ্যায়ের হাদিস থেকে যে মাসআলা গৃহীত হয় তা হলো, যে ব্যক্তি নেতৃত্বের জন্য নির্ধারিত হয় আর তার ব্যাপারে ইমামের কাছে গিয়ে সিদ্ধান্ত জানা দুষ্কর হয়, শরিয়াহর দৃষ্টিতে সেই নির্ধারিত ব্যক্তির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিধানগতভাবে তার আনুগত্য অপরিহার্য হবে। তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন তার ব্যাপারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ একমত হবে। ফাতহুল বারি: ৬/১৮০

এর পক্ষে আরেকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই বাণী, যেখানে তিনি বলেছেন :

**لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ**

এই দ্বীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মুসলমানদের এক দল এর ওপর লড়াই চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়। সহিহ মুসলিম: ১৯২২

**لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ**

আমার উম্মাহর একটি দল আল্লাহর আদেশের ওপর সর্বদা লড়াই চালিয়ে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের পরাভূত করবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না—যতক্ষণ না কিয়ামত আসে এবং তারা সেই অবস্থায় থাকে। সহিহ মুসলিম: ১৯২৪

এসব হাদিসের আলোকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ জারি থাকবে। কখনো তা বন্ধ হবে না। অথচ কিয়ামত পর্যন্ত যে খিলাফাহ থাকবে না, এটা অসংখ্য হাদিসের আলোকেই আমরা জানতে পারি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

‘অবশ্যই ইসলামের হাতলগুলো একে একে ভেঙে ফেলা হবে। যখন একটা হাতল ভাঙবে তখন লোকেরা এর পরবর্তী হাতল আঁকড়ে ধরে থাকবে। সর্বপ্রথম যে হাতলটি ভেঙে যাবে তা হলো শাসনক্ষমতা আর সর্বশেষটি হলো নামাজ।’ মুসনাদু আহমাদ: ২১১৩৯

হুজায়ফা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

**تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ**

তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আল্লাহ চাইবেন যে, নবুওয়াত থাকুক। এরপর যখন তিনি তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ। খিলাফাহ ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন যে, তা থাকুক। এরপর যখন আল্লাহ তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে দাঁত কামড়ে থাকা রাজত্ব। তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন যে, তা থাকুক। এরপর যখন আল্লাহ তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে জবরদস্তিমূলক রাজত্ব। তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন যে, তা থাকুক। এরপর যখন আল্লাহ তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। তারপর আবার প্রতিষ্ঠিত হবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ।মুসনাদু আহমাদ: ১৮৪০৬

আনাস রা.-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

**إِنَّهَا نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ عَضُوضٌ، ثُمَّ جَبْرِيَّةٌ، ثُمَّ طَوَاغِيتُ**

নিশ্চয়ই এখন রয়েছে নবুওয়াত ও রহমত। এরপর আসবে খিলাফাহ ও রহমত। তারপর আসবে দাঁত কামড়ে থাকা রাজত্ব। এরপর আসবে জবরদস্তি। তারপর তাগুতগোষ্ঠী। আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল-ফিতান: ৪২০

সুতরাং খলিফা বিদ্যমান না থাকলেও দ্বীনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত জামাআতগুলোর আমির বিদ্যমান থাকবে। জামাআতের সদস্যরা নিজেরাই পারস্পরিক পরামর্শ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাউকে আমির হিসেবে মনোনীত করবে। তাদের ওপর সেই আমিরের আনুগত্য করা অপরিহার্য হবে। খলিফার অনুপস্থিতিতে পুরো দ্বীনের সামাজিক সব কাজকর্মকে নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর ফেলে রাখার কোনোই সুযোগ

নেই। আর ইসলামি জামাআতগুলোর কর্তব্য হলো, পারতপক্ষে নিজেরা অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত না হওয়া। বরং শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা ও খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে সমগ্র বিশ্বের মুসলিমরা এক ইমারাহর অধীনে এক ঝাণ্ডার ছায়াতলে কাজ করা।[৬৫] তবে একান্ত যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ইমারাহর অধীনে লড়াই চালিয়ে যাওয়াও বৈধ হবে। কিন্তু এক অঞ্চলে একাধিক কিতালপন্থী জামাআত না থাকাই সমীচীন। অন্যথায় বিভিন্ন মতবিরোধকে কেন্দ্র করে লড়াই কুফফারের সঙ্গে সীমাবদ্ধ না থেকে অনেক সময় নিজেদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে; যা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক ক্ষতিকারক।

## আমিরুল মুমিনিনের বাইয়াত ও অন্যান্য আমিরদের বাইয়াতের মধ্যে পার্থক্য

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি স্মরণ রাখা জরুরি, দ্বীনের সাহায্যে কর্মরত যেকোনো জামাআত মুসলমানদের একমাত্র জামাআত নয়; বরং মুসলমানদের জামাআতসমূহের মধ্য থেকে একটি জামাআত মাত্র। যার কারণে হাদিসে মুসলমানদের জামাআত থেকে পৃথক হওয়ার ব্যাপারে যেসব শাস্তির হুঁশিয়ারি বর্ণিত হয়েছে, তা এসব জামাআত থেকে পৃথক হওয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। যেমন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

**مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً**

যে লোক নিজ আমিরের কাছ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে লোক জামাআত থেকে এক বিঘতও বিচ্ছিন্ন হবে, তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলি মৃত্যুর মতো। সুরা আনফাল: ৪৬

উপরিউক্ত হাদিসটি আমিরুল মুমিনিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর তাতে যে জাহিলি মৃত্যুর কথা উল্লেখিত হয়েছে, এটা ওই ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, যে আমিরুল মুমিনিনের বাইয়াত ভঙ করে মুসলমানদের জামাআত থেকে পৃথক হয়ে যায়।

**আমিরুল মুমিনিনের বাইয়াত ও অন্যান্য আমিরদের বাইয়াতের মধ্যে মোটা দাগে যে সকল পার্থক্য রয়েছে, তা নিম্নরূপ :**

১. আমিরুল মুমিনিনকে প্রদত্ত বাইয়াত হলো গোটা মুসলিম উম্মাহ ও একজন ব্যক্তির মধ্যে খিলাফাহর দায়িত্বের ব্যাপারে কৃত চুক্তি। পক্ষান্তরে অন্যান্য আমিরকে প্রদত্ত বাইয়াত হলো গোটা উম্মাহর পক্ষ থেকে নয়, বরং উম্মাহর নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো আনুগত্যের ব্যাপারে বিশেষ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কৃত চুক্তি।

২. আমিরুল মুমিনিনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু শর্ত উপস্থিতি থাকা জরুরি। যেমন, কুরাইশ বংশের হওয়া বা ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকা। অন্যান্য আমিরের ক্ষেত্রে সেসব শর্ত থাকা জরুরি নয়। সুতরাং কুরাইশী বা মুজতাহিদ না হওয়া সত্ত্বেও কেউ বিশিষ্ট আমির হতে পারে।

৩. আমিরুল মুমিনিনকে প্রদত্ত বাইয়াত গোটা উম্মাহর কল্যাণে কাজ করার জন্য এবং ইসলামের সর্বপ্রকার বিধিবিধানের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য হয়ে থাকে। যার পরিপ্রেক্ষিতে উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের ওপর তার আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে যায়—যতক্ষণ না তার থেকে এমন কোনো দোষ প্রকাশ পায়, যা তার বাইয়াতকে রহিত করে দেয়। অপরদিকে অন্যান্য আমিরের ক্ষেত্রে যে বিষয়ের ওপর তাকে বাইয়াত দেওয়া হবে—যেমন : জিহাদ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ, মাজলুমের সাহায্য ইত্যাদি—তার ওপর কেবল সেই কাজেরই দায় বর্তাবে। কেননা, আমিরুল মুমিনিনের দায়-দায়িত্ব প্রাথমিকভাবেই শরিয়াহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর অন্যান্য আমিরদের ক্ষেত্রে তাকে যে বিষয়ের বাইয়াত দেওয়া হবে এবং যে শব্দে বাইয়াত দেওয়া হবে, তার ওপর শুধু তার দায়-দায়িত্বই বর্তায়।

৪. আমিরুল মুমিনিনের বাইয়াত সকল মুসলিমের ওপর অপরিহার্য থাকে। কেউ চাইলেও তার নির্দেশ অমান্য করার বা তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করার সুযোগ থাকে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

**كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ«**

বনি ইসরাইলের নবিগণ তাদের উম্মাহকে শাসন করতেন। যখন কোনো একজন নবি মারা যেতেন, তখন অন্য একজন নবি তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নবি নেই। তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বাইয়াতের হক আদায় করবে। তোমাদের ওপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ওই সকল বিষয়ে যে সবের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পন করা হয়েছিল। সহিহ বুখারি: ৩৪৫৫; সহিহ মুসলিম: ১৮৪২

**مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً**

যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার গলায় কোনো বাইয়াত নেই, সে জাহিলি মৃত্যু বরণ করল। সহিহ মুসলিম: ১৮৫১

**تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ**

'তুমি মুসলিমদের জামাআত ও ইমামকে আঁকড়ে থাকবে।'সহিহ বুখারি: ৭০৮৪; সহিহ মুসলিম: ১৮৪৭

অন্যান্য আমিরের আনুগত্য সবার ওপর অপরিহার্য থাকে না। বরং যারা তাকে বাইয়াত দিয়েছে এবং যে বিষয়ের বাইয়াত দিয়েছে, কেবল তাদের জন্য সে বিষয়ে আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে থাকে। যেমন, জিহাদি জামাআতের আনুগত্য করা গোটা মুসলিম উম্মাহর ওপর অপরিহার্য হবে না। বরং সেই জামাআতের সদস্য যারা হবে, যারা তাকে বাইয়াত দেবে, তার আনুগত্য কেবল তাদের ওপরই অপরিহার্য হবে।

**৫.** আমিরুল মুমিনিনের আনুগত্যের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। বরং তা সর্বদা অপরিহার্য থাকে। যতক্ষণ না আমিরুল মুমিনিন মৃত্যুবরণ করেন কিংবা তিনি আমিরুল মুমিনিন থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন, ততক্ষণ বিনা বাক্যব্যয়ে তার আনুগত্য করে যেতে হয়। অন্যান্য আমিরের ক্ষেত্রে আনুগত্যের বাইয়াত নির্দিষ্ট সময় বা কাজের সঙ্গে সীমাবদ্ধ হতে পারে। যখন সেই সময় শেষ হবে বা সেই কাজ সম্পন্ন হবে, তার পর আর তার আনুগত্য অপরিহার্য থাকবে না।

৬. একই সময়ে একাধিক আমিরুল মুমিনিন হতে পারে না। গোটা বিশ্বের ইমাম, খলিফা ও আমিরুল মুমিনিন হবেন মাত্র একজন। অন্যান্য আমিরদের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুসারে তাতে ভিন্ন ভিন্ন আমির হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন জিহাদি জামাআতের আমির, একজন তাবলিগি জামাআতের আমির, একজন দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের আমির ইত্যাদি।

৭. যত হাদিসে মুক্তভাবে বাইয়াত শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, সেসব হাদিস আমিরুল মুমিনিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য। সুতরাং দ্বীনি কোনো জামাআতের জন্য এসব হাদিসকে যথাস্থানে প্রয়োগ না করে ভিন্ন জায়গায় প্রয়োগ করা বৈধ নয়। যেমন, কিছু মানুষের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো বিষয়ে বাইয়াত লাভ করেই নিজেকে আমিরুল মুমিনিন মনে করা, আমিরুল মুমিনিনের জন্য নির্ধারিত হক ভোগ করা বা নিজেকে তার সমস্তরের মনে করা, কেউ বাইয়াত ভঙ করে দল ত্যাগ করলে তার বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য করা—সে হত্যার উপযুক্ত বা সে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জাহিলি মৃত্যু বরণ করবে প্রভৃতি।

তবে স্মর্তব্য যে, আমিরুল মুমিনিনের আনুগত্য যেমন ওয়াজিব, তেমনি অঙ্গীকারাবদ্ধ বিষয়গুলোতে অন্যান্য আমিরদের আনুগত্যও ওয়াজিব। মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/১৯-২০, কারণ, কুরআনে আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন। সুরা মায়িদা: ১; সুরা ইসরা: ৩৪, শরিয়াহ বান্দার ওপর যা অপরিহার্য করেছে, তা মান্য করা যেমন ওয়াজিব; বান্দা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের ওপর যা অপরিহার্য করে নিয়েছে, তা মান্য করাও ওয়াজিব। এর সবচে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মানত।

৮. আমিরুল মুমিনিনের বাইয়াত ভঙ করে মুসলমানদের জামাআত ত্যাগ করলে তাকে বিদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে তাকে আনুগত্য করতে বাধ্য করা হবে। পক্ষান্তরে জিহাদ ফরজ থাকা অবস্থায় কেউ যদি জিহাদি জামাআত পরিত্যাগ করে বা তা থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে, তাহলে সে যদিও গোনাহগার হবে; কিন্তু তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না এবং তার ওপর শক্তি প্রয়োগ করে তাকে জোরপূর্বক আনুগত্য করতে বাধ্য করা যাবে না।

৯. বিশিষ্ট আমিরদের জামাআত থেকে ইস্তেফা ও অব্যাহতি নেওয়া বৈধ। কিন্তু আমিরুল মুমিনিনের বাইয়াত ভঙ করে মুসলমানদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বৈধ নয়।

## বর্তমান সময়ে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবিত পথ

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে পৃথিবীব্যাপী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবিত পথ হলো দাওয়াত ও জিহাদ। প্রথমে একটি অগ্রগামী দল তৈরি করতে হবে, যাদের কাজ হবে 'সাপের মাথা' তথা বৈশ্বিক কুফরি শক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলোর ওপর আক্রমণ করা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে কিংবা যেসব সশস্ত্র জিহাদি জামাআত আছে, তাদের সাথে মিলে কাজ করতে হবে। এই সব দলকে একটি বিশ্বব্যাপী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যে একীভূত করতে হবে। এই আঞ্চলিক দলগুলো নিজ নিজ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কার্যক্রম চালাবে। দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করবে। মুসলিম উম্মাহর হারানো চেতনা জাগ্রত করবে এবং সবাইকে জিহাদের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করবে। মূল গেরিলা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তারা সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি পপুলার সাপোর্ট বেস তৈরি করবে।

এরপর ক্ষেত্রবিশেষ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তারা ভূমি দখল করবে এবং সেখানে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করবে। প্রতিটি শাখা মূল নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা মেনে চলবে। প্রয়োজনে অন্যান্য ইসলামি দলের সাথে সহযোগিতা করবে। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি দাওয়াতের কাজও চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে আঞ্চলিক তাগুত বা কুফফারকে যথেষ্ট দুর্বল করতে পারলে এবং পর্যাপ্ত ভূমি নিয়ন্ত্রণে আসলে ইমারাহ গঠন করবে। একই সাথে মূল শত্রু বৈশ্বিক কুফরি শক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যেতে হবে। একটি শক্তিক্ষয়ের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে (Asymmetric war of attrition) কুফরের ধ্বজাধারী ও দাজ্জালি মিশন বাস্তবায়নকারী রাষ্ট্রসমূহকে জড়িয়ে রাখতে হবে। এই দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা নিঃশেষ করার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে সেসব রাষ্ট্রের সামরিক অভিযান চালানোর সক্ষমতা ধ্বংস করে দিতে হবে।

এভাবে যখন বৈশ্বিক কুফরি শক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলো মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসন চালাতে এবং সামরিকভাবে বিভিন্ন ভূখণ্ডের তাগুতগোষ্ঠীকে সমর্থন করতে অপারগ হয়ে দাঁড়াবে, তখন শুরার মাধ্যমে, উম্মাহর আন্তরিক সন্তুষ্টি ও সম্মতির ভিত্তিতে খিলাফাহ ঘোষণা করা হবে।

এটা হলো দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতি। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে কোনো আঞ্চলিক ভূমি দখল করাই মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং আঞ্চলিক সংঘর্ষের চেয়ে বৈশ্বিক জিহাদের লক্ষ্যসমূহই এখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যার কারণে এখানে আঞ্চলিক তাগুতের আগে কুফরের ইমামদের ধ্বংস করাই মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এর জন্য জনসমর্থনের ভিত্তিতে গেরিলা যুদ্ধকেই উম্মাহর জন্য সবচে বাস্তবসমত পন্থা মনে করা হয়।

খিলাফাহ ঘোষণা করার পর শরিয়াহর নির্দেশনা অনুসারে খলিফাকে আবশ্যিকভাবে এই সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে—সকল মুসলিমের হিজরতের জন্য খিলাফাহর ভূমিকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং তাদের সবাইকে নিরাপত্তা দিতে হবে। ভাষা-বর্ণ-মতাদর্শ নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মুসলিমের জন্যই এই সুযোগ থাকতে হবে। এর পাশাপাশি সকল নির্যাতিত মুসলিমের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে হয়তো একই সঙ্গে সকল জায়গায় সাহায্য পাঠানো সম্ভব হবে না, এতদসত্ত্বেও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে অবশ্যই পাঠাতে হবে। আর যে অঞ্চলগুলোতে সেনা পাঠানো যাবে না, সেখানকার মুসলমানদের অর্থ, লোকবল এবং অস্ত্র দিয়ে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তো যতদিন পর্যন্ত খিলাফাহর এসব দাবি পূরণ করার মতো সামর্থ্য অর্জিত হবে না, ততদিন পর্যন্ত নিজেদেরকে ইমারাহর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে। শর্ত পূরণ না করেই তাড়াহুড়ার ভিত্তিতে খলিফা সেজে বসবে না। কারণ, খলিফা হওয়ার অর্থ হলো গোটা ইসলামি বিশ্বের অভিভাকত্বের আসনে আসীন হওয়া। সকল মুসলিমের দায় ও কর্তৃত্ব লাভ করা। তবে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, জনগণ হলো পানি, যার মধ্যে গেরিলারূপী মাছ সাঁতরে বেড়ায়। সুতরাং জনসমর্থন ব্যতীত মুজাহিদদের অবস্থা হবে পানি ছাড়া মাছের মতো, যার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। এ জন্য সামরিক সক্ষমতার পাশাপাশি জনসমর্থন তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; অনেক ক্ষেত্রে তা সামরিক সক্ষমতার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রথমে জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে। এরপর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক

বা আদর্শিক ঐক্য গঠন করতে হবে। এবং ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধ ও শত্রুর ধ্বংসের দিকে মনোনিবেশ করা হবে। যার কারণে চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধে যাওয়ার আগে অবশ্যই মুজাহিদদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি জনসমর্থন সৃষ্টি করতে হবে। এর মাধ্যমে শক্তি, সামর্থ্য ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। আর এক্ষেত্রে গোপনে নিজেদের প্রসার ও বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। বিভিন্ন দলের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততাও গোপন রাখতে হবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে মিডিয়াতে প্রচারিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

আরেকটি বিষয় হলো, কোনো ভূখণ্ড নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আসলে সেখানে তো অনতিবিলম্বে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু ইমারাহ ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। নির্দিষ্ট পর্যায়ের স্থিতিশীলতা ও প্রতিরোধশক্তি অর্জিত হওয়ার আগে ইমারাহ ঘোষণা দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় কৌশলগত কারণে কখনো সেই ভূমি থেকে মুজাহিদরা পিছু হটলে এবং সেখানে কিছুদিন পর ইমারাহর নাম-গন্ধ না থাকলে জিহাদ ও মুজাহিদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা মন্দ হয়ে যাবে। আর কখনোই এই লড়াইকে কুফফার বনাম নিজেদের দলের লড়াই হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না; বরং এটাকে উপস্থাপন করতে হবে কুফফার বনাম মুসলিম উম্মাহর লড়াই হিসেবে। যাতে করে মুসলমানরা সবাই এটাকে নিজেদের সংগঠন মনে করে; নিজেদের থেকে আলাদা বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো দল ভেবে না বসে। এ জন্য জিহাদি আন্দোলনের উচিত সে শত্রুকে আক্রমণ করা, যার কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য; সে শত্রুকে নয়, যার কুফরের পরিমাণ সর্বাধিক।

---

তথ্যসূত্র:

[১] তাহরিরুল আহকাম : ৭৯

[২] সুরা নিসা : ৫৯

[৩] সুরা নিসা : ৮৩

[৪] সুনানু আবি দাউদ : ২৬০৮, ২৬০৯; সহিহ ইবনু খুজায়মা : ২৫৪১

[৫] নাইলুল আওতার : ৮/২৯৪

[৬] মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৮/৩৯০

[৭]দ্রষ্টব্য—আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবি : ১/২৬৪; আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ারদি : ৫; শরহু সহিহ মুসলিম, নববি : ১২/২০৫; আল-ফাসল, ইবনু হাজম : ৪/৮৭। প্রয়োজনে আরও দেখুন—শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহ. রচিত ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা, আল্লামা তাফতাজানি রহ. রচিত শারহুল আকায়িদ এবং মাওলানা ইদরিস কান্ধলবি রহ. রচিত আকায়েদুল ইসলাম।

[৮] সহিহ মুসলিম : ১৮৫১

[৯] সুরা নিসা : ৪১; সুরা নিসা : ৫৯; আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ইবনুল কায়্যিম : ২/৭৮৭; শরহু সহিহ মুসলিম, নববি : ১২/২২৯

[১০] সুরা নিসা : ৫; আল-ফাসল, ইবনু হাজম : ৪/৮৯

[১১] মারাতিবুল ইজমা, ইবনু হাজম : ১৫৪

[১২] ফাতহুল বারি : ২০/১৬০

[১৩] আল-ফাসল, ইবনু হাজম : ৪/৮৯

[১৪] আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবি : ১/২৭০

[১৫] সহিহ বুখারি : ৭১৩৯, ৭১৪০; মুসনাদু আহমাদ : ২০/২৪৯; শরহু সহিহ মুসলিম : ১২/২০০

[১৬] মুসনাদুল বাযযার : ৬১৮১; তারিখে তাবারি : ২/৫৮০; ফাতহুল বারি : ১৩/১১৯; আত-তাহরির আলাল মুখতার : ১/৬৮

[১৭] সহিহ বুখারি : ৬৭৩০; সহিহ মুসলিম : ১৭৩৩

[১৮] আল-ইতিসাম : ২/১২৬

[১৯] নিহায়াতুল মুহতাজ : ৭/৪০৯

[২০] আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল : ১/১৫৩

[২১] ফাজায়িহুল বাতিনিয়্যাহ : ১৯১

[২২] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ারদি : ১/৫

[২৩] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আবু ইয়ালা : ২০

[২৪] এর ব্যাখ্যা পরে আসছে।

[২৫] শরহু সহিহ মুসলিম, নববি : ১২/২০৫

[২৬] আল-গিয়াসি : ৫২

[২৭] আল-গিয়াসি : ৫৬

[২৮] সহিহ বুখারি : ৬৮৩০

[২৯] আল-মুসান্নাফ, ইবনু আবি শায়বা : ৩২৮৬৮; মুসনাদু আহমাদ : ৩৯১

[৩০] ফাতহুল বারি : ১২/১৫৪

[৩১] আল-আকহামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ারদি : ১০

[৩২] সহিহ বুখারি : ৭২১৮

[৩৩] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ারদি : ২৫

[৩৪] মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনু তাইমিয়া : ১/১৪২

[৩৫] মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনু তাইমিয়া : ১/৫৩২

[৩৬] সহিহ বুখারি : ৬৯৩; রাওজাতুত তালিবিন, নববি : ১০/৪৬

[৩৭] মুগনিল মুহতাজ, নববি : ৪/১৩০; কাশশাফুল কিনা, বাহুতি : ৬/১৫৯

[৩৮] তাহরিরুল আহকাম ফি তাদবিরি আহলিল ইসলাম, ইবনু জামাআহ : ১/৫৭

[৩৯] সুরা মায়িদা : ২

[৪০] সুরা আলে ইমরান : ১০৩

[৪১] সুরা শুরা : ১৩

[৪২] সুরা হাদিদ : ২৫

[৪৩] মাজমুউল ফাতাওয়া : ৩৫/৩৬

[৪৪] সুনানুদ দারিমি : ২৫৩

[৪৫] মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৮/৩৯০

[৪৬] মাজমুউল ফাতাওয়া : ১১/৯২

[৪৭] সহিহ বুখারি : ৪২৬২

[৪৮] সহিহ বুখারি : ৪২৬১

[৪৯] ফাতহুল বারি : ৬/১৮০

[৫০] সহিহ মুসলিম : ১৯২২

[৫১] সহিহ মুসলিম : ১৯২৪

[৫২] মুসনাদু আহমাদ : ২১১৩৯

[৫৩] মুসনাদু আহমাদ : ১৮৪০৬

[৫৪] আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল-ফিতান : ৪২০

[৫৫] সুরা আনফাল : ৪৬

[৫৬] সহিহ বুখারি : ৭০৫৪; সহিহ মুসলিম : ১৮৪৯

[৫৭] সহিহ বুখারি : ৩৪৫৫; সহিহ মুসলিম : ১৮৪২

[৫৮] সহিহ মুসলিম : ১৮৫১

[৫৯] সহিহ বুখারি : ৭০৮৪; সহিহ মুসলিম : ১৮৪৭

[৬০] মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৮/১৯-২০

[৬১] সুরা মায়িদা : ১; সুরা ইসরা : ৩৪

## ডাউনলোড লিংক

**PDF**

https://archive.org/download/khilafa...০%২০imarah.pdf

https://mega.nz/#!৭৪VHGaQB!nlmIYxVOa...Sa০Z৮tRMQWp৫৬M

https://www.mediafire.com/file/jvlov...marah.pdf/file

**WORD**

https://archive.org/download/khilafa...%২০imarah.docx

https://mega.nz/#!i০F৩TIBB!IoZp১MdJD...gKoYbLZr৭৬yluQ

https://www.mediafire.com/file/epy৯১...arah.docx/file

**********

আপনাদের নেক দু'আয় মুজাহিদীনে কেরামকে ভুলে যাবেন না।

সংগ্রহীত পোষ্ট

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৪৮১

# যদি কেউ পার্লামেন্টে অংশ নিতে চায়, তবে সেটা কি কুফর হিসাবে গণ্য হবে? এ কাজ কি কাউকে মুরতাদ বানিয়ে ফেলে?

abu ahmad

Senior Member

১২-১৮-২০১৯

**-শায়খ আবু ক্বাতাদা আল-ফিলিস্তিনী**

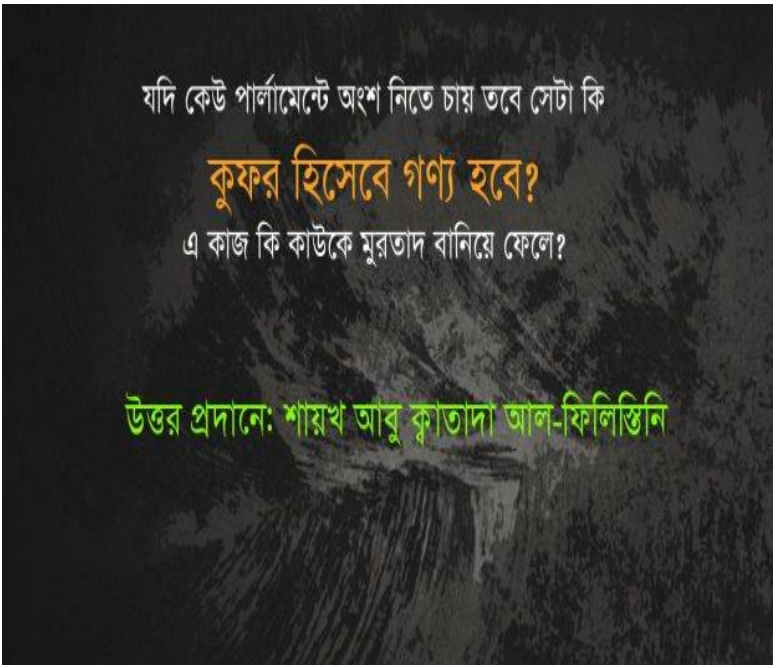


**প্রশ্নঃ** যদি কেউ পার্লামেন্টে (জাতীয় সংসদে) অংশ নিতে চায়, তবে সেটা কি কুফর হিসাবে গণ্য হবে? এ কাজ কি কাউকে (ইসলাম) ধর্মত্যাগী বানিয়ে ফেলে অথবা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করে ?

**উত্তরঃ**

এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে, আমাদের প্রথমে কিছু ব্যাপারে আলোকপাত করা উচিত।

আগেও বলা হয়েছে, উম্মাহর সমস্যা হল তারা শরীয়াতের পরিভাষাগুলো গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে ভুল করে। তারা 'তাওহীদ নুসুখ' কে শুধুমাত্র সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা , দাড়ি রাখা প্রভৃতির মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখে।

তাওহীদ রুবুবিয়্যাহকে স্বীকার করাকেই তারা ইলাহ শব্দটির একমাত্র অর্থ বলে মনে করে।

গণতন্ত্র একটি ধর্ম। জনগণ এই ধর্মের উপাসনা করে। একটি ধর্ম তৈরি করার উপাদানগুলো আমরা আগেও আলোচনা করেছি। মূলত মানুষ সেই ধর্মের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং যেকোনো বিষয়কে সেই ধর্মের আলোকে বিচার করে।

আইন প্রণয়নকারী সংসদগুলোই মূলত একটি দেশে গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করে। ধর্মনিরপেক্ষতা, পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্র -এর প্রত্যেকটি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই তত্ত্বগুলো মিলিতভাবে মানুষকে 'স্বাধীনতা' দান করে।

ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষকে নিজের বিধান নিজেই তৈরি করার ক্ষমতা দেয়। এর মূলনীতি হল একজন মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করবে, এ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। তারা মানুষকে আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করে।

এটি এমন একটি গুণ যা একচ্ছত্রভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলে সেটার মাধ্যমে ভুল-ঠিক নির্ধারণ করাকেই আইন প্রণয়ন করা বলে ।

যেসব ব্যক্তি আইন প্রণয়ন করে, তারা বলে জিহাদ নিষিদ্ধ অথচ যিনাহ বৈধ! আর একারণেই মানবরচিত এসব বিধান আল্লাহর আইনের পরিপন্থী।

**তিন রকমের প্রধান সংস্থা সাধারণত ক্ষমতাগুলো ভাগ করে নেয়ঃ**

১. নির্বাহী সংস্থাঃ যারা নির্দেশ পালন করে, উদাহারণ: পুলিশ।

২. আইন প্রণয়নকারী সংস্থাঃ তারা আইন প্রণয়ন করে। এ কাজটি করে জাতীয় সংসদ।

৩. বিচার বিভাগীয় সংস্থাঃ এটি আদালতের দায়িত্ব।

সংসদে নির্বাচিত ব্যক্তির এ কথা বলার অধিকার আছে যে ইসলামি বিধানগুলি ভুল এবং তা সংশোধন করা প্রয়োজন। তাই গণতন্ত্র দ্বীনের ভিত্তিকেই ধ্বংস করে দেয়।

এর কারণ হচ্ছে আমরা বলে থাকি যে আল্লাহই একমাত্র আইন প্রণেতা, পক্ষান্তরে তারা বলতে চায় যে আইন প্রণেতা হচ্ছেন সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ (সুপ্রিম কোর্ট)। তাই তাদের সংসদ থেকে উৎসরিত সবকিছুই কুফর, এমনকি গণতন্ত্রের কিছু আইন যদি শরীয়াহভিত্তিক হয়, তারপরেও।

## জাতীয় সংসদ আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের শাসন কায়েম করার জন্যেই ব্যবহৃত হয়।

'ইলাহ' শব্দটির সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল আপনি আপনার কাজ দ্বারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। সংসদও এ কাজই করে থাকে,কিন্তু পরিবর্তে তারা সর্বোচ্চ আইন প্রণেতাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে।

তারা শাসককে ঐশ্বরিক ক্ষমতা (গুণ)প্রদান করে। আল্লাহ আমাদের কি বলেছেন এবং কি কি বিধান জারি করেছেন সেটা জানার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করাটা ইবাদাতের অংশ। এরপরেও ভুল হয়ে গেলে আমরা বলি, ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

কারণ আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু করেছি। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রবেশ করা বড় কুফর। যখন আপনি প্রবেশ করবেন, আপনাকে স্বীকার করতেই হবে ও স্বীকৃতি দিতে হবে যে, এটাই আইন প্রণয়ন করার একমাত্র উৎস।

## দুটি ক্ষেত্রে ভুলের কারণে এই বিষয়ে তা'ওয়ীল করা হয়:

দলীল বুঝতে ভুল করা বাস্তবতা বুঝতে ভুল করা দলীল বোঝার ক্ষেত্রে ভুল বিভিন্ন রকমের হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: কেউ একটি দুর্বল হাদিসকে সহীহ মনে করতে পারে।

যখন আপনি পার্লামেন্টে যোগ দেয়া সমর্থন করেন এমন কোন শাইখ বা আলেমকে জিজ্ঞেস করবেন, যে আইন প্রণয়নের অধিকার কার? তিনি জবাব দিবেন এটি তো আল্লাহর জন্যেই। উনার বিবৃতি প্রমান করে তিনি শাহাদাহকে স্বীকৃতি দেন।

তিনি বলবেন তিনি আইন প্রণয়নের জন্য সংসদে যান না। বরং তিনি তো শুধু তাদেরকে সত্যের সন্ধান দিতে এবং সংসদের অন্যদেরকে এটি জানাতে যান যে সকল আইন প্রণয়নের মালিক আল্লাহ। এই বিবৃতিও শাহাদাহ কে সমর্থন করে।

তিনি যুক্তি দেখাবেন যে উনার তা'ওয়ীল আছে এবং প্রমাণ হাজির করবেন যে নবী (সা) মুশরিকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি এই উদাহারণ দেখিয়ে যুক্তি খাড়া করেন যে তিনি যা করছেন তা ইসলাম অনুমোদন করে।

**আরেকটি ব্যাপার মনে রাখা উচিত, গনতন্ত্র যে কুফর এই জ্ঞানটি কী আমাদের সমাজে প্রচলিত?**

হাজার হাজার শায়খ আছেন যারা বলবেন যে পার্লামেন্ট মাসলাহা দ্বারা অনুমোদনযোগ্য, এবং এটার একটা সুফলও আছে। তাই আমরা বলতে পারব না যে এ ব্যাপারটি কুফর হিসেবে সুপরিচিত। **তাই আমরা তাকে সরাসরি কাফের বলতে পারব না।**

যদি কোন ব্যক্তি অপর একজনকে সালাত ছেড়ে দিতে বলে, তারপরেও সে মুসলিম থাকবে। এ কথা বলার কারণে আপনি তার উপর তাকফীর করতে পারবেন না, কারণ সে হয়ত নিজের ভুল তা'ওয়ীল দ্বারা এমন কোন হাদীস নিয়ে আসবে যা তার মতবাদকে সমর্থন দেবে।

তবে যদি তার কথা শুনে কেউ সালাত ছেড়ে দেয় তাহলে আমরা সালাত ত্যাগকারীর উপর তাকফির করি। তাই এখানে এ দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। যে ব্যক্তি আহবান করছে আর যে ব্যক্তিটি তা পালন করছে, তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

**একইভাবে যখন কোন ব্যক্তি পার্লামেন্ট বা সংসদে যোগ দেয়ার আহবান জানায় আমরা তার উপর তাকফীর করি না, বরং আমরা বলি সে তার পন্থায় ভুল করেছে। কিন্তু যদি কেউ পার্লামেন্টে যোগ দেয়, আমরা তার উপর তাকফীর করি।**

তাই কুফর হয় মানুষের কাজের দ্বারা, তার ফতোয়ার দ্বারা নয়। তবে সবগুলো ব্যপার মাথায় রেখে যখন কোন শায়খ ফতোয়া জারি করেন যে সর্বোচ্চ বিচারকের আইন প্রণয়নের অধিকার আছে,তখন আমরা তাঁর উপর তাকফির করি, কারণ এটি তার দ্বীনের ভিত্তিকে বাতিল করে।

কিন্তু তিনি যদি বলেন, আপনি সেখানে ভালো আদেশ দিতে এবং মন্দকে অপসারণ করতে যেতে পারবেন, তখন তাকফির করা যাবে না।

তাদের আরেকটি প্রিয় বিতর্ক হল, তারা মুখে বলে যে যদি কোন কাফির শক্তি আমাদের ভূমিতে ক্ষমতা দখল করে, আমাদেরকে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু এটার মানে কিন্তু এই না যে আপনি দাওয়াহ করতে পারবেন না।

তাছাড়া প্রস্তুতি স্বল্পতার দরুণ আপনি যদি জিহাদ না করতে পারেন, সে সময়টা আপনি তাদেরকে ইসলামের পথে ডাকতে তো পারেন। কিছু ব্যক্তি আছে যারা বলবেন fis নব্বইয়ের দশকে তো আলজেরিয়াতে এটা করেছিল। তারা যুক্তি দেখাবে যে তারা পার্লামেন্টে যোগ দিয়েছে ভালকে প্রতিষ্ঠা করতে ও খারাপকে অপসারণ করতে।

তাদের কাছে তো অস্ত্র বা ক্ষমতা ছিল না। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলাম ত্যাগকারী সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করার আদেশ থাকার পরেও তারা তা'ওয়ীল দ্বারা নিজেদের পার্লামেন্টে যোগ দেয়াকে বৈধ করবে।

তারা বলে যে উপরোক্ত বিষয়গুলো সংসদে যোগদানকারীদের তাকফির করা থেকে বিরত থাকার জন্য যুক্তি হিসাবে কাজ করে। যদিও অন্যরা প্রতিবাদ করে যে এই যুক্তিগুলো গ্রহণযোগ্য নয় কারণ তাদের জানানো হয়েছে যে এটি কুফর।

কিছু লোক পার্লামেন্টে প্রবেশ করে কিছু বিবৃতি দেয় যা তা'ওয়ীল দ্বারা গ্রহণযোগ্য করা যায় না। যেমন, 'আমরা সর্বোচ্চ শাসক কর্তৃক প্রণীত সকল আইনের অনুগত থাকব । কারণ একমাত্র তারই আইন প্রণয়নের অধিকার আছে।' তখন তারা কাফির হয়ে যায়, তাদের তা'ওয়ীল আর গ্রহণ করা হয় না।

কেউ যদি সংসদে যোগদান করে এবং পরবর্তীতে আইন প্রণয়ন করে তবে এটি স্পষ্ট কুফর এবং এর জন্য কোনো তা'ওয়ীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

কিছু লোক এমনও বলে থাকে যে, তারা ভেতর থেকে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চায়। তারা দাবী করে তারা ভেতরে দাওয়াহ করতে ইচ্ছুক। যদিও পার্লামেন্ট দা'ওয়াহর জায়গা না। উদাহারণস্বরূপ, সত্য জানানোর জন্য কিংবা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য জানানোর জন্য একজন শায়খ সংসদের অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দিতে পারেন না।

কারণ, পার্লামেন্টের সদস্যরা ঐ লোকের কথা অনুসরণ করতে বাধ্য নয়। অন্যান্য সাংসদদের মতো উনার কথাগুলোও শুধুই একটি মত হিসাবে গৃহীত হবে।। তাই আল্লাহ কি বলেন তা বিবেচনায় না নিয়েই এই শায়খের বক্তব্যকে একটি সাধারণ মতামত হিসাবে বিবেচনা করা হবে ।

তাই সাংসদরা হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা খুঁটিনাটি নিয়ে গবেষণা করে শেষমেষ শায়খের পরিবর্তে অন্য কারো 'মত'কেই গ্রহণ করবে।

কিছু পথভ্রষ্ট দল যুক্তি দেখায়, শায়খরা শুধু উপদেশ দিতেই প্রবেশ করেন, সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ার সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা নেই।

কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী, যেকোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল সাংসদের নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার থাকে কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মত আইন হিসাবে গৃহীত হলে এই মতের বিরোধীদেরকেও সেটিকে আইন হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

সকল সদস্যের বিতর্ক-বিশ্লেষণশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াই এই আইনকে বৈধতা দান করে। তাই বিরোধীদলীয় এমপিরাও কার্যত আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন। এর কারণ হলো একটি আইন প্রণীত হওয়ার ক্ষেত্রে সরকার এবং বিরোধীদল উভয়পক্ষের সাংসদদের সেটিকে বৈধতা দিতে হয়।

বিরোধীদলও সংসদের অপরিহার্য অংশ এবং আইন প্রণয়নে তাদের ভূমিকা সরকারী দলের সমান। উভয়ের অবদান সমান। মিশরের ইখওয়ান এবং অন্যান্য 'গণতান্ত্রিক ইসলামি দল' গুলো নিজেদের বিরোধীদল বলে দাবী করে । তাদের দাবী সত্য।

**কিন্তু যখন আইন বাস্তবায়িত হয়, তখন তারা তা গ্রহণ ও মান্য করতে বাধ্য থাকে। ফলে প্রকৃতপক্ষে তারা সেই মানবরচিত আইনকে বৈধতা দান করে।**

আল্লাহ আমাদের শরীয়াহ দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন, কী গ্রহণযোগ্য আর কী গ্রহণযোগ্য নয়। যদি সংসদ আইন করে যে এলকোহল নিষিদ্ধ, তাহলে তো সরকার শরীয়াহর মত একই উপসংহারে আসল, তখন আমরা এটিকে কীভাবে দেখব? আমাদের প্রথমে দেখতে হবে তারা এই সিদ্ধান্তে কীভাবে উপনীত হল?

তারা কি কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাবহার করেছিল? না কি তারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে এ সিদ্ধান্তে আসলো? তাই যদিও সরকার এখানে শরীয়াহর সাথে একমত, ইসলাম তখনো এটিকে শিরক বলবে। কারণ তারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেনি, বরং মানুষেরটা করেছে।

তাই এখানে আসল বিষয় হল সবকিছুই একান্তভাবে আল্লাহর উপর অর্পণ করা। তাই যদিও কিছু অংশ শরীয়াহ সমর্থন করে, তারপরেও এটি শিরক।তাই আমাদের দেখতে হবে কোথা থেকে এবং কীভাবে তারা এ সিদ্ধান্তে এল, এবং কোথা থেকে তারা তা প্রাপ্ত হল।

যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত খুঁজছে, যদিও সে কোনো ভুল করে, তারপরেও সে পুরস্কৃত হবে। একইভাবে যদি আইন আল্লাহর হুকুম সমর্থন করে, কিন্তু সংসদ থেকে আসে, তবে তা শিরক।

কারণ, সরকারের মাধ্যমে আংশিকভাবে শরীয়াহ প্রয়োগ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করা।

তা'ওয়ীলের ভুল দেখিয়ে দিয়েই আমরা কারও উপর তাকফির করতে পারি না। কারণ, আমরা জানিনা তারা আমাদের যুক্তি মন থেকে গ্রহণ করবেন কিনা, তাই তারা তখনো নিজ তা'ওয়ীলে বিশ্বাস করে থাকতে পারেন।

এ কারণে ইবনে তাইমিয়াহ আল্লাহর বৈশিষ্ট্য অস্বীকারকারীদের তাকফির করা থেকে বিরত থেকেছিলেন।

---

অনুবাদ করা হয়েছেঃ শায়খ আবু ক্বাতাদা আল ফিলিস্তিনি রচিত 'ঈমান সিরিজ' থেকে। মহান আল্লাহ যেন তাঁকে অটল রাখেন এবং তাঁকে হেফাজত করেন।

**সূত্র: গাযওয়াতুল হিন্দ ব্লগ**

http://gazwah.net/?p=১৪৫৬৭

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫০৩১

*****